সহচরী।

মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক।

যোড়াসাঁকো ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের গলি

বিজ্ঞান-যন্ত্রে

শ্রীঅধরচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯০—৯১ সাল।

মূল্য ॥/০ আনা; উত্তম কাপড়ে বাঁধান ৸৵০ আনা।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
অদ্ভুৎ স্বপ্ন (স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব)	৯০, ১১৫
আজো সে সুখের দিন হয় রে স্মরণ	১৬৩
আর্য্যোন্নতি সভার নগর কীর্ত্তন	১০৮
একপাতা নূতন আরব্য উপন্যাস	১৪৬,১৮১
একফোঁটা জল	৫৫
কবিতা ও বিজ্ঞান	৪১
কেওটি বসিয়া ঐ বিজ্ঞান শাখায় (পদ্য)	১৬
খিয়ংথা জাতি	১২৯,১৫৯,১৭৪
তিনটী রমণী	১৮,৩৫,৫৯
দুর্গোৎসব	৪৯
দেওয়ান গোবিন্দরাম (উপন্যাস)	৬১,৬৯,-৮১,৯৭,১২১,১৪০,১৬১,১৭৮,
নিদাঘে চাতক (পদ্য)	৫৫
নরেনের স্বর্গ দর্শন	২৮
পৌত্তলিকতা	১৪৫
প্রকৃতি (পদ্য)	৩২
ঐ	১০২
প্রভাত সঙ্গীত (পদ্য)....	১৭
প্রবাসে	১২৮,১৪৩,১৮৮
প্রাণের মিলন (পদ্য)....	১৫
প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও জাতি বিভেদ	২৪,৩৩,৭৮
মধু যামিনী (উপন্যাস)	১,২৫,৪৩,৫১,৬৫,-৮৫,১০৫,১২৫,১৩৩,১৫৩,১৬৫
মহাত্মার মৃত্যু (পদ্য)	৭৪
মহিরাবণ বধ (কাব্য)....	৪৭,৮০,৯৬
মানবের প্রপিতামহ	১১
মাষ্টার মধু	৭
শক্তি সংকীর্ত্তন	৪৯
শোকোচ্ছ্বাস (পদ্য)	১১১
সঙ্গীতে রমণী হৃদয় পুরুষ কর্ত্তৃক কতদূর চিত্রিত হইয়াছে	৬৮,৮৩,১১৮,১৩৭
সূতিকা	৪
সোহং	৭৬
স্বপ্নোত্থান (পদ্য)	১৩৯

সূচিপত্র সমাপ্ত।

বিচ্ছিন্ন হইয়া নদী-তটে বা উপত্যকা-ভূমিতে আসিয়া সেই সেই স্থানের মধুময় সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য প্রদান করে। এই স্থানের পর্ব্বতরাজি সচরাচর উন্নতশৃঙ্গ না হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত, এবং সর্ব্বদা নিবিড় বিশাল শালতরুবনে সমাচ্ছাদিত। উহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বপশ্চিমে ৭৮ ক্রোশ, এবং বিস্তার উত্তর দক্ষিণে ৬৫ ক্রোশ।

এই প্রদেশ মান্দালা, রামগড়, প্রতাপগড়, মুক্তপুর, রানিপুর, সাহাগড় প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারি পাঁচটী গ্রাম আছে, তাহাদিগের উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

এই সমগ্র স্থল গুণ্ডজাতিদিগের আদিম বাসভূমি। প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত কোন রাজপথ অভাবে বিষয়ি-জনের চক্ষে এই স্থান নিতান্ত অসুখকর ও বন্য; কিন্তু কবি বা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে নীলবর্ণ*গিরিরাজির অনুপম লাবণ্য, বিশাল শালবনাশ্রিত নানাবর্ণের পশুপক্ষী ও পতঙ্গ, স্থানে স্থানে গিরিগহ্বর-সমুৎপন্ন নদী-প্রস্রবণের নিরন্তর জল পতন, নদীতটে নবীন দূর্ব্বাদল সমাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, সুনির্ম্মল ক্ষীণ সরিৎমালারূপ সুস্বচ্ছ প্রকৃতি-মুকুর, অসভ্য নিরলঙ্কার গুণ্ডজাতিদিগের সরল ও অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতির এরূপ প্রীতিকর শিক্ষাস্থান ভারতে অতি অল্পই আছে।

নর্ম্মদানদীর উত্তরে, জহিলনদীতটে সাহাপুর নামক বিভাগে কয়েকটী উচ্চ নির্জ্জন শালতরুসমাচ্ছাদিত পর্ব্বত আছে। উহারা এরূপ ভীষণ, অসমান, ক্রম-নিম্ন ও অগম্য যে উহাদিগের অধিত্যকাভূমিতে গুণ্ড ভিন্ন অন্য কোন জাতি বসতি করিতে পারে না। কিন্তু এরূপ স্থলেও বিধাতার সুকৌশল (ভীষণে মধুরতার সংঘটন) সুপ্রকাশ। সাপ্পারী নাম্নী নদী-পতনের অনুপম শোভা যে জন একবার দেখিয়াছেন, তিনি আজীবন কখনই উহা ভুলিতে পারিবেন না। অত্যুচ্চ গিরিগহ্বর হইতে এই সরিৎপ্রস্রবণের জলরাশির অধিত্যকা হইতে অধিত্যকায় ক্রমান্বয়ে উল্লম্ফিত হইয়া পতন, সূর্য্যকিরণে বা নিশানাথের কৌমুদীতে দূর হইতে উহার অতুল সৌন্দর্য্য এবং নিরন্তর গভীর ঝর ঝর ধ্বনি চিত্র বা বর্ণনাতীত। উহার পশ্চাতে দূরবাহী ভয়ঙ্কর গহ্বরমালা। কথিত আছে যে, পাণ্ডবদিগের সময় অবধি ঐ সকল গহ্বর দুষ্টাত্মাদিগের প্রিয় বাসস্থান, সুতরাং সেই সকল স্থান এককালে পরিত্যজ্য।

এবম্বিধ ভীতি-প্রদ ও পবিত্র স্থানে একদা প্রভাত সময়ে হিঙ্গনা নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা এক গুণ্ড-কন্যা কয়েকটী গাভী ও বৎস লইয়া, একটী বংশী হস্তে, গিরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা আছেন। হিঙ্গনার পরিহিত বসন একখানি সামান্য শাটী ও পৃষ্ঠদেশে একখানি ওড়না। গলে স্ফটিকমালা, হস্তে সামান্য "কারাজ" বা চুড়ী, কর্ণে পিতল-নির্ম্মিত কাণবালা। গুণ্ডকন্যারা সচরাচর স্বভাবতই সুশ্রী, হিঙ্গনা সেই কুসুমরাজীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কুসুমকলিকা, নব বসন্তসমাগমে হাস্যময়ী, প্রেমরূপ নীহারবিন্দু এখনও স্পর্শ করে নাই, কিন্তু বিকাশকাল বোধ হয় অধিক দূর নাই; কেননা তিনি পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে যেরূপ একাগ্র-চিত্তে সউৎসুক বিস্মিতনয়নে নব রবি-কিরণে সুরঞ্জিত আকাশপটের

* Basalt.

প্রতি চাহিয়া আছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের রসানুভাবের শক্তি আবির্ভাব হইয়াছে। মস্তকোপরি পুষ্পিত তরুগণ হইতে প্রাতঃসমীরণ-সঞ্চালিত রেণু-কণা সকল তাহার গাত্রে আসিয়া পড়িতেছে, তিনি অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছেন, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না ঐরূপ চাহিয়া থাকেন? এইরূপে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া করস্থ বংশী তুলিয়া হৃদয়ভরে স্বীয় কোমল অন্তরের পরিচয় দিতে লাগিলেন, সাক্ষী-মাত্র গাভীবৃন্দ, বৃক্ষদল ও নিকটস্থ গিরিরাজী; কিন্তু যেজন প্রণয়ের উপাদান প্রণয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মধুমাস সমাগমে সুমন্দ দক্ষিণানিল প্রেরণ করেন, তিনিই অদ্য প্রভাতে ইতর জন্তু, উদ্ভিদ্ ও চেতনহীন পদার্থকে স্বর্গীয় সঙ্গীতের সাক্ষীস্বরূপ না রাখিয়া, তাঁহারই সদৃশ উপকরণে গঠিত, সেইরূপ কোমল আত্মায় প্রতিভাত কোন্ জনকে সাক্ষীর জন্য পাঠাইয়াছেন? তিনি দূর অন্তরালে অবস্থান করিয়া সেই মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে মুগ্ধপ্রায় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। বংশীধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে সেই-জন অল্পে অল্পে সেই কমনীয় কান্তি-সম্পন্ন রমণী-মুকুল সম্মুখে সস্নেহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, হিঙ্গনা চারু-বদন তুলিয়া দেখিলেন ধনুর্ব্বাণহস্তে অল্পবয়স্ক একজন নবাগত অপরিচিত পুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। হিঙ্গনা নিত্যই গাভী সকল লইয়া পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আসেন, সময়ে সময়ে মধুর বংশীর আলাপন করেন, অদ্য তাহারই সদৃশ স্বরূপ সম্পন্ন নির্জ্জনে তাহারই প্রিয়সহচর যোগ্য, এক তরুণ পুরুষ উপস্থিত দেখিয়া সহসা ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সলজ্জায় গাভীগণ নিকটে যাইলেন। তরুণ পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ না করিয়া সেইস্থলে রহিলেন। প্রথম লজ্জা ও বিস্ময়ের অপগমে তিনি পূর্ব্ববৎ অল্পে অল্পে নিকটে আসিয়া হিঙ্গনার বাঁশরীর সুস্বর প্রশংসা করিয়া উহা দেখিতে চাহিলেন। হিঙ্গনা হেট-মুখে কম্পিতভাবে করপল্লব প্রসারিত করিয়া উহা তাঁহার হস্তে দিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া উহা গ্রহণপূর্ব্বক নিকটস্থ তরুমূলে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া বংশীবাদনে নিযুক্ত হইলেন। বংশীধ্বনি পুনরপি নদী-পুলিন, বৃক্ষরাজি, অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া দূরস্থ অগম্য গিরিগহ্বরে প্রতি-ধ্বনিত হইল। হিঙ্গনার হৃদয়স্থ স্নেহ-মন্দিরের নিভৃত সর্ব্বোত্তম, সুরম্য প্রদেশের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং নবাগত অতিথির বসিবার জন্য মণিময় আসন সংস্থাপিত হইল, ভাবিলেন সঙ্গীত সমা-পনের পর অতিথির যথাযোগ্য অভিবাদন করিবেন, প্রকৃতি বলিল অভিবাদন করা আমাদিগের কুলপদ্ধতি নহে, আসন সংস্থাপনেই অতিথিসৎকার হইয়াছে। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে যুবা সস্নেহে হিঙ্গনাকে বংশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নিকট আরও দুই তিনটি গীত শুনিবার অভিলাষ বারম্বার প্রকাশ করাতে সরলা হিঙ্গনা সেই অনুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া দুই চারিবার চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু লজ্জাহত হইয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহি-লেন অন্য কোন দিন শুনাইবেন।

সেই দিন হইতে হিঙ্গনার প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। নবাগত পুরুষ চলিয়া গেলে, তিনি অন্যমনে

সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়ে কিছু নবভাবের উদয় হইয়াছে তাহা নহে, এক একবার মনে হইতেছে যে "যখন তিনি অনুরোধ করিলেন, তখন পূর্ব্বের গানটী কেন না গাহিলাম, যদি গাহিতাম তা হ'লে কি তিনি নিন্দা করিতেন?—বলিতেন কি আমি এই একটী বই আর জানি না?—না হয় আমি সঙ্গিনীদের সঙ্গে যেটী সর্ব্বদা গাহিয়া থাকি সেইটী কেননা গাহিলাম? সেটী সকলে জানে, বলিতেন পুরাতন;—নূতন গান গাহিতে গেলাম, পারিলাম না, তিনি কি মনে মনে হাসিয়াছেন?—না হ'লে আর একদিন শুনিতে আসিবেন বলিলেন কেন? আমিত বারমাস এই স্থানে প্রভাতে আসিতেছি কখনও ত তাঁহাকে দেখি নাই, বোধ হয় উনি রাজপুত্র হইবেন; আমিত রাজগুপ্ত, আমার পিতার যজ্ঞোপবিত আছে, তবে আমি দুঃখিনী।"

তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গাভীগণকে লইয়া গিরিতলে নামিলেন। শরৎকাল, বেলা ৮ দণ্ড অতীত; সূর্য্য অত্যন্ত প্রখর। তিনি অল্পে অল্পে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অন্য দিন পথে যাইবার সময় কোন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বালিকা-সুলভ হাস্য পরিহাস করেন, বা গাভীগণকে লইয়া কৌতুক করিতে করিতে যায়েন, অদ্য একজনের সহিত পথমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে দেখিয়া কেবলমাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিলেন। বাটীতে আসিয়া গাভীগণকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া, সাংসারিক কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া বংশীটী লইয়া উহার আলাপনে নিযুক্ত হইলেন। হিঙ্গনার মাতা ও তিরঞ্জন বিমাতা কিছুই লক্ষ্য করিলেন না; দুগ্ধ দোহন, মাখন প্রভৃতির প্রস্তুতের ভার হিঙ্গনার উপর, কিন্তু নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যে অদ্য তাঁহার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই।

ক্রমশঃ

সুতিকা।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

অবনি-মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয়, কোথায় বা আশ্চর্য্যজনক কোথায় বা হাস্যজনক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সভ্যসমাজের গার্হস্থ বা পারিবারিক আচার ব্যবহার আমরা অনেক জানি এজন্য তদ্‌জ্ঞানে বড় বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় না। অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার আমরা সচরাচর জানিতে পাই না, জানিবার জন্য কুতূহল

হয় এবং জানিতে পারিলে মনে একপ্রকার আমোদ হয়। আজ আমরা একটী পারিবারিক ব্যবহারের উল্লেখ করিতেছি, বোধ করি পাঠক তৎপাঠে আমোদিত হইবেন—এটী হাস্যরসোদ্দীপক।

কি সভ্য কি অসভ্য উভয়জাতীয় স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে। সন্তান প্রসব করিলে স্ত্রীলোক—নবপ্রসূত সন্তানটীর মাতা—সূতিকাগারে প্রবেশ করে। সূতিকাগারে স্বদেশ প্রথানুসারে কেহ বা এক মাস কাল কেহ বা তদধিক বা তন্ন্যূন কাল অবস্থিতি করে। এই অবস্থিতিকালীন শিশুর মাতাকে সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে হয়—যতদিন পোয়াতি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততদিন তাহাকে এই প্রকার শুশ্রূষা ও চিকিৎসাধীন হইয়া থাকিতে হয়। এই প্রথাটী কি ভারতবর্ষ কি ইউরোপ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীতে দৃষ্ট হয়—তবে প্রকরণের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে মাত্র। আমাদের দেশে প্রথা এই যে সন্তান হইলেই শিশু ও তদীয় মাতাকে একটী নিভৃত স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া যায় তথায় একটী পরিচারিকা ব্যতীত আর কেহই প্রায় থাকে না—ধাই কিম্বা ডাক্তার চিকিৎসার্থে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। চিকিৎসার তিন প্রণালী আছে। কেহ বা "সেকতাপের" কেহ বা "হরিরলুঠের" এবং কেহ বা " ডাক্তারি " প্রণালীতে চিকিৎসা করে। সূতিকাগার পরিষ্কার ও পবিত্র রাখিতে হয়, এমন কি বাটীর সকল পরিবার একপ্রকার ধর্ম্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—মৎস্য ভক্ষণ, গাত্রে তৈলমর্দ্দন, রজকালয়ে বস্ত্র দেওন, পরামানিক দ্বারা খেইরি হওন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওন প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ—এই সময়টীতে আনন্দ অশৌচ হয় বলিয়া থাকি। শিশুটীর মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠ দিবসে সেটেরা পূজা, অষ্টাহে আটকৌড়ে, মাসান্তে ষষ্ঠীপূজা করিয়া থাকি। এক মাস আনন্দ-অশৌচের কাল অতিবাহিত হইলে মাতা পরিবারমধ্যস্থ হন—এতাবৎকাল বিশেষ যত্নসহকারে শুশ্রূষা করিতে হয়।

অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকটীকে কোন না কোন প্রকার শুশ্রূষাধীন করিয়া রাখিতে দেখা যায়। কিন্তু অসভ্য জাতির মধ্যে তাহা নাই—বরং তাহার বিপরীত প্রথা প্রচলিত আছে। কোন কোন অসভ্য জাতি নবপ্রসূত সন্তানের মাতাকে সূতিকাগৃহে শুশ্রূষার্থে না রাখিয়া তদীয় পিতাকে তৎস্থানে তদুদ্দেশে রাখে! মাতা পোয়াতি না হইয়া পিতা পোয়াতির পদস্থ হয়; মাতা গৃহকার্য্য করে, পিতা সূতিকাগারে আবদ্ধ থাকে, মাতা সন্তান লালন পালন করে, পিতা আনন্দ-অশৌচকালে আবদ্ধ থাকিয়া চিকিৎসিত হয়—ঔষধ সেবন করে। এইরূপ পুরুষ সূতিকাগারে থাকা প্রথাকে ফরাসি ভাষায় "La Courade" নামে প্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অসভ্য জাতির মধ্য হইতে কয়েকটী বিবরণ নিম্নে দিলাম।

দক্ষিণ আমেরিকা নিবাসী আবিপোন (Abepone) জাতির মধ্যে এই প্রথা আছে। ডবরিজ্‌হফর*নামক জনৈক ব্যক্তি এই প্রথা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি যাহা বলেন তাহা শুনুন—"তুমি যখন শুনিবে যে কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিয়াছে, তখনই দেখিবে যে তাহার পিতা গাত্রবস্ত্র

* Dobritzhoffer's History of the Abepone.

আহরণ করিয়া অমনি মাদুরে বিছানা করিয়া শুইয়া আছে—এমন সাবধানে শুইয়া থাকে যে পাছে শীতল বায়ু গাত্রে লাগিয়া ছর্দ্দি হয়, সে এইরূপ একটী নিভৃত স্থানে শয়ন করে, উপবাস করে, এবং ব্রত-নিয়মানুসারে কিছুদিন কোন কোন নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করে না। সে যে অবস্থায় থাকে দেখিলেই তোমার দৃঢ়বিশ্বাস হইবে যে এই ব্যক্তিই সন্তান প্রসব করিয়াছে!"

দক্ষিণ আমেরিকায় গায়ানাপ্রদেশস্থ ইণ্ডিয়ন জাতির ঐ প্রকার প্রথা আছে। তাহাদের সম্বন্ধে ব্রেট * সাহেব বলেন যে সন্তান প্রসব হইলে, পূর্ব্ব রীত্যানুসারে তদীয় পিতা একটী ঝোলনায় (Hammock) শয়ন করে—পীড়িত হইলে মানুষ যেরূপ কিছুদিন শয্যাগত থাকে এবং তাহার বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন আসিয়া দেখা করে এবং সেবা শুশ্রূষা ও দুঃখ প্রকাশ করে, এই পুরুষ-পোয়াতিকেও তদ্রূপ শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করে। তিনি আরও বলেন যে তিনি একদা স্বচক্ষে এই ব্যাপারটী দেখিয়াছিলেন—দেখিলেন যে একজন সবল পুরুষ যাহার শারীরিক কোন পীড়া বা অসুখ নাই—সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ শরীর—তিনি একটী দোলনায় শুইয়া রহিয়াছেন—অকারণ এরূপ অবস্থায় শয়ন করা দেখিলে রাগ হয়—তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি স্ত্রীলোক অবস্থিতি করিয়া সাবধানে ও মান্যের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতেছে! কিন্তু নবপ্রসূত সন্তানটীর মাতা গৃহকার্য্যে রন্ধনশালায় ব্যস্ত—তাহার প্রতি কেহ কটাক্ষ করে না! ডি টারট্র (De Tertre) গিলিজ (Giliz) বিএট (Biet) ফারমিন (Fermin) প্রভৃতি ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ বহুল বর্ণনা দ্বারা এদেশের এই প্রথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করেন।

উত্তর আমেরিকা নিবাসী শোসনী (Shoshones) নামক জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। রেমি (Remy) বলেন যে গর্ব্ভিনীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইলেই, তদীয় স্বামী একটী নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়—তথায় থাকিয়া কাহারও সহিত মুখালাপ করে না, এমন কি তাহার স্ত্রীর সহিতও সাক্ষাৎ করে না। গ্রিন্‌লণ্ড প্রদেশের লোকেরও ঐ প্রথা—পোয়াতি প্রসব হইলে পর তদীয় স্বামী কয়েক সপ্তাহ কোন কর্ম্ম করে না—উদরান্নের জন্য বিষয় কার্য্য বা ব্যবসাও চালনা করে না *।

এই "La Courade" প্রথা নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রদেশে লক্ষিত হয়। চীনদেশের অন্তর্গত পশ্চিম ইউনান (West Yunnan) দেশীয় লোকের মধ্যে, বর্ণিও দ্বীপনিবাসী ডায়ক জাতির মধ্যে, আফ্রিকার কার্ম্মার জাতির মধ্যে, স্পেনের উত্তর প্রদেশে করসিকা দ্বীপে, এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের বিয়ারণ (Bearn) প্রদেশে †।

জেনিংস্ (Mr. F. W. Jennings) বলেন যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে, সারিঙ্গাপাটাম ও মালাবার উপকূল প্রদেশস্থ লোকের মধ্যে ঐরূপ একটী প্রথা প্রচলিত আছে। তিনি বলেন যে "কোন পুরুষের

* Brett's Indian Tribes of Guina P, 355.

* Egede's Greenland P, 196.

† Sir John Lubbock on Origin of civilisation &c. P, 18.

প্রথম পুত্রসন্তান হইলে বা তাহার প্রধানা স্ত্রীর কন্যাসন্তান হইলে বা তৎপরে কোন সন্তান হইলে, পিতা একমাসের জন্য নিভৃত স্থানে শয়ন করিয়া থাকেন, অন্ন ব্যতীত আর কিছু আহার করেন না, তেজস্কর দ্রব্য আহার করেন না, তামাক পর্য্যন্ত সেবন করেন না। এ গল্পটী সত্য কি মিথ্যা. তাহা আমরা জানি না এবং এই প্রথা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে কি না তাহা জানি না; কিন্তু টাইলর সাহেব "মানবের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে এই বিষয় লিখিয়াছেন *।

এই প্রথা প্রচলিত হইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে টাইলর বলেন যে ঐ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ লোক এক জাতীয় মানুস—একস্থান হইতে প্রথা সঙ্কলন করিয়াছে *! আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রখ্যাত-কীর্ত্তি অধ্যাপক মেক্সমুলর † বলেন যে "স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে নির্দ্দোষী স্বামী প্রথমেতে তদীয় আত্মীয় মহিলাগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল এবং তৎপরে ভীত হইয়া এই সুসংস্কারে মগ্ন হইল। সে উৎপীড়িত হইয়াও আত্মোৎসর্গীয় প্রথার সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল, যতক্ষণ অবধি না সে বাস্তবিক পীড়িত হয় এবং পীড়িত হইয়া আত্মরক্ষার্থে শয্যায় শয়ন করিত" এবং অবশেষে একটী রীতিতে পরিণত হইল! লাফিতো ‡ নামক একজন সুবিখ্যাত ফরাসী ইতিহাসবেত্তা বলেন যে এই প্রথা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের অস্মরণ চিহ্ন মাত্র! বড় বড় লোকের বড় বড় কথা—আমরা সামান্য লোক কি বুঝিব!

* Tylor's Early History of Man, 2nd Edition P, 301.

* Tylor's Early History of Man, 2d vols. page 296.

† Professor Max Muller's Chips from a German Workshop, vol. II. P, 281.

‡ Lafitean on American savages. vol. I. P. 259.

মাষ্টার মধু।

তোমাদের পাড়ায় মাষ্টারমধু আছে? মাষ্টারমধু মানে কি, শুনিবে? কেমনতর এক রকম বিশ্রী চেহারার লোক। হয় বেতর লম্বা, নয় ত ভয়ানক বেঁটে, শুধু বেঁটে নয়, ভায়ানক বেঁটে, ঘাড়ে গর্দ্দানে এক, মোটাসোটা, চেহারাখানা দেখিলেই যেন রাগ হয়; আবার তাহার কার্য্যগুলি যেন লোককে রাগাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া করে। কাছে বসিলেই একশবার নাক ঝাড়ে, একি বদরোগ; এমনি বিরক্ত বোধ হয়। আর বেশী কি বলিব, এককথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, সে ছেলেপুলে ভালবাসে না। ছোট ছেলে দেখিলেই ভয় দেখাইয়া কাঁদায়। ভারি আমোদ।

যাঁহাদের পাড়ায় এরূপ লোক নাই, তাঁহারা হয়ত এতক্ষণ এই রকম লোক দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের কাছে তেলকালি ও তুলি নাই নতুবা আঁকিয়া দেখাইতাম। যাহা হউক, "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" রকমে তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণ করি।

আমাদের পাড়ায় ঐ রকম হুস্ত দুস্ত গোছের একটি লোক ছিল; তাহাকে সকলে মাষ্টারমধু বলিয়া ডাকিত। ছেলে-পুলেরা দূর হইতে তাহার সহিত সম্ভাষণ করিত, নিকটে যাইতে পারিত না।

একদা ঐ পল্লীতে একঘর নূতন গৃহস্থ আসিয়া বাস করিল। তাহাদের নরেন নামে একটি সুন্দর ছেলে ছিল; আহা! ছেলেটিত নয়, যেন মোমের পুতুলটি। একদিন নরেন পাঠশালা হইতে বাড়ী অসিতেছিল, মাষ্টার মধু দরজায় বসিয়া নরেনকে ডাকিল।

তুমি মনে করিতেছ, সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া মাষ্টার মধু নরেনকে আদর করি-বার জন্য ডাকিল। তাহা নহে, ফুটফুটে ছেলেটি দেখিয়া তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য ডাকিয়াছিল।

নরেন তাহার কাছে আসিল। নরেনকে যে ডাকে সে তাহারি কাছে হাসিতে হাসিতে যায়। তাহার স্বভাবই ঐরূপ; বড় লক্ষী ছেলে। নরেন দুএকটি কথার পর মাষ্টার মধুকে বলিল "ওগো, একটি গল্প বল না গা।" নরেন বড় গল্প শুনিতে ভালবাসিত। মাষ্টার মধু যথা-সাধ্য নম্রস্বরে কহিল "গল্প শুনবি, শোন।"

মাষ্টার মধুর মনে মনে বড়ই রাগ হইল; ছেলের এত বড় স্পর্দ্ধা, তাহাকে গল্প বলিতে বলে। দাঁড়াও, গল্প শোনবার মজা দেখাই।

এই ভাবিয়া মাষ্টার মধু এক ভয়ানক গল্প আরম্ভ করিল। গল্পের ভিতর দৈত্য, দানব, ভূত, পেত্নি, সর্প প্রভৃতি নানা-প্রকার ভয়ানক নাম ছিল। নরেন গল্প শুনিতে শুনিতে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, মাষ্টার মধুর আনন্দের সীমা রহিল না। গল্প শেষ হইল। নরেন বাড়ী যাইতে পারে না, বড় ভয় পাইয়াছে, একলা কেমন করিয়া যায়। মাষ্টার মধু কর্কশস্বরে নরেনকে দুই তিনবার বাড়ী যাইতে কহিল; গেল না দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। নরেন একলাটি দরজায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেনের ঝি, সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছিল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কোলে করিয়া লইল ও আদর করিতে করিতে বাড়ীতে লইয়া গেল।

নরেন সে রাত্রিতে কিছুই খাইতে পারিল না, ক্রমাগত সেই গল্পের ভূতের কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। রাত্রিতে ঘুমাইয়া স্বপ্নে সেই ভূত দেখিয়া দুই তিন বার ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

এখন রাত্রিকালে স্বপ্নদেবীর সহচরী-গণ আসিয়া শিশুদিগকে মনোহর স্বপ্ন দেখায়। সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইতে ঘুমাইতে শিশুগুলি কেমন মধুর হাসি হাসে। গাল দুটিতে কেমন টোল খায়, আহা! দেখিতে কেমন মধুর। সেই মধুর হাসি দেখিয়া মার প্রাণে স্নেহের সাগর উথলিয়া উঠে।

যে স্বপ্নসহচরী প্রতি রাত্রিতে নরেনকে মনোহর স্বপ্ন আনিয়া দেখাইত সে ঐ রজনীতে নরেনকে ভয় পাইতে দেখিয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সমস্তই জানিতে পারিল। পরীস্থানে গিয়া স্বপ্নদেবীকে সমস্ত নিবেদন করিল। স্বপ্নদেবী এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহার অধীনস্থ কতকগুলি পরীকে আদেশ করিলেন "যাও, কে মাষ্টার মধু আছে, তাহাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়া আইস।"

পরীরা তাই ত চায়; দুষ্ট লোককে শাস্তি দিতে পারিলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয়। হুকুম পাইয়া সেই রাত্রিতেই হাওয়ায় হাওয়ায় মিশাইয়া মাষ্টার মধুর গৃহে প্রবেশ করিল। একজন পরী তাহার কানের ভিতর ঢুকিয়া ফরফর করাতে মাষ্টার মধুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চমকিয়া উঠিয়া দেখে তাহার ঠন্‌ঠনের পম্পো-জোড়াটি তাহার বুকের উপর রহিয়াছে। "আ ম'লো, জুত বুকে করিয়া ঘুমুচ্চি নাকি! তাই ভাল ঘুম হচ্ছিল না বটে।" হাতে করিয়া জুতাজোড়াটি ছুড়িয়া মেজেয় ফেলিয়া দিলেন। ওমা! ওকি! জুত দুপাটি লাফাইয়া পুনরায় তাহার বুকের উপর পটাস্ পটাস্ করিয়া পড়িল। আবার একি! জুত আবার কথা কয় "পর, আমাদের পায়ে দাও।" মাষ্টার মধু এ সকল স্বপ্ন ভাবিয়া চক্ষু মুছিয়া পুনরায় জুত ফেলিয়া দিল। জুত আবার আসিয়া বুকে পড়িল আবার বলিতে লাগিল "আমাদের পায়ে দাও বল্‌চি নতুবা নিস্তার নাই।" মাষ্টার মধু মনে করিল জুতকে ভূতে পাইয়াছে, কি করে ভয়ে জড়সড় হইয়া জুত পরিল। যেমন জুত পায়ে দিয়াছে, অমনি জুত চলিতে লাগিল। মাষ্টার থামিতে যায় জুত কি থামিতে দেয়, তাহাকে লইয়া চলিল। সদর দরজায় উপস্থিত। মাষ্টার মধু দেখিল বিষম বিপদ, কি করে, জুতকে বলিতে লাগিল "হে বাবা জুত! একটু থাম, একটা কথা শোন, গরিবকে এই শীতকালে কোথায় লইয়া যাও; হে মা! তবু যে চলিলে, নিতান্তই যদি যাও, তবে দাঁড়াও, একটা জামা গায়ে দিই বড় শী-ঈ-ঈত।"

পাদুকাদ্বয় শুনিল না। মাষ্টার মধুকে লইয়া বেগে গমন করিতে লাগিল। সহর ছাড়াইয়া এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকে বড় বড় গাছ, গাছের পাতায় পাতায় মর্ম্মর শব্দ করিয়া যেন গাছে গাছে কথা কহিতেছে; মধ্যে মধ্যে বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দ করিয়া তাহাদের কথায় বাধা দিতেছে, আবার বায়ুর শব্দ পাইয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল গর্জ্জন করিয়া যেন বাতাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "কি খবর, কোন শীকার আছে?"

এইরূপ ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যে মাষ্টার মধু একলা জীবন্ত জুত পায়ে দিয়া চলিতেছে। প্রথমে তাহার বিলক্ষণ শীত বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন ভয়ে ও দ্রুতাগমনের শ্রমে শরীর ঘর্ম্মাক্ত; কণ্ঠাগত প্রাণ; প্রাণ যায় যায়।

কিছুদূর যাইতে যাইতে সম্মুখে এক পুকুর দেখা দিল। জুত পুকুরেই নামিতে চায়; কি বিপদ! এই শীতকালে পানা-পুকুরে, তা'তে এই সর্ব্বনেশে জুত পায়! পুকুরের পাড়ে একটি বড় গাছ ছিল। মাষ্টার মধু তাড়াতাড়ি সেই গাছের ডাল ধরিল; জুত পুকুরের দিকে টানে, মাষ্টার

মধু ডাল ছাড়ে না। এইরূপ খানিকক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। শেষে দুইটী পরী পিপীলিকার বেশ ধরিয়া মাষ্টার মধুর হাতে এরূপ কামড়াইল যে, বাবারে! মারে! করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ডাল ছাড়িয়া দিতে হইল; পাদুকাদ্বয়ও অমনি মাষ্টার মধুকে লইয়া জলে ঝাঁপ দিল।

জলে পড়িয়া মাষ্টার মধুর যে দুর্দ্দশা হইল তাহা আর কি বলিব। কখন ডুবিতে লাগিল, কখন ভাসিয়া উঠে, কখন নাকে মুখে জল প্রবেশ করিয়া সেই গজস্কন্ধ শরীর যেন তাড়িতবেগে তাড়িত হইতে লাগিল। মাথা তুলিবার যো নাই, উপরে পরীরা মৌমাছি সাজিয়া কামড়াইতে আরম্ভ করিল। অনেক কষ্টে মাষ্টার মধু পুকুর পার হইলেন।

এখনও জুত থামে না, কাঁটাবনের ভিতর দিয়া মাষ্টার মধুকে লইয়া চলিল। মাষ্টার মধুর হাফানির শব্দে গাছের পাখী-দের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা কিচ্‌মিচ্ করিয়া পরস্পরে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানাজানি করিল। তন্মধ্যে একটা পাখী বলিয়া উঠিল—

চলছে মাষ্টার মধু ঘিয়ে ভাজা হবে।
পেটমোটা দৈত্যরাজা গপাগপ খাবে।
গপাগপ খাবে॥

মাষ্টার মধুর ধড়ে ত প্রাণ ছিলই না, যা ছিল, পাখীর এই কথা শুনিয়া সে টুকুও রহিল না। "দৈত্যরাজ কেরে বাবা! সে আমায় ঘিয়ে ভেজে খাবে।"

এই সময় দৈবাৎ তাহার নরেনের কান্না মনে পড়িল। মনে মনে করিতে লাগিল আমি নরেনকে মিছে দৈত্যের কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলাম, এখন যে আমায় সত্য সত্যই দৈত্যে আহার করে। কি সর্ব্বনাশ!

সবেমাত্র এই কথা ভাবিয়াছে এমন সময় সত্য সত্যই সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি উপস্থিত। তাহার মস্তক আকাশের সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে। এত বড় হাঁ যে একশত মাষ্টার মধুকে এক এক গ্রাসে ভক্ষণ করিতে সক্ষম। দৈত্যরাজ হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল "হো! হো! মাষ্টার মধু! তুই নাকি বড় ভয় দেখা'তে জানিস্?" এই বলিয়া দৈত্য ভয়ানক দাঁত কড়মড় করিয়া উঠিল। পুনরায় বলিতে লাগিল "উঃ! কি বলিব কাঁচা মাংসে অরুচি হইয়াছে নতুবা তোকে এখনি উদরসাৎ করিতাম। যা'হক তোকে ঝলসাইয়া ভক্ষণ করিব।

এই বলিয়া সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য মাষ্টার মধুর পা দুটো একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া দিল, তাহার মাথাটা নিচে ঝুলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাষ্টার মধুর মাথার নীচে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; উত্তাপে মাষ্টার মধু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ছট্‌ফট্ করিতে গিয়া মাষ্টার মধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন একটু একটু ফরসা হইয়াছে। মাষ্টার মধুর ঘামে বিছানার চাদর ভিজিয়া গিয়াছে।

উঃ! কি ভয়ানক স্বপ্ন! সমস্ত রাত্রি কি যন্ত্রণা! শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মাষ্টার মধু প্রতিজ্ঞা করিল কখন কোন ছেলেকে আর ভয় দেখাইব না।

বোধ হয় মাষ্টার মধুর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সাহস হইবে না। তোমরা কি বল?

মানবের প্রপিতামহ।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই প্রস্তাবের শীর্ষাভিধান দেখিয়া না জানি পাঠকগণ কত কি অনুমান করিতেছেন। কেহ হয়ত ভাবিতেছেন যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাই ত মানবের পিতামহ, তাঁহার আবার পিতা কে? বিবাহ করিতে গিয়া শঙ্করঠাকুরটিও ঐরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। পরিণয় সভায় পুরোহিত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর তোমার ঠাকুরের নাম কি, তখন ত্রিলোচনের চক্ষু স্থির, তিনি অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পিতা কে তাহা কে বলিতে পারে? অতএব তাঁহাদের মূলানুসন্ধান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সামান্য এক পার্থিব প্রাণী এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য।

বলিতে পারেন কোন্ জীব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন শূন্যে অবস্থান করে এবং কখনও মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। নিদাঘকালে যখন আপনি গৃহছাদে বসিয়া সুশীতল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করেন, যখন বায়ুভরে বিকম্পিত তরুরাজি, নববিকশিত চন্দ্রমা এবং পবনতাড়িত মেঘমালার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দিবসের ক্লান্তি এবং পার্থিব শোকসন্তাপ বিস্মৃত হইয়া অনবরত নির্ম্মল শান্তিসুখ অনুভব করিতে থাকেন এবং যখন আপনার মন চন্দ্রকিরণ হইতে মেঘমালা, মেঘমালা হইতে চন্দ্রমা এবং চন্দ্রমা হইতে অসংখ্য নক্ষত্রে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই সময়ে অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন এক জাতীয় জীব একটার পর একটা, তারপর একটা, তারপর একটা ক্রমাগত একদিগ হইতে অন্যদিগে উড়িয়া যাইতেছে এবং যাইতে যাইতে আকাশপথে এক একবার চক্র দিতেছে, নামিতেছে, উঠিতেছে আবার যাইতেছে; সেই অপূর্ব্ব জন্তুর চরণ আছে অথচ ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে না—পক্ষ নাই অথচ পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়। সেই জন্তুই মানবের প্রপিতামহ—বিদ্যাভিমানী বানরবংশধর মানবের প্রপিতামহ—বিদ্যাভিমানে অন্ধ হইয়া যিনি পৃথিবীকে শরা দেখেন, লক্ষযোজন দূরেস্থিত মার্ত্তণ্ডের মানচিত্র গ্রহণ করেন, চন্দ্রাহতের ন্যায় চন্দ্রলোকে গমনের কল্পনা করেন এবং সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বস্রষ্টারও ভ্রমপ্রমাদ দেখাইতেও লজ্জা বোধ করেন না, সেই ঘোরাভিমানী মানবের প্রপিতামহ।

এই জাতীয় প্রাণীগণ পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের নিকট বাতুলি নামে পরিচিত ছিল—কেহ কেহ ইহাদিগকে তরুতুলিকাও বলিতেন। রোমক পণ্ডিত প্লীনি ইহাদিগকে

উড্ডয়নশীল ইন্দুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাদুড় উড্ডয়নশীল ইন্দুর বৈ আর কিছুই নহে।

প্রবাদ আছে, অতীব প্রাচীনকালে এক সময়ে কতকগুলি মূষিক, মার্জ্জার দৌরাত্ম্যে জর্জ্জরিত ও উৎসাদিত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করে, এবং তথায় এক উন্নতশির নিবিড় তিন্তিড়ী বৃক্ষ সমাশ্রয় করিয়া সকলে মিলিয়া নিরাহারে উর্দ্ধপদ ও অধোশিরে ঘোরতর কঠোর তপস্যায় নিরত হয়। বাস্তবিক মার্জ্জার-নির্যাতন তাঁহাদের অসহ্য হইয়াছিল। এবং অসহ্য হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া এই প্রকার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন এইরূপ তপস্যার পর একদা নিশীথ সময়ে—যখন সমস্ত জীবজগৎ প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন—সেই ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন বনভূমি হঠাৎ যেন বিদ্যুতালোকে প্রভাসিত হইল এবং ইন্দুরদিগের আরাধ্য দেবতা ভগবান গজানন সেই তিন্তিড়ীতলে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। মূষিকগণ অকস্মাৎ ইষ্টদেবতার আবির্ভাবে চকিত ও চমকিত হইয়া কিচিমিচি নিনাদে তদীয় স্তুতিবাদ আরম্ভ করিল। পার্ব্বতীনন্দন গণপতি ইন্দুরদিগের দুর্গতি ও তথাবিধ তপোক্লেশে করুণার্দ্র হইয়া প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসিলেন—হে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ মূষিকগণ, তোমাদের এ কঠোর তপস্যার কারণ কি? কি নিমিত্ত তোমরা এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ? তোমরা কি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব না ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার জন্য এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্রতাবলম্বন করিয়াছ? আখুদল বিনীতভাবে উত্তর করিল—ঠাকুর, আমরা বিড়ালের অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহারে নিতান্ত নিপীড়িত, ভীত ও সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়াছি—আমাদের এই সার বিপদ হইতে ত্বরায় উদ্ধার করুন এইমাত্র আমাদের প্রার্থনা—অধিক আর কিছুই আমরা চাহি না। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লইবার নিমিত্ত আমাদের এ তপস্যা নয়। গজানন জলদগম্ভীর স্বরে পুনর্ব্বার বলিলেন। দুর্বৃত্ত মার্জ্জারগণ যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করাই কর্ত্তব্য কিন্তু কি করিব—আমাদের শুভাদৃষ্ট যে—ইতঃপূর্ব্বেই তাহারা ষষ্ঠীদেবীর বাহনত্ব স্বীকার করিয়াছে কাজেই তাহাদের বংশোচ্ছেদ করিতে আমি সম্প্রতি সমর্থ হইতেছি না। কিন্তু তোমাদের অবস্থোন্নতি ও বিপদোদ্ধারের এক সমীচীন উপায়োদ্ভাবন করিয়াছি। তোমরা যে কয়েকজন তপস্যা করিতেছ সেই কয়েক জনের মধ্যে কাহাকেও আর কস্মিনকালেও বিড়াল হস্তে পড়িতে হইবে না। তোমরা আমার বরে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে কেবল শূন্যে বিচরণ করিবে, ভূতলে তোমাদের আর কদাপি নামিতে হইবে না। যাবৎ তোমরা পবিত্রাচারে দিবাভাগে এইরূপ তপস্যা এবং সন্ধ্যার পর কেবল বিশুদ্ধ ফলাহারে জীবন ধারণ করিবে তাবৎ তোমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মাংসাশী বা রুধিরপ্রিয় হয় তাহাকে তোমাদের সমাজচ্যুত হইয়া ম্লেচ্ছদেশে অথবা অতীব অপকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। দেবতা—মনুষ্য সকলেই তাহাকে ঘৃণা

করিবে এবং সে দুরাচার নিশাচর পেচকের ভক্ষ্য হইবে। এই কথা বলিয়া মূষিকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লম্বোদর হেরম্ব অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি সেই তপোনিরত ইন্দুরদল চর্ম্মময় পক্ষবিশিষ্ট হইয়া বাতুলি আখ্যা লাভ করিয়া শূন্যপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল—চিরশত্রু বিড়ালের ভয় তাহাদের আর রহিল না। অদ্যাপি বাতুলিগণ গণেশের আদেশানুসারে নিরাহারে, ঊর্দ্ধপদ ও অধোশিরে সমস্ত দিবস তপস্যা করে এবং সন্ধ্যার পর আহারান্বেষণে নানাদেশে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কতকগুলি বাতুলি রুধির-লালসা সম্বরণ করিতে না পারায় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিদ্ধ দ্বীপাবলী হইতে দূরীকৃত হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গিয়া বাস করিল এবং কেহ কেহ নরকতুল্য স্থানে লুকাইয়া রহিল। তাহাদের বংশধরেরাই, চামচিকা কলাবাদুড়, এবং ভম্পায়ার নামে লোক সমাজে পরিচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় কাব্যে এই অপূর্ব্ব জীবের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় কবিগণ চিরকাল স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাদের নিশাবর্ণনায় চন্দ্রমা হাসিয়াছে, নক্ষত্র ভাসিয়াছে, কুমুদিনী চাহিয়াছে, চক্রবাকী কাঁদিয়াছে এবং ঝিল্লিনাদে পৃথ্বী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তথায় অন্ধকারপ্রিয় বাতুলির প্রবিষ্ট হইবার অবসর কোথায়? ইউরোপীয় কাব্যে পেচক ও বাতুলির বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয়েরা বাতুলিকে পেচকের ন্যায় অশুভ বিধায়ক বিবেচনা করিয়া ভয়ের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে, এই জন্য খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী সয়তানের পক্ষদ্বয় বাদুড়ের ডানার ন্যায় কল্পিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বর ও মনুষ্যের অনুকল্পনা মাত্র, তত্রাচ খ্রীষ্টীয়ানেরা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উপহাস করে। আমরা দেখিতেছি পৌত্তলিকতারই সর্ব্বত্রে জয়। প্রেম ও ভক্তি চিরকালই পৌত্তলিকতাকে আশ্রয় করিয়া আছে। পৌত্তলিকতা অতিক্রম করা পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যের সাধ্যাতীত, রূপ কল্পনা ভিন্ন সাধকের সাধনাই হয় না। যাঁহারা নয়ন মুদিয়া নিরাকার ভাবেন তাঁহারা নিশ্চয় অন্ধকার দেখেন। নয়ন মুদিয়া দোলাই তাঁহাদের সার, তাঁহাদের উপাসনা মনে আঁখিঠার মাত্র। অতএব যাঁহারা পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করেন তাঁহারা আমাদের কৃপার পাত্র।

ইহুদিরা বাতুলিকে অন্ধকারের পক্ষী বলে এবং হারাম বিবেচনায় কদাচ তাহার মাংস গ্রহণ করে না। কিন্তু যবদ্বীপবাসীগণ বাতুলির মাংস উপাদেয় খাদ্য বলিয়া আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্লীনি সংশয়ের সহিত এই প্রাণীকে বিহঙ্গশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন বাতুলি ভিন্ন অন্য কোন পক্ষীর দন্ত নাই, বাতুলি ভিন্ন অন্য কোন পক্ষী শাবক প্রসব করে না এবং বাতুলি ভিন্ন অন্য কোন পক্ষী সন্তানকে স্তন্য পান করায় না। এই জন্য রোমকেরা বাতুলিকে অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধবিহঙ্গম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাণীতত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতেরা এই প্রাণীকে লইয়া মহা বিপদগ্রস্ত, তাঁহারা ইহাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। মহাগোলযোগে পড়িয়া ষোড়শ-শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আল্‌ড্রোভাণ্ডি অষ্ট্রীচ পক্ষী ও বাতুলিকে এক পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, অষ্ট্রীচ, পক্ষী, অথচ উড়িতে পারে না কিন্তু চতুষ্পদের ন্যায় বেগে দৌড়াইতে পারে এবং বাদুড় চতুষ্পদ, অথচ চলিতে পারে না কিন্তু পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে পারে, অতএব এই, অদ্ভুত প্রকৃতি দুই জাতীয় জন্তুকে এক পৃথক্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এ যুক্তি বড় মন্দ নয়।

বাদুড় দুই জাতীয়। কীটপতঙ্গভোজী ও ফলাহারী। ফলাহারী বাদুড়গণই গণেশের আদেশ রক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রাণান্তে ভূতলে নামে না, তাহারা সমস্ত দিবস নীরবে, নিরাহারে, ও নতশিরে অসংখ্য ফলের ন্যায় তরুশাখায় ঝুলিয়া থাকে এবং সন্ধ্যার পর ঝাঁকে ঝাঁকে বন হইতে বনান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে আহারান্বেষণ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ও তদ্‌সন্নিদ্ধ দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। চামচিকা প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তি পতিত বাদুড়গণ কীটপতঙ্গভোজী। ইহারা ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষুদ্রাশয় এবং অতি ঘৃণিত, অপকৃষ্ট, অন্ধকারময় স্থানে সর্ব্বদা লুকাইয়া থাকে। মশক, দংশক, পোকামাকড় ইহাদের খাদ্য। ম্লেচ্ছ দেশেই এই জাতীয় বাদুড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকায় ভম্পায়ার নামে এক প্রকার বাদুড় আছে, তাহাদের প্রকৃতি অতি ভয়ানক তাহারা মশকের ন্যায় নিদ্রিত মনুষ্যের রক্তপান করে। কোন কোন সময়ে অতর্কিতরূপে শনৈঃ শনৈঃ শরীর হইতে এত শোণিত শোষণ করিয়া লয় যে দষ্ট ব্যক্তি তন্নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জে গ্যালিওপিথেকস্ নামে এক প্রকার জন্তু আছে। তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি কতক বানর ও কতক বাদুড়ের মত। হঠাৎ দেখিলে তাহাদিগকে বানর বলিয়া বোধ হয়। বানরের ন্যায় তাহারা শাখা হইতে শাখান্তরে পরিক্রমন করিয়া বেড়ায়। আবার তাহাদের অবয়ব কতকটা বাদুড়ের ন্যায়, বাদুড়ের ন্যায় তাহারা রাত্রিচর এবং দিবাভাগে বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্য ও বানরে যে সৌসাদৃশ্য, বানরে ও গ্যালিওপিথেকসে এবং গ্যালিওপিথেকস্ বাদুড়ে সেই প্রকার সৌসাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনুষ্য যদি বানরের বংশধর হয়, তবে বাদুড় মনুষ্যের প্রপিতামহ কেন না হইবে। অতএব ডারউইনের যুক্তি অনুসারে বাদুড় মানবের প্রপিতামহ।

প্রাণের মিলন।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

"Thy life and mine, a double life made one."

Brenon.

১

এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার
জাগে নিরন্তর,
ইহার সহিত
অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল ;
আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—একত্রে মিলন।

২

জলে জল মিলে গেলে প্রভেদ কি রয় ?
কিছু নয়—কিছু নয়,
মিলে একাকার হয়,
বিশ্বের জীবন সহ আমার জীবন
সেইরূপ একাকার—অপূর্ব্ব মিলন।

৩

বৈজ্ঞানিক ! কেন তুমি, স্থাবর জঙ্গম—
জড় বা অজড় নামে প্রভেদ দেখাও ?
এক বই দুই নাই,
তবে কেন বল, ভাই,
যে নড়ে—অজড় সেই,
যে না নড়ে—জড় সেই ?
'নির্জ্জীবে' স্থাবর বল, 'সজীবে' জঙ্গম ?
কেন বৃথা বহ মনে হেন মহাভ্রম ?

৪

হয়, বল সমস্তই জড়ের মিশ্রণ,
নয়, বল সমস্তই—অজড়—সজীব ;
জান না কি তুমি, আমি
এক প্রাণে এক প্রাণী ?
জান না কি তুমিও যে,
তাপও সে, আমিও সে ?
জান না কি মাটী যাহা ;
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
জান না কি জল যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
জান না কি বায়ু যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
জান না কি শূন্য যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
নিজে বল এই পঞ্চে এ বিশ্ব সংসার,
তবে কেন ভেদাভেদ দেখাও আবার ?

৫

পঞ্চভূতে গড়া তুমি,
পঞ্চভূতে গড়া আমি,
পঞ্চভূতে গড়া এই নিখিল সংসার খানি।
এই সে বিশ্বের প্রাণ
তোমার আমার প্রাণ ;
আবার—
তোমার আমার প্রাণ
এই সে বিশ্বের প্রাণ ;
এক প্রাণ ভাগ হ'য়ে রেখেছে সকল প্রাণী।
তুমি বল, তুমি আমি

(মানুষ!) জীবন্ত প্রাণী!
চন্দ্র সূর্য্য জীব নয়,
শুধু জড়পিণ্ডময়!
পৃথিবী জড়ের অংশ,
জীবই অজড় বংশ!
কেন তুমি, বৈজ্ঞানিক! বল এ অসারবাণী?

৬

জান না কি রবি যদি আজ লয় পায়,
গ্রহ তারা এই ধরা গুঁড়া হ'য়ে যায়,
শুকাইয়া যায় জল,
শূন্য হ'য়ে যায় স্থল,
অনল নিবিয়া যায়,
মিলাইয়া যায় বায়,
শূন্যতাও যায় ম'রে,
তা' হ'লে কেমন ক'রে
তুমি আমি প্রাণ ধ'রে থাকিব কোথায়?
তবু বিশ্বাসিবে তুমি নিজের কথায়?

৭

এই বিশ্ব না থাকিলে তুমি আমি কে?
আবার—
তুমি আমি না থাকিলে এই বিশ্ব কে?
আবার—
তুমি না থাকিলে পরে
আমি বা কে, বল মোরে?
আবার—
আমি না থাকিলে ভাই,
তোমারো তো সত্ত্বা নাই;
জান না কি পরস্পরে বাঁধা আছি যে?

৮

তাই বলি—
এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার
জাগে নিরন্তর;
ইহার সহিত
অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল;
আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—প্রাণের মিলন।

কে ওটি বসিয়া ঐ বিজ্ঞানশাখায়।

১

কে ওটি বসিয়া ঐ বিজ্ঞানশাখায়
ছোট ছোট দুটি চোকে মিটি মিটি চায়?
চাহিছে আকাশ পানে
কি ভাবে সে সেই জানে,
হনূপুত্র মর্কটের উচ্চ অভিপ্রায়
কে ওটি বসিয়া ঐ বিজ্ঞানশাখায়।

২

যার পিতা প্রভাকরে
উপাড়ি বগলে ধরে;
সে বুঝিরে এ জগৎ উল্‌টাইতে চায়
তাই রে আকাশ পানে মিটি মিটি চায়।

৩

ভাবে বুঝি, এক লাফে
চাঁদে চড়ি বীরদাপে,
ছিঁড়িয়া বন্ধন তার ফেলিবে ধরায়
নিষ্কলঙ্ক করিবে মাজিয়া চন্দ্রমায়।

৪

সূর্য্যের সারথী পাড়ি,
ছিঁড়িবে তাহার দাড়ি
মুখের অসীত দাগ ঘুচাইবে তায়
সাজাবেরে অরুণেরে নবীন শোভায়।

৫

ক্রমে ক্রমে এইমত
শুধি দিবে দোষ যত—
আছে এই দৃশ্যমান বিশ্ব রচনায়,
তাই বুঝি মিটি মিটি আকাশে তাকায়;
কে ওটি বসিয়া ঐ বিজ্ঞানশাখায়?

প্রভাত সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

গাইছে কোকিল, গাইছে শ্যামা,
শ্যামা নাম মন গাওরে।
এখনো রহিলে মোহে অচেতন!
জ্ঞান আঁখি মেলি চাওরে॥

২

ফুটিল চামেলি, ফুটিল শেফালী,
ফুটিল বিবিধ ফুল।
হৃদয় কানন, কররে শোভন,
ভকতি ফুল ফুটাওরে।

৩

তরুণ তপন, লোহিত কিরণে,
অম্বর শোভিল চন্দন বরণে।
মায়ের চরণ, কররে অর্চ্চন,
শ্রদ্ধা চন্দন ছিটাও রে॥

৪

মন্দ মন্দ বহে, শীতল সমীর,
ধীরে ধীরে ধীরে পড়িছে শিশির,
ধীরে ধীরে ধীরে, উদিছে মিহির,
তিমিরের লেশ নাহিরে।

৫

বহুক্ হৃদয়ে, শান্তি সমীরণ,
প্রেমাবেশে সদা ঝরুক নয়ন।
মানসে ভাস্থক, বিবেক তপন
আর কিছু নাহি চাহিরে॥

৬

কর যত পার পর উপকার
পর সুখে সুখী হওরে ও মন
পরে পরজ্ঞান, আত্ম অভিমান
হিংসা দ্বেষ শুধু দুঃখের কারণ।
ধরমাচরণে করম সাধনে
সকল জীবন দাওরে।

৭

পাপিয়া ডাকিছে, পঞ্চম স্বরে,
নীরবে রয়েছ কেমন করে।
ডাক ডাক ডাক, ডাকরে মায়,
সময় স্রোত বহিয়া যায়।
কিহবে কখন, কে জানে হায়,
শ্যামা নাম মন গাওরে

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

তিনটী রমণী।

গ্রীষ্মকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিল। বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে এমন সময় এক উদ্যানের বাপীকূলে বসিয়া দুইটী রমণী কথোপকথন করিতেছিল। কথায় কথায় বয়োকনিষ্ঠা একটী গীত গাইতে আরম্ভ করিল—বাপী জল কুলু২ নাদে গীতের সঙ্গে স্বর দিতে লাগিল। গান আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল।

গীত সমাপনান্তে গায়িকা হাসিতে হাসিতে অপরাকে বলিল—"কেমন লো কেমন গেয়েছি?"

অপরা।—"বেশ—গেয়িছিস্ তুই এমন গাইতে কবে শিখ্‌লি?"

বাস্তবিক গায়িকার স্বর অতি মিষ্ট। কোকিলের ধ্বনি যেমন স্বভাবতঃ মধুর ও প্রাকৃত মাধুর্য্যে সকলের মন মোহন করে, গায়িকার কণ্ঠধ্বনি সেই প্রকার মনোমুগ্ধকর। বয়োজেষ্ঠার উত্তরে গায়িকা অস্ফুটস্বরে কি বলিল তাহা শুনা গেল না, কিন্তু কলে হাসির ঢেউ উঠিল। সেই হাসির তরঙ্গে রমণীদ্বয় ভাসিয়া গেল, একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িল, দেখিতে পাইল না যে গায়িকার বসনের অঞ্চল বাপীজলে পড়িয়া গিয়াছে, আর বাপী জল সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী লইয়া ক্রীড়া করিতেছে; একবার এদিকে ও একবার ওদিকে আরবার বাপীতটে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিতেছে, যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে ও জানিতে চেষ্টা করিতেছে কি গুণে বসন রমণীর বুকের সামগ্রী হইতে পারিয়াছে। হাসির ঢেউ থামিল। কনিষ্ঠার অঞ্চলের দিকে নয়ন পতিত হইল। কনিষ্ঠা অমনি অঞ্চল টানিয়া লইয়া বলিল "দেখ্ হাস্‌তে হাস্‌তে আমার আঁচল ভিজে গেল, আর অত হাস্‌ব না। ভুবন দিদি,—এখনকার দাদা—আবার বলেছেন—

'একদিন সাধ করি, হেসেছিনু মুখ ভরি,
অমনি আঁধার হলো এ পোড়া হৃদয়
তাই বলি এত হাসি হাসা ভাল নয়'

এখন চল্‌লো জলথেকে উঠে ওই কামিনী কুঞ্জে গিয়ে বসিগে" সে গাইতে গাইতে। চলিল অপরা রমণী জল বাজাইতে বাজাইতে তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। সে গাইল

"চললো চললো সখি, কামিনী কুঞ্জে,
ভ্রমে যথা প্রজাপতি ভ্রমর পুঞ্জে
সেইখানে সবে মেলি
আনন্দে করিব কেলি
নন্দন কাননে যথা সুরবালা ভুঞ্জে,
চললো চলোলো সখি কামিনীকুঞ্জে।"

কামিনীদ্বয় কামিনীকুঞ্জে আসিয়া এক প্রস্তরময় মঞ্চে উপবিষ্ট হইল, ক্রমে তাহাদের হাসি হাসি মুখে গাম্ভীর্য্য আসিয়া উদয় হইতে লাগিল। উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে পর বয়োজ্যেষ্ঠার কণ্ঠভেদ করিয়া এই শব্দ বাহির হইল "বিনোদ আজ আমরা এক প্রকার স্বাধীন। বঙ্গাঙ্গনার অদৃষ্টেইহার অপেক্ষা আর কি স্বাধীনতা ঘটিতে পারে? হেথায় কোন ননদিনীর বক্র ও কুটিলদৃষ্টি দেখিতে ও শাশুড়ীর ঘোর মর্ম্ম ভেদকারী চীৎকার রব শুনিতে হইবে না।"

আর একটী বামাকণ্ঠস্বর উত্তর করিল "তা ঠিক তো কমল্, এই আমাদের স্বাধীনতার চরম অবস্থা; প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ও গান গাহিতে পারাপেক্ষা আমাদের আরও কি সুখ হইতে পারে।"

এরা কে?-জানিবার জন্য হয়তো পাঠকের কৌতুহল জন্মিয়া থাকিবে। রমণীদ্বয়ের কথোপকথন শুনিয়া বোধ হয় তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন একার নাম কমলিনী, অপরার নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী গৌরবর্ণা। বিনোদিনীর বয়স ১৫ বৎসর, মুখশ্রী দেখিলে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয়। বিনোদিনীর চক্ষু—স্থির-চক্ষু নহে—চঞ্চল। বিনোদিনী চঞ্চলা—শৈশবে স্বভাবতঃ ছুটাছুটি করিতে ভাল বাসিত। চঞ্চলা প্রকৃতি হেতু বিনোদিনী অনেকের বিরাগ ভাজন হইত, কিন্তু তাহার পিতা মাতা তাহাকে কিছু বলিত না। বিনোদ তাহার পিতা মাতার একমাত্র সন্ততি। শুধু বিনোদেরই মুখ চাহিয়া পিতা মাতা হাসিত ও সুখে ভাসিত। বিনোদের পিতা জজআদালতের একজন ধর্ম্মভীত বিদ্বান কর্ম্মচারী ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চায় তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। বিনোদের পিতা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার যত্নে বিনোদিনীর মাতাও কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। শিক্ষিত পিতা মাতার একমাত্র সন্তানের শিক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবনা, তাই বিনোদিনীর অতি অল্প বয়স হইতে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইয়াছিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না বিনোদিনী দশ বৎসরে ভারনেকিউলার (Vernacular) পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েন। এগার বৎসরে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর বিনোদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা গৃহে বসিয়া চলিতে লাগিল। তাহার পিতা তাহার শিক্ষাকার্য্যে সাহার্য্য করিতে লাগিলেন। মাতা, আর কিছু নূতন শিখাইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার বিদ্যায় আর কুলাইত না; কিন্তু মায়ের পরিবর্ত্তে তাহার আর একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কে সে? নগেন্দ্রনাথ-বিনোদিনীর স্বামী। নগেন্দ্রের পিতা সদর আলা ছিলেন। নগেন্দ্র তাহার পিতার একমাত্র পুত্র। নগেনের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি এল এ পড়িতেন। একজন পাশকরা শিক্ষক পেয়ে নববিবাহিতা বিনোদিনী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। বিনোদিনীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইতে লাগিল। দিনে দিনে উভয়ের প্রেম প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিনোদিনীর প্রকৃতির কি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল? না কিছুই না, তাহার স্বাভাবিক চপলতা অটুট রহিল। শৈশবের পিতা মাতার সোহাগের পরিবর্ত্তে কেবল স্বামীর প্রণয় তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে পরিবর্ত্তনে তাহার স্বভাবের গতির রোধ হয় নাই। নগেন্দ্রনাথ Sydney Smith's Female Education ও Mills' Subjection of Women. প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে হেতু, নগেনের চক্ষে বিনোদিনীর নৈসর্গিক চপলতা দোষ বলিয়া, পরিগণিত না হইয়া বরং গুণের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনী একে স্বভাবতঃ চঞ্চলা, তাহাতে আবার স্বামীর সাহার্য্য ও উৎসাহ পাইয়া আরো চপলা ও দুর্দ্দমনীয়া হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনীর একমাত্র দুঃখের কারণ যে তাহার শাশুড়ী তাহার চঞ্চল ও স্বাধীন প্রকৃতির পোষকতা করিত না। বিনোদিনীর চৌদ্দ বৎসরের সময় তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে।

তার পর আসুন পাঠক কমলিনীকে দেখিবেন আসুন। কমলিনী উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণা। গোলাবী বর্ণের একখানি শাটী তাহার সুকোমল অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। কমলিনীর নয়নদ্বয় স্থির, বয়স ২০ বৎসর। কমলিনীর যৌবন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! কুড়ি বৎসরে সে বুড়ী হয় নাই।

কমলিনী চুচুড়ার বালিকাবিদ্যালয়ে বিনাবেতনে দুই এক বৎসর পাঠ করিয়া কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল, কিন্তু সে বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ নামের যোগ্য নহে। কমলিনীর পিতামাতা সামান্য অবস্থার লোক; কন্যার মানসিক উন্নতির জন্য তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই। ১১ বৎসরের সময় কমলিনীর বিবাহ হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়সে কমলিনী শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া পতি জ্যোতিশ্চন্দ্রের সাহার্য্যে অনেক জ্ঞাতব্য সারবান বিষয় শিক্ষা করে। জ্যোতিশ্চন্দ্র অতি সামান্য লোকের পুত্র কষ্টে সৃষ্টে এল এ পাস করিয়াছিলেন, কিছুদিন বিএ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। পরে অর্থাভাবে তাঁহাকে বিদ্যালয়ের নিকট হইতে একেবারে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইয়াছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কণ্ট্রোলার জেনারেল আফিসে একটী পরীক্ষা দেন। পরীক্ষান্তে তাঁহার তথায় একটী ৩০ টাকা বেতনের চাকুরী হইয়াছিল; যে সময়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি তখন তাহার মাহিনা ৬০ টাকা হইয়াছিল। জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিদ্যানুরাগ অতি প্রবল ছিল। শুনা গিয়াছে বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারায় অশ্রুজল বহিয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়াছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। জ্যোতিশ্চন্দ্রের স্বভাব অতিশয় উদার। তিনি স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, অতি যত্নসহকারে কমলিনীকে নানা উপদেশ দিতেন; অনেক সারবান পুস্তক তাহাকে পাঠ করাইয়াছিলেন। জ্যোতিশ্চন্দ্রের তত্বাবধারণে বিদ্যালাভ করিয়া কমলিনীর যে ফল ফলিয়াছিল তাহার পরিচয় আজ পাঠকগণ পাইবেন।

কমলিনীর পিতার বাটীর নিকট বিনোদিনীর মাতুলালয়। বিনোদিনী মাঝে মাঝে প্রায় মামার বাটী আসিত। সেইসূত্রে কমলিনীর সহিত সখিত্ব সম্পাদিত হইয়াছিল। আজ অনেক দিনের পরে আবার ইহাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথম গার্হস্থ দুই চারিটী বিষয়ের কথোপকথন চলিতেছিল। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয় কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিয়াছেন ও আরও পারিবেন।

দ্বিতীয় স্বর আবার বলিতে লাগিল—"উঃ আমাদের কি দুঃখময় জীবন! এই অল্প বয়স হইতে আমরা মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত হইতে লাগিলাম। যত দিন প্রাণ ধারণ করিতে হইবে ততদিন এ দুঃখের আর অবধি নাই, বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন আরও ক্লেশকর হইতে থাকিবে। উঃ এত অল্প বয়সে জীবনের গাঢ় অন্ধকার আমাদিগের সমস্ত অঙ্গে ঢালিয়া পড়িয়াছে। যৌবন উদ্যানে প্রবেশ করিতে না করিতে আমরা বৃদ্ধা হইলাম। হায়! যখন কোন এক পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সহিত

আমার বা অন্য কোন নারীর অবস্থার তুলনা করি তখন আর কষ্টের সীমা থাকে না। যে কোন পঞ্চদশবয়স্ক যুবকের গতি পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে তাহার প্রত্যেক কার্য্য প্রণালিতে তেজঃ প্রকাশিত হইতেছে। অধ্যয়ন সময়ে যে উৎসাহ ও চিত্ত প্রফুল্লতা, ক্রীড়া বা হাস্য পরিহাসের সময় সেই তেজঃ, সেই উৎসাহ, সেই চিত্ত প্রফুল্লতা নয়ন গোচর হইবে। শৈশবে যে সকল বালকের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছিলাম, তাহারা অদ্যাপি ও বালক আছে, তাহাদের সে বালকত্ব ঘুচিলে তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় দেশভ্রমণে কত আনন্দ উপভোগ করিবে; কিন্তু আমরা যৌবনেই-যৌবনে কেন—এই বালিকাবস্থায় বৃদ্ধা হইলাম। এই পঞ্চদশ বৎসর বয়সে-যে বয়সে বালকগণ খেলিয়া বেড়ায়, সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা জানে না, বিদ্যালয়ের পাঠ অধ্যয়ন সমাপন ভিন্ন যাহাদিগের আর কোন কষ্ট সহ্য করিতে হয় না; যে বয়সে ইউরোপীয় মহিলাগণ প্রণয় কাহাকে বলে জানে না, সদা সর্ব্বদা খেলায় ও অধ্যয়নে যাপন করিয়া থাকে—সেই বয়সে আমাদিগকে মাতৃস্নেহ শিক্ষা করিতে হইয়াছে, সন্তান লালন পালন করিতে, সংসারের কুটিল চক্রে ঘুরিতে, ও হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় জঘন্য প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিতে হইতেছে। ধিক্ আমাদিগের জীবনে! কমল্ চুপ্ করে রয়েছ যে?”

কমল।—বিনোদ্ যা বললি সব সত্য ইহার কিছুই প্রতিবাদসহ নহে। তাই তোর কথা একাগ্র মনে শুনিতেছিলাম। বাস্তবিক আমাদিগের অবস্থা অতি জঘন্য, কিন্তু এ দুর্দ্দশা আমাদিগের গুরুজনের দোষেই ঘটিতেছে। বাল্যবিবাহই সমস্ত অনিষ্টের মূল। তোর যদি বিবাহ না হতো তা হলে অসময়ে এত অল্প বয়সে সন্তান পালনরূপ গুরুভার তোরে সহিতে হইত না। আর যদি বলিস্ আমারও তো বিবাহ হয়েছে, তবে আমার অদ্যাপি সন্তানাদি হয় নাই কেন, তার উত্তরে আমি এই বলতে চাই, আজও হয় নাই দুই দিন্ পরে হবে। যাহাই হউক বালিকা বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলে আমাদিগের আর নিস্তারের উপায় নাই। সুখের স্বচ্ছন্দের প্রথম সোপান স্বাস্থ্য। বাল্য বিবাহ আমাদিগের সে স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে। যাহার দশ বৎসরে বিবাহ হয় বারো বা তেরো বৎসরের সময় তাহার প্রায়ই গর্ভের সঞ্চার হয়। যে ১৩ বৎসরে বালক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, গাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক পঠনাদি কার্য্য ও সমাপন করিতে পারে না, সেই অল্প বয়সে বঙ্গনারীর অনেককেই সন্তানপ্রসবরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, আর কাহাকেও—বলতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে—সে বয়সে সর্ব্বনাশক পেটের দায়ে জীবন লীলা সম্বরণ করিতে হয়। হায়! এই অল্প বয়সের গর্ভ সঞ্চারের দোষে কত লোকের সোণার সংসার ছারখার হইতেছে, কত সহৃদয় স্বামী পত্নীহীন হইতেছেন। এ বিষময় ফল কেন ফলিতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর করা অত্যন্ত দুরূহ নহে। বালিকা বিবাহই সমস্ত অনিষ্টের মূল। আর যদি কোন্ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা গর্ভিণী হইয়া নিরাপদে সন্তান প্রসব করিতে পারে, তাহার প্রসবান্তে কি দশা ঘটে, তাহা অনেকটা আমাদিগের

বসন্তের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিনোদ বসন্তকে জানিস্? আমার ছোট পিসতুত ভগিনী।

বিনোদ।—নরেনের স্ত্রী তো—

কমল।—হেঁ। বিনোদ তুই দেখে থাকবি বসন্তের মুখশ্রী এক সময়ে অতি সুন্দর ছিল কিন্তু এখন যদি একবার দেখিস্, তাহা হইলে হয়তো আর তারে বসন্ত বলে চিন্তে পারবি না। তাহার আর সে সৌন্দর্য্য নাই, সে শরীর নাই, সে হাসি নাই। সে সদা সর্ব্বদা রোগে শোকে জর্জ্জরীভূত। বসন্তের আজ ২০ বৎসর বয়স। এই অল্প বয়সে তাহাকে দুই বার পুত্র শোক ভোগ করিতে হইয়াছে; প্রসবের সময় দুই বার সে মরণাপন্না হইয়াছিল। আমি বসন্ত সম্বন্ধে যাহা বলিলাম বহু সংখ্যক বঙ্গনারী সম্বন্ধে এইকথা খাটে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বঙ্গনারীর জীবনী এই কয়টী কথায় লিখিতে হইতে পারে। তেরো বৎসরে তাহার প্রথম গর্ভ সঞ্চার হয়। যাহার পরমায়ু অনন্ত তিনি প্রথম বারে নিরাপদে সন্তান প্রসব করিয়া অবধি অসুখে ভুগিতে লাগিলেন। আজ তাহার মাথা টিপ্ টিপ্‌নি, কাল জ্বর, পরশ্ব গাত্র কামড়ান এইরূপে মাস কতক কাটিয়া গেল। অনেক ঔষধ খাইয়া একটু সুস্থ হইলে, অমনি আবার গর্ভ। এবার মরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অতি কষ্টে গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষা হইল, কিন্তু যাহাকে গর্ভে পোষণ করিতে তাঁহার এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ভোগ, তাহাকে ইহলোকে পদার্পণ করিয়াই জন্মের মত বিদায় লইতে হইল। পুত্র বা কন্যা শোকাতুরা গর্ভ ধারিনী ওরফে চৌদ্দ বৎসরের বালিকা অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনবরত অশ্রুজলে তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরো ভগ্ন হইল। আবার ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে সে শোকদুঃখ নিবিয়া গেলে, আবার মাসকতক পরে তাহার গর্ভের সঞ্চার হইল। এবার নিরাপদে প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হইল। এইরূপে শোকে, দুঃখে, ভাবনায়, ক্ষণস্থায়ী হাসিতে বঙ্গবামার জীবন কাটিয়া যাইতেছে। অতএব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম বালিকাবিবাহ রহিত করা উচিত। কিন্তু এ প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইলে কুমারীদিগের ভাবী উপকার সাধিত হইতে পারিবে, বিবাহিতাদিগের অবস্থার কিছুই উন্নতি হইবে না। এক্ষণে আমাদিগের নিজের দুঃখের বোঝা কিসে কমে সে বিষয়ের আন্দোলন করা উচিত। প্রথম দুঃখ ও অসন্তোষের কারণ শাশুড়ীগণের অত্যাচার। বিনোদ তোর শাশুড়ী তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে?

বিনোদ।—নিতান্ত মন্দ নহে। আমার শাশুড়ী আমায় অনেকটা ভাল বাসেন, কিন্তু সকল সময়ে আমি তাঁহার মনের মত কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া মধ্যে২ তিনি আমার উপর চটিয়া যান। কমল তুমি জান, আমি কিছু স্বাধীনতাপ্রিয়া। আমি কলাবৌয়ের মত ঘোমটা দিতে পারি না এবং সময়ে সময়ে সমবয়স্ক কোন সচ্চরিত্র আত্মীয়ের সহিত নিশঙ্কচিত্তে কথোপকথন করিয়া থাকি, তাই শাশুড়ী আমার "বেহায়া" বলেন এবং শাশুড়ীর সমবয়স্কাগণ ও আমার ঐ মধুর আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে মধ্যে মধ্যে ক্রটী করেন না। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন না কেন, আমি আমার স্বভাবের গতি কখনই রোধ করিতে পারিব না। বল কি কমল একদিন গলা ভরিয়া মন খুলিয়া হাসিতে পাইব না, এ

অত্যাচার আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। আমাদিগের শাশুড়ীগণ চায় আমরা ঠিক যেন পোষা পাখীর মত অন্তঃপুররূপ পিঞ্জরে সদা সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকিব, যখন তাহাদিগের অভিরুচি হবে তখন তাহারা খেতে দেবেন আমারা উচ্চ বাচ্য করিব না, মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকিব হাসিব না—আর যদি হাসি মুখের হাসি যেন ঠোঁটেই মিলিয়া যায়—কোনপুরুষের সহিত—সেপুরুষ সমবয়স্ক হউন বা বয়সে আমাদিগের অপেক্ষা ছোট হউন—কোন প্রসঙ্গ লইয়া কথোপকথন করিতে পারিব না। উঃ কি অত্যাচার কমল এসব কি সহ্য হয়। আর যেই পারুক আমি তা কখন সহ্য করিতে পারিব না। যখন এ সমস্ত বিষয় ভাবি তখন জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মে, মন নৈরাশ্যসাগরে মগ্ন হয়। এই নৈরাশ্যাকাশে নগেনের ভালবাসা রূপ ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া আমি জীবন ধারণ করিয়া আছি। আহা! এরূপ গুণের স্বামী অতাল্প মহিলার অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। এই রূপ উদারপ্রকৃতি স্বামীর সংখ্যা অতি বিরল। আমি আমার অবস্থার জন্য যত না দুঃখিত নগেন্ আমাপেক্ষা আরও অসন্তুষ্ট। কিসে আমার মানসিক দুঃখের পরিমাণ হ্রাস হয় তাহার জন্য প্রাণাধিক আমার নিয়ত যত্নবান্। হায়! এরূপ গুণের স্বামী পেয়ে শাশুড়ীও অন্যান্য গৃহিণীগণের অত্যাচারে আমি প্রকৃত নারী নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেছি না এ লজ্জা এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। উঃ বস্তুত পিঞ্জরের পাখী হইয়া রহিয়াছি; মনের উৎসাহ বা উদ্যম নাই-আর থাকিলে দেখাইবার সুবিধা নাই। হায়! হতভাগ্য জীবন! ধিক্ বঙ্গবালাজীবনে!

যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল অদূরে উদ্যান পার্শ্বে একটী কোলাহল উত্থিত হইল। কোলাহল বালক কণ্ঠবিনিসৃত। একটু পরে আবার সে কোলাহল শূন্যে মিশাইল। এই কোলাহলে রমণীগণের কথোপকথন থামিল; দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধতা যেন চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্তপরে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বালক কণ্ঠবিনিসৃত স্বর শুনা গেল, বালক বলিতে লাগিল "কেন আমরা সুরেন্দ্রের জন্য দুঃখ করিতেছি? কেন দুঃখ করিয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নামে কালি দিতেছি? সুরেন্দ্র স্বদেশের তরে, জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার তরে, আজ কারাগারে। যদি নিস্বার্থ পরোপকারের বিনিময়ে কাহারও কারাদণ্ড হয়, তাহা হইলে কেন আমরা সে কারাদণ্ড গৌরবের সামগ্রী মনে না করিয়া অপমান নিদানভূত বোধ করিব। সুরেন্দ্র আজ পরোপকারের তরে কারাবাসে, তাই তাঁহার এত গৌরব। সুরেন্দ্রনাথ! যখন তোমার কারাদণ্ডে আমরা তোমাকে ও আমাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারিয়াছি, তখন আমাদিগের ভবিষ্যৎ ক্রমে আলোকময় হইতে চলিল। ভ্রাতৃগণ! এস আমরা বুক বাঁধিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে অনুকরণ করিতে শিক্ষা করি। প্রিভি কাউনসিলে যাহাতে এ বিষয়ের পুনঃ বিচার হয় চল তাহার জন্য কার্য্য করিগে, দ্বারে দ্বারে গিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিগে"। ক্রমে সে বালকের স্বর আর শুনা গেল না। শেষ ভাঙ্গা ভাঙ্গ দুই চারিটী কথা "লালমোহন" "ব্রাইট" "কবেট্" "ওডোমেল" রমণীদ্বয়ের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণ রমণীদ্বয় একাগ্রমনে বালকের কথা শুনিতেছিল। যখন আর শুনিতে

পাইল না বিনোদিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে দীর্ঘ নিশ্বাসটী বিনোদিনীর হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে বিনোদ বলিতে লাগিল "কমল কি শুনলি! যাহা শুনলি তাহাতে তোর মনের ভাব কি হলো!"

কমল।—কি আর বল্‌বো বল, যাহা হবার নয় তার জন্যে ভেবে কেন কষ্ট পাস্‌। তোর ভাবগতিক দেখিয়া তোর মনের ভাব বুঝিতে পেরেছি। যে স্রোত এইমাত্র বাগানের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গেল, তোর অভিলাষ, তোর দুরাকাঙ্খা যেন তাহাতে পা ঢালিয়া দিতে পারিস্‌। তুই কি পাগল হয়েছিস্‌? ঐ দুরাকাঙ্খা পরিত্যাগ কর, কিসে শাশুড়ীদিগের অত্যাচার নিবারিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

কমলিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে অদূরে মলেরশব্দ শ্রুত হইল। কমলিনী ও বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল. যে দিক হইতে মলের শব্দ উত্থিত হইতেছিল সেইদিকে নয়ন ফিরাইল, দেখিতে পাইল দ্বাবিংশ তিবর্ষীয়া এক যুবতী অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে মৃদুপাদবিক্ষেপে তাহাদিগের দিকে আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে আগন্তুকা তাঁহাদিগের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া মুচকে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "কিলো আমায় দেখে ভয় পেয়েছিস না কি? দাঁড়া তোদের শাশুড়ীদের চিঠি লিখে, তোদের দুরভিসন্ধির কথা জানাইতেছি"

বিনোদ ও কমল।—কামিনী দিদি তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কামিনী।—কেন? ওই গাছের পাশে। প্রথম যখন বাগানে এলুম তখন তোদের হাসির চেউ বহিতেছিল, মনে করলুম দেখা দেব না, লুকায়ে থেকে তোদের হাসির কারণ অবগত হই।

ক্রমশঃ

প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও জাতি বিভেদ।

ইতি পূর্ব্বে বিজ্ঞানদর্পণে প্রাচীন হিন্দুদিগের দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্রে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া যে সময়ে তাঁহারা সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার ব্যবহারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন আমরা সেই সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঐ সময়ের বিবরণ গৃহ্য সূত্র, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও যাজ্ঞবল্ক্য হইতে প্রধানতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ্যসূত্র সমূহ কতকগুলি সংক্ষিপ্ত উপদেশপূর্ণ নিয়মনিচয়ের সংগ্রহ মাত্র। উহারা প্রধানতঃ গার্হস্থ্য কার্য্য কলাপের বিষয় বর্ণন করে বলিয়া কল্পবেদাঙ্গের শ্রৌতসূত্রসমূহ হইতে বিভিন্ন। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় ইহা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। ইহা "মানব" নামক এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পৌরাণিক অনুষ্ঠান সমূহের পদ্যলিখিত বিবরণমাত্র। উঁহারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আধুনিক দিল্লির অনতি দূরে বাস করিতেন। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান বিবরণ আদৌ তাঁহাদের গৃহ্য-সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরে এই সকল সূত্রে ধর্ম্ম, নীতি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহুল উপদেশ কোন অজ্ঞাত গ্রন্থকার বা

গ্রন্থকারদিগের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী কোন এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণ ঐ সমুদয় একত্র সংগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি লোকের শ্রদ্ধা, ও সমাদর আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, বোধ হয় পৌরাণিক ঋষি মনুকে উহার গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকৃত গ্রন্থকার কে, ও উহা কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা নাই; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে সচরাচর যাহাকে মনুসংহিতা বলে তাহা বেদ ও শ্রৌতসূত্র সমূহের পরবর্ত্তী যাবতীয় সংস্কৃত পুস্তক অপেক্ষা প্রাচীন ও পবিত্র। যদিও ইহা স্মৃতি বা বেদপরবর্ত্তী শাস্ত্রের শিরোস্থানে আছে; তথাপি যেমন দর্শনশাস্ত্র সমূহ উপনিষদের দ্বারা বেদের সহিত সম্বদ্ধ, উহা তেমনি ঐ সকল শ্রৌতসূত্রদ্বারা বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট। বেদের পরবর্ত্তী যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা ইহা প্রীতিজনক; যেহেতু ইহাতে অতি পুরাকালিক হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও মানসিক অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, ও ব্রাহ্মণেরা যে সকল অনুশাসন অবলম্বন করিয়া জাতিবিভেদ প্রণালী স্থাপন ও আপনাদিগকে সকলের প্রভু করিতেছিলেন তৎসমুদায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্ত, অপরাপর বিষয়ের বিবেচনা করিতে গেলে ইহা সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত; এবং ইহার কতকগুলি নৈতিক উপদেশ অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায় না।

আমরা একণে উক্ত গ্রন্থকে যে আকারে পাইয়াছি তাহা কতকগুলি নিয়মের সংহতিমাত্র। ঐ সকল নিয়ম ভারতবর্ষের কোন বিশেষ অংশে বহুকাল ব্যাপিয়া প্রচলিত ছিল ও পুরুষপরম্পরায় মৌখিক প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে সমগ্র ভারতবর্ষ কদাপি একশাসনের অধীন ছিল না। কতিপয় মাত্র পরাক্রান্ত নরপতি অতিবিস্তৃত প্রদেশের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে রাজ চক্রবর্ত্তী বলিত। মনুর নিয়মাবলিকে "সংহিতা" বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে ঐ সকল নিয়ম উক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে ইহা হিন্দুদিগের ব্যবহার শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের গ্রাহ্য হইতে ইহাকে বহুকাল লাগিয়াছিল। যদিও একণে সমগ্র ভারতবর্ষে বেদের নীচেই ইহার সমাদর; তথাপি আদৌ ইহা কেবল কোন বিশেষ স্থানে প্রচলিত ছিল মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসময় মিত্র।

মধুযামিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে হিরন্না গাভী সকল লইয়া পূর্ব্ববৎ পর্ব্বতপৃষ্ঠে আসিয়া, যে বৃক্ষমূলে নবাগত যুবা বহুক্ষণ রাখিয়া তাঁহারই বাঁশরীবাদনে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-

ছিলেন, তিনি একাকিনী সেই স্থলে একটী নতীর বৃক্ষ-শাখায় স্বীয় নবীন দেহের ভার দিয়া দাঁড়াইয়াছেন; সম্মুখে স্থানে স্থানে নীল কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের গিরিমালা, শতঃবর্ষ সমুন্নত বৃক্ষরাজী ও অরণ্যানী; নিকটে বনানীর প্রাতঃবিকসিত কুসুম মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে কম্পিত; নিম্নে শস্য ও তৃণ সমাচ্ছাদিত এবং নানাবর্ণের পতঙ্গ পরিশোভিত ভূমিখণ্ড; ঊর্দ্ধে সুনীল গগনে শুভ্র মেঘরাশি নিশ্চলভাবে স্থিত। হিঙ্গনা নিশ্চল ও চিন্তিতভাবে দণ্ডায়মানা, পার্শ্বে গাভী সকল চরিতেছে, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার আর তাদৃশ মনোযোগ নাই; আর যেন বাহ্য জগতে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয় কিছুই নাই। হস্তের বংশী হস্তেই আছে; উহাতে এতাবৎকাল যাহা যাহা গাইয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত অবস্থাভেদে অসাময়িক ও অরুচিকর। নবভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে। নবআশা, নবইচ্ছা, নবরুচি নবীন যৌবনে নবীন প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া অনুরাগ শিল্পীর হস্তে অন্তরজগতের নূতন সংস্করণ, সুখ ও শোভার আয়োজন ও সম্পাদনের ভার দিয়াছে; গতকল্য উহার প্রথম প্রস্তাব হইয়াছিল, অদ্য উহার কুহকিনী শক্তির সূচারু কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, হিঙ্গনা এই জন্য বাহ্য জগতে উদাসিনী।

হিঙ্গনা এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মানা আছেন, এমন সময়ে ক্রীড়াশীল হরিণীর ন্যায় চঞ্চলচরণে, সুহাস্যবদনে প্রাতঃ-প্রফুল্লিত কুসুমরাশি হস্তে, তাঁহার একজন সমবয়স্কা প্রিয়তমা সঙ্গিনী সমীপবর্ত্তিনী হইলে, হিঙ্গনার উপস্থিত মোহের অপলাপ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার সহচরী অরুণা নব-কুসুম আভরণে বিভূষিতা হইয়া তাঁহাকে সাজাইতে আসিয়াছেন। অরুণা নিকটে আসিয়া প্রেম-ভরে অপরাজিতার একটী মনোহর সিঁতি হিঙ্গনার লম্বিতবেণীর সহিত সংলগ্ন করিয়া স্নেহালিঙ্গন করিলেন। পরে উভয়ে সেই সুশীতল বৃক্ষমূলে বসিয়া চয়িত বনফুল সকল একে একে লইয়া উভয়কে যত্নে সাজাইতে লাগিলেন। উভয়ে ফুলালঙ্কারে শোভিতা হইলে, অরুণা হিঙ্গনাকে কহিলেন, 'হিঙ্গনা! আজ তোমায় ফুলদিয়ে সাজিয়ে কেন সন্তুষ্ট হচ্চিনি বলদিখিন?'

হিঙ্গনা।—কেন?

অরুণা।—অন্য দিন তোমায় পুতুলের মত সাজাই, আজ যেন তা নয়।

হিঙ্গনা।—(সচকিত) কেন অরুণা? কেন? আজ কি? আমি ত সেই, এইত সেই সব গরু, এইত বাঁশী—এই।

অরুণা।—তাত সব দেখ্‌চি, কিন্তু বোধ হচ্চে তুমি যেন কোন রাজার মেয়ে।

হিঙ্গনা।—(ঈষৎ হাসিয়া) তাই কি অরুণা আজ আমায় তুমি সাজিয়ে সন্তুষ্ট হচ্চ না। অরুণা আজ তোমার চিরদিনের সঙ্গিনীতে এরূপ ভ্রম কেন হচ্চে?

অরুণা।—হিঙ্গনা, যে অশোক তরু আমরা আপন হাতে রোপণ করিয়াছি, প্রতিদিন যাহার মূলে জলসেচন করিয়া সজীব করেছি, দেখ এখন সেই তরুকে আমরা পূজা করি, তাহারি মুকুল লয়ে ব্রত করি।

হিঙ্গনা।—অরুণা তুমি কি আমার দুই দিনের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন দেখ্‌চো।

অরুণা।—হিঙ্গনা, আমি সত্যই বল্‌চি তোমার ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি, তোমার সেই আধ-হাসি মুখ খানি আজ

কোথায়? তোমার নয়নদুটী কেন ছল ছল? নয়নের তারা দুটী বা কেন এক দিকেই রয়েছে? তোমার সে চঞ্চল, ক্রীড়াশীল প্রকৃতি আজ কোথায়?

হিন্দনা।—(সকৌতুকে) আমি মনে করিছিলুম, অরুণা, ফুলের গহনায় আমায় ভাল দেখাচ্চে; কৈ তাত তুমি কিছুই বল্লে না; তুমি চোক্ মুখের কথা বল্লে;—হাঁ। অরুণা রাজকন্যারা এই রকম ভাবে থাকে?

হিন্দনার এই কথা শুনিয়া অরুণা অল্প-বয়স হেতু কিছু সদুত্তর দিতে পারিলেন না; ইতি মধ্যে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সেই তরুণ পুরুষটী সম্মুখে আসিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন "ক্ষুব্ধ হইবেন না, অরুণা এইমাত্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য, তিনি স্থির সরোবরে প্রতিভাত কমলের ছায়াটী মাত্র দেখিতেছেন, আমি নব রবি কিরণে স্বচক্ষে দেখিতেছি, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুণ, আমি বলিতেছি।" হিন্দনা তাঁহার সহসা আগমনে চকিত, তাঁহার মধুময় বাক্য শ্রবণে প্রীত, এবং প্রকৃতিগত লজ্জারূপে রঞ্জিতকপোলা হইয়া হেটমুখে অবস্থিতা। অরুণা চকিতা ভীতা ও চঞ্চলা হইয়া এক এক বার হিন্দনার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হিন্দনা উঠিয়া যাইবেন কি রহিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। অভ্যাগত পূর্ব্বদিনের সম্মতি অনুসারে আসিয়াছেন, গান শুনা-ইতে হইবে কিন্তু অরুণা কি মনে করিবেন? একি দায়, কেন আজ অরুণা সিন্নিদেশে আসিলেন, কেনই বা তাঁহাকে ফুলঅল-ঙ্কারে সাজাইলেন? তিনি কি ফুলাভরণে নিতান্তই রাজকন্যার ন্যায় দেখাইতেছেন? অবশ্য ভালই দেখাইতেছেন তা না হলে অভ্যাগত এরূপ বলিবেন কেন? অরুণা অবশ্য ভালই করিয়াছেন। তিনি কি তাঁহার পরিচিত এরূপ পরিচয় দেওয়া কি উচিত? যেজন চিরদিনের সঙ্গিনী তাঁহাকেই বা সমস্ত বলিতে কেন লজ্জাবোধ হইতেছে? মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে এই সকল ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন উঠিয়া যাওয়াই কি শ্রেয়? অরুণার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, অরুণা অগ্রসর হইলেন। তখন আর সে স্থলে থাকা অনুচিত বোধে মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্যাগত সম্মানসূচক দূর হইতে মৃদু বচনে কহিলেন, "সুন্দরি! যদি চলিয়া যাওয়া একান্তই অভিমত হয়, তাহা হইলে, আপনারা অগ্রসর হউন। আমি গাভীগণ * লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই-তেছি।" অরুণা হিন্দনার প্রতি পুনঃ কটাক্ষ করিলেন। হিন্দনা তখন অবনতমুখে মৃদু-বচনে কহিলেন, "মহাশয় সামান্য দুঃখী-জনের জন্যে আপনি কেন ঈদৃশ কষ্ট লইবেন?" নবাগত হাসিয়া কহিলেন "সুন্দরি! ঘনশ্যামদেবের † নিকট প্রার্থনা করি যেন, চিরদিন আপনার এইরূপ প্রিয়কার্য্য করিতে পাই।" নব-প্রেমে দুর্ব্বল-হৃদয়া হিন্দনা এরূপ উক্তির কি উত্তর দিবেন? তথাপি সেই চলচল স্নিগ্ধ নয়নপলাশ একবার মাত্র তুলিয়া কহিলেন "আপনি গাভী সকল লইয়া সঙ্গে আসিলে আমার পিতা মাতা কি বলিবেন?" যুবা প্রতিহত না হইয়া কহিলেন, "অভ্যা-

* গুণ্ডজাতিদিগের ভিতর অবিবাহিতা যুব-তীর জন্য দাসের কার্য্য করা প্রণয়ের লক্ষণ; ইহার উল্লেখ পশ্চাতে সবিস্তারে করা যাইবে।

† নিকটস্থ জাগ্রত দেবতা।

শীলে! আমি যদিও ক্ষত্রিয় তথাচ নিতান্ত দুঃখী, ধনুর্ব্বাণই একমাত্র আমার উপজীবিকা, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, এবং আপনার নিকট থাকার অভিমত হয়, তাহাহইলে কিয়দ্দিনের জন্য উপস্থিত উপজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া যদি আপনার শ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা আমার কি মঙ্গলের বিষয় হইতে পারে।" হিঙ্গনা এইক্ষণে অভ্যাগতের অনুরাগের সুস্পষ্ট লক্ষণ, ও ঐকান্তিকতা দর্শনে যৎপরোনাস্তি বাধিত-হৃদয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতমুখে বলিলেন, "মহাশয়, অদ্য আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন, আমি পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তাঁহাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে——।" হিঙ্গনার এইরূপ বাক্য শ্রবণে, তিনি কহিলেন "সুন্দরি, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, দাসের আর ভিন্নমত কি আছে, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আজ অবধি সেই আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হইব।" তিনি এই বলিয়া ছল ছল নয়নে হিঙ্গনার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। হিঙ্গনার যাইতে যাইতে বারম্বার পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এক একবার ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন, অরুণা ভাবিলেন এই বাচাল পুরুষের সহসা আগমনে প্রিয়সখী ভীতা হইয়াছেন!!

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

নরেনের স্বর্গ দর্শন।

ঠাকুরমার গল্প না শুনিলে নরেনের ঘুম আসিত না। সন্ধ্যা হইলেই নরেন ঠাকুরমার কাছে গিয়া বসিত ও কত রকম গল্প শুনিত। ঠাকুরমার গল্প ঠাকুরদের কথা লইয়াই হইত। ঠাকুরদের কথা বলিতে গেলেই স্বর্গের কথা আসিত; ইন্দ্রভুবন, পারিজাত কানন, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র ইত্যাদি কত রকম গল্প হইত। নরেন এই সকল কথা এক মনে শুনিত, নরেনের মনে হইত স্বর্গ কি দেখা যায় না? স্বর্গ দেখিবার জন্য নরেনের বড়ই ইচ্ছা হইল।

নরেনের অবিনাশ কাকা নরেনকে এক খানি ছবির বই দিয়াছিল। নরেন ছবি দেখিতে বড় ভাল বাসিত। ঘরের এক কোণে বসিয়া নরেন ছবি দেখিতেছিল। প্রথম ছবি খানি ইন্দ্রালয়। সহস্রলোচন ইন্দ্রদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব বালকগণ দাঁড়াইয়া; তাহাদের কেমন হাসি হাসি মুখ। নরেনের ইচ্ছা হইল ঐ বালকদিগের সহিত খেলা করে। এমন কি চারিদিক চাহিয়া ছবির বালকগণকে নরেন বলিয়াছিল "আমার

* আমরা বালকদিগের নিমিত্ত সময়ে সময়ে এই প্রকার এক একটি গল্প লিখিব।

মত্থে ভাব কর্‌বে, আমি সন্দেশ দিব।” আর এক খানি ছবি, কমলকাননে বীণাপাণি সরস্বতী বীণা হস্তে বিরাজ করিতেছেন সম্মুখে ছোট ছোট বালকগণ বসিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং বীণাপাণি বালকগণকে পড়াইতেছেন। নরেন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়িতে ভালবাসিত না। গুরু মহাশয় বড় ধমক দেন। ছবির বালকদিগের সহিত বসিয়া নরেনের পড়িবার ইচ্ছা হইল। তৃতীয় ছবিখানি বৈকুণ্ঠধাম। পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি বালক ধ্রুবের হস্ত ধরিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে উপস্থিত। লক্ষ্মী দুই হাত বাড়াইয়া কত আদর করিয়া ধ্রুবকে কোলে লইতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মনোহর ছবি দেখিয়া নরেনের স্বর্গ দেখিবার সাধ আরও প্রবল হইল। কাহার না হয়?

নরেন মনে করিল, ঠাকুরমা স্বর্গ দেখিবার সন্ধান বলিতে পারেন? একদিন নরেন ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “হ্যাঁ, ঠাকুরমা, ঐ যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, আঁা, ঐ যে চাঁদ উঠেচে আঁ্যা, ওর ভিতর কি স্বর্গ আছে?” ঠাকুরমা বলিল, “হাঁ দাদা ওরই ভিতর স্বর্গ আছে”। “আচ্ছা, ঠাকুরমা স্বর্গ কি দেখা যায় না”। “এখনকার লোকে কি স্বর্গ দেখিতে পায়। এখন যে ঘোর কলি, পাপে ভরা। সে কালের লোকেদের সঙ্গে ঠাকুর দেবতারা কথা কহিতেন। তাঁরা স্বর্গ দেখিতে পাইতেন।”

নরেন তাহার অবিনাশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল “হ্যাঁ কাকা আকাশের ভিতর যাওয়া যায়?” “দূর, আকাশের কাছে গেলে মানুষ মরে যায়, আকাশ কেবল ধোঁয়া বইত নয়।” “তবে দেবতারা থাকে কেমন করে” নরেনের কাকা হাসিয়া বলিল “দেবতারা কি আর আছেন, তাঁরা ধোঁয়ার ভিতর দম্‌ আটকে মরে গেছেন। তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে কেবল একজন আছেন, কিন্তু তাঁকে লইয়াও টানাটানি হইতেছে, তিনিও আর টেঁকেন না”। নরেন বুঝিল কাকা তামাসা করিলেন।

একটু সূর্য্যকিরণ নরেনের বাক্সর মধ্যে ঢুকিয়া খেলা করিতেছে। কখন একটি বেলোয়ারির মার্বেলের উপর পড়িয়া কত রকম রং ফলাইতেছে। আবার সরিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নরেন এক দৃষ্টে বাক্সর দিকে চাহিয়া স্বর্গ দেখিবার উপায় ভাবিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কিরণ স্বর্গে থাকে, বলিতে পারে কিরূপে স্বর্গ দেখা যায়। ছেলে বুদ্ধি তাড়াতাড়ি গিয়া কিরণটুকুকে হাত চাপা দিয়া ধরিল “আঁা. তুমি আমার খেলানা লইয়া খেলা করিতেছ, আজ তোমায় ছাড়িব না, আগে বল আমায় স্বর্গ দেখাইবে” কিরণটুকু হাসিতে হাসিতে নরেনের আঙুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া গেল. নরেন, শুনিতে পাইল কে যেন বলিল সহজে কি স্বর্গ দেখা যায় দিব্য চক্ষু পাইবার চেষ্টা কর, তবে স্বর্গ দেখিতে পাইবে।

দিব্য চক্ষু পাইলেই স্বর্গ দেখা যায়। তবে আর কি নরেনের দুটি টাকা ছিল. বাক্স হইতে টাকা দুটি লইয়া কেষ্টোর দোকানে ছুটিল। “কেষ্টো, কেষ্টো দিব্যচক্ষু আছে”। “দিব্য চক্ষু, না বাবু, আমরা দিব্যচক্ষু বেচি না, লজঞ্চুষ চাই”। “না, ও সব কিছু চাই না”।

একদিন নরেন বাগানে বেড়াইতেছে, একটি সুন্দর প্রজাপতি আসিয়া একটি গোলাপ ফুলে বসিল। নরেনের একটী প্রাণী

ছিল, পাখীকে খাওয়াইবার জন্য নরেন কড়িং দেখিলেই ধরিত। এটিকেও পা টিপে টিপে যাইয়া ধরিল। তাইত কড়িং কি পাখীর মতন পড়িতে পারে। এমন সুস্বরে কথা কয় কে। নরেন এমন সুন্দর কথা ত কখন শুনে নাই। অবাক হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, তাহার হাতের ভিতর কড়িংটির উপর বসিয়া একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী। প্রজাপতির ন্যায় বেশ ভূষায় ভূষিতা। পরিধানে প্রজাপতির ডানা। দেখিতে বড়ই সুন্দর। তিনিই নরেনকে বলিতেছিলেন "ছি বাবা, কাহাকেও পীড়ন করা ভাল নয় কড়িংটি ছাড়িয়া দাও, অনেক দূর আসিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে, তাই তোমার গোলাপ ফুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল, ছাড়িয়া দাও, আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে"। "নরেন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমার বাড়ী কত দূর"। "ঐ যে আকাশে একটি আলো দেখিতে পাইতেছ ঐ খানে আমার বাড়ী"। এই বলিয়া নরেনকে একটি আকাশের তারা দেখাইয়া দিল। "ও তবে তুমি স্বর্গে থাক; তোমায় কখন ছাড়িব না। একবার আমাকে স্বর্গ দেখাইতে পার, তা হ'লে ছাড়িয়া দিই, নতুবা আমার বাক্সর ভিতর পুরিয়া রাখিব"। সুন্দরী বড়ই বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি আর কেহ নয় স্বর্গের একটি অপ্সরা। অপ্সরা নরেনের আবদার শুনিয়া অবাক। নরেন তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল "আচ্ছা, স্বর্গ না দেখাইতে পার, আমাকে দিব্যচক্ষু দাও, তা হ'লে তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি"। "দিব্য চক্ষুর যে দাম অনেক"। "কত দাম আমি এখখনি তোমায় টাকা দিতেছি"। অপ্সরা বলিল "বোকা ছেলে, স্বর্গের জিনিব কি তোমাদের সামান্য টাকায় পাওয়া যায়, স্বর্গের টাকা চাই। তা এক কাজ কর তোমাকে একটি ছোট কৌটা দিতেছি একটি সুকাজ করিলেই কৌটার মধ্যে একটি টাকা আপনি আসিবে। কিন্তু একটি কুকাজ করিলেই জমানো টাকা হইতে একটি উড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন তোমার এক কৌটা টাকা হইবে, আমি আসিয়া তোমায় দিব্য চক্ষু দিব"।

নরেন হাঁ করিয়া কথা শুনিতেছিল, কড়িং আলগা পাইয়া একলাফে চলিয়া গেল নরেন কৌটা লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিল। নরেন বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন ভিখারী একটী পয়সার জন্য চীৎকার করিতেছে। নরেনের কাছে পয়সা ছিল, কিন্তু ভিক্ষুককে দিবার ইচ্ছা ছিল না। নরেন ভিক্ষুককে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল এমন সময় তাহার অবিনাশ কাকাকে জানালায় দেখিতে পাইল। অবিনাশ কাকা নরেনকে দান করিতে দেখিলে বড় খুসি হন এবং দানের চতুর্গুণ পুরস্কার দেন। কাকাকে দেখিয়া নরেন ভিখারীকে দুইটী পয়সা দিল। সে দিন নরেনের কাকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, নরেনকে একটী আধুলী বকসিস দিলেন। নরেন মনে করিল দেখি দেখি কৌটায় টাকা আসিয়াছে কিনা, ভিখারীকে পয়সা দেওয়া ত খুব ভাল কায। কৌটা খুলিয়া দেখিল কোকা। কে যেন বলিল "আধুলির লোভে পয়সা দিয়াছিলে, আধুলি পাইয়াছ আর টাকা পাইবে না।"

নরেনের বন্ধু বরেনের বড় জ্বর। নরেন বরেনকে দেখিতে গিয়াছিল। বরেন ডালিমের জন্য বড় আবদার করিতেছে। বরেনের

মা বুঝাইতেছিল "ডালিম কোথা পাব বাবা, ছিঃ কেঁদনা, এই দেখ মড়া বাঁধা দিয়া তোমার চিকিৎসা হইতেছে"। ছেলের ডাকি শোনে; বরেনের মার কথা শুনিয়া নরেনের বড়ই দুঃখ হইল, সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেষ্টোর দোকানে আসিয়া দুটি বেদানা কিনিয়া বরেনকে দিয়া আসিল। বরেনের মা কত আশীর্ব্বাদ করিল। ঠুন্ ঠুন্! ওকি! নরেন কৌটা খুলিয়া দেখে দুটি চক্‌চকে কর্‌করে টাকা কৌটায় আসিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া নরেন দেখিল, তাহার ছোট বোন "বুড়ী" তাহার এ, বি লিখিবার খাতা লইয়া হিজিবিজি কাটিতেছে। "পোড়ার মুখী, কি কচ্ছিস্" বলিয়া বুড়ীকে একটী চড় মারিয়া খাতা কাড়িয়া লইল। ঠুন। কৌটার একটি টাকা নাই।

একদিন নরেন কতকগুলি সিসের ফৌজ লইয়া খেলা করিতেছে। দুই দিকে দুই দল সৈন্য বন্দুকঘাড়ে খাড়া রহিয়াছে। নরেন একবার একটীকে সরাইতেছে ওটিকে সম্মুখে আনিতেছে, আর একটীকে পশ্চাতে দাঁড় করাইতেছে। ভয়ানক ব্যস্ত। তুমুল সংগ্রামের পূর্ব্বে কোন্ সেনাপতি স্থির থাকিতে পারেন? এমন সময়ে বুড়ি ডাকিল "দাদা দাদা, আমার অত্তের নিশেন পয়ে গেল, অ্যা—"। আঃ এমন সময়েও বিরক্ত করে। একবার মনে করিল ধমক দিয়া বুড়ীকে তাড়াইয়া দিই। কিন্তু আবার মনে পড়িল মা বলিয়াছেন ছি ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে কি ঝগড়া করে,তারা যে ছেলেমানুষ, তাদের কি বুদ্ধি আছে। যুদ্ধ থামাইয়া, নরেন বুড়ীর রথের নিশান সারিয়া দিল। ঠুন। আবার টাকা আসিয়াছে। তাইত স্বর্গের টাকা ত খুব সস্তা।

প্রথম প্রথম টাকার লোভে সৎকার্য্য করিয়া নরেনের এমনই অভ্যাস হইয়া গেল যে নরেন এখন আর ভুলেও অন্যায় কার্য্য করে না।

আজ নরেনের এক কৌটা টাকা। বড়ই আহ্লাদ। তুমি বলিতেছ নরেনের এত আহ্লাদ কেন, তোমার এক সিন্দুক টাকা আছে তোমার ত এত আহ্লাদ হয় না। কেন হবে এ টাকায় আর তোমার টাকায়? নরেন কি পরের অন্ন মারিয়া টাকা জমাইয়াছে, না অপরকে ঠকাইয়া নিজের কৌটা পূর্ণ করিয়াছে?

অপ্সরার কথা মিথ্যা হয় না। এখন স্বর্গ দেখিবার উপায় হইল। মনের আনন্দে নরেন বাগানে বেড়াইতেছে। এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাঁড়াইল। নরেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল "তোমার হাতের কৌটা দেখিয়া আসিয়াছি, উহাতে স্বর্গের টাকা আছে, আমারও ঐ রূপ এক কৌটা টাকা ছিল, কাল গঙ্গা স্নান করিবার সময় কৌটাটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যাইয়া বাস করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্বল হারাইয়াছি, কেমন করিয়া যাই। আমাকে কৌটাটি যদি দাও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া যাই। সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী তো জানিত কতকষ্টে এক কৌটা টাকা হয়। নরেনের এত যত্নের ধন চাহিতে তাহার লজ্জা হইল না।

কিন্তু নরেনের মনে এরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। নরেন ভাবিল, সন্ন্যাসী যে প্রকার বৃদ্ধ হইয়াছে, টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, আমার

নিস্তর সময় আছে, ইচ্ছা করিলে এমন কত কৌটা টাকা জমাইতে পারিব। নরেন অম্লানবদনে সন্ন্যাসীর হস্তে কৌটা অর্পণ করিল। সন্ন্যাসী কৌটা পাইয়া বলিল, তোমার দান ব্যর্থ হইবে না. আমার নিকট একটী জিনিষ আছে তোমাকে দিই। চক্ষু মুদ্রিত কর।" নরেন চক্ষু মুদিল। সন্ন্যাসী নরেনের চক্ষুতে হস্ত বুলাইল। নরেন চাহিল। সন্ন্যাসী নাই। কিন্তু নূতন চক্ষে সে সকলই নূতন দেখিতে লাগিল।

নরেন যে দিব্যচক্ষুর জন্য লালায়িত হইয়াছিল এখন সেই দিব্য চক্ষু লাভ করিল। সে মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাইল; মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিল। যদি মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গ দেখিতে চাও, যদি মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে চাও, তবে পরোপকার ব্রতে ব্রতী হও—পরের সুখ সাধন জন্য আত্মজীবন উৎসর্গকর—স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা একেবারে বিসর্জ্জন দাও।

প্রকৃতি।

(ADAPTED FROM LITTLE WOOD.)

দেখিলাম প্রকৃতির তোরণ সুন্দরে,
গায় সুরবালাগণ সুমধুর স্বরে:—
"এস, পান্থ, যাও এই প্রাসাদ ভিতরে,
স্বামীর অজস্র রত্ন পাইবে সত্বরে।

২

কিছুর অভাব নাই এ রাজসংসারে,
যাইতে বারণ নাই কোথাও তোমারে,
নয়ন ভরিয়া দেখ নব শোভা হারে,
শ্রবণ পূরিয়া গীত শুন সুধাধারে।

৩

প্রণিপাত কর পান্থ এই রাজদ্বারে.
স্মরিয়া কৃতজ্ঞ মনে বারেক তাঁহারে;
যেজন তোমার জন্য এত উপহারে
রেখেছেন পূর্ণ করি আপন ভাণ্ডারে।"

৪

মোহিত এ গীতে পান্থ ধীর পদচারে
প্রবেশ করিল সেই সুন্দর আগারে;
কতই সুগন্ধ আর, শোভা চারিধারে,
তিরপিত করে মন, নয়ন নেহারে।

৫

স্বর্গের আলোক পড়ে দেশের মাঝারে,
পুলকিত মনে পান্থ যায় ভ্রমিবারে,
কিছু দূরে দেখিল সে দেবীর আকারে
ভক্তি আর প্রেম সব মন্দিরের দ্বারে।

৬

দয়াবতী দুই সতী সম্ভাষে তাঁহারে.
প্রকৃতি ঈশ্বরে ওই যাও দেখিবারে;
হেনকালে যবনিকা উঠিল সত্বরে,
বিরাজে বিরাটমূর্ত্তি বিভার ভিতরে।

৭

দেখিল মোহিত—সেই শক্তির আধারে,
প্রকাশিছে প্রভাময় প্রকৃতি যাঁহারে,
যিনি ব্যক্ত রয়েছেন বিশ্বচরাচরে,
বিশ্বরূপী আদি শক্তি প্রকৃতি অন্তরে।

৮

কিন্তু যাঁরা ভক্তিভাবে প্রকৃতির দ্বারে,
প্রণিপাত নাহি করে স্মরিয়া তাঁহারে,
তাদের প্রত্যয় বল কে করাতে পারে?
এ বিশ্ব সংসার ঢাকা ঘোর অন্ধকারে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও জাতি বিভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইহার ধর্ম্মসংক্রান্ত ও দর্শনসম্বন্ধীয় উপদেশ গুলি নিষ্কাশন করিলে উপলব্ধি হয় যে ইহার অধিকাংশ সূত্রই নিম্নলিখিত ৪ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইতে পারে। (১) আচার; যে সকল ক্রিয়াকলাপ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নামক পবিত্র নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে প্রচলিত ছিল তাহাই বেদ ও স্মৃতির অনুমোদিত ও তাহাই "সদাচার"। বস্তুতঃ জাতীয় আচরণ সমূহই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ও ঐ সকল আচরণের পরিরক্ষণই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। (২) ব্যবহার; সমাজ ও রাজ্যশাসন-প্রণালী ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। (৩) প্রায়শ্চিত্ত (৪) কর্ম্মফল; সকল মনুষ্যকেই আপনাপন আচরিত কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয় এই ইহার মর্ম্ম; বিশেষতঃ পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ করার পূর্ব্বে সকলকেই অসংখ্য জীবরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

এই সকল সূত্র "মানব" সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল একারণ ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে ঐ সকলে ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত থাকিবে। বাস্তবিকই; ব্রাহ্মণদিগের আচার্য্য বিষয় বর্ণনায় ছয় অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন অপর ছয় অধ্যায়ের যেখানে সেখানেই সমাবিষ্ট হইয়াছে। আবার, ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল ব্যতীত ব্রাহ্মণদিগের অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হইতে পারে না, একারণ ক্ষত্রিয়দিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও রাজচরিত্র ও রাজকার্য্য সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বর্ণনায় গ্রন্থের অনেকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। এদিকে চাতুর্ব্বর্ণ্যভুক্ত অপর দুইজাতি ও বর্ণসঙ্কর জাতির অত্যল্পমাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে চারিটী আশ্রম অতিবাহিত করিতে হইত; (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২)গৃহস্থ (৩) বানপ্রস্থ, (৪) ভিক্ষু, পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শিক্ষার কাল। যতদিন বেদত্রয়ে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি না জন্মিত, ততদিন ব্রাহ্মণ কুমারকে অবিবাহিত থাকিয়া গুরু সন্নিধানে বাস করিতে হইত। তাঁহাকে দ্বাদশটী সংস্কার অতিক্রম করিতে হইত। ঐ সকল সংস্কারদ্বারা মনুষ্য জনক জননী হইতে প্রাপ্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঐ কয়টী সংস্কার প্রকারভেদে দ্বিজ মাত্রেরই (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) প্রতি আদিষ্ট আছে। সংস্কার গুলি এই;—(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (সসত্ত্বাবস্থার চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে মাতার কেশ বিন্যাস) (৪) জাতকর্ম্ম; (জন্মিবার পর শিশুর জিহ্বায় তিনবার মধু ও ঘৃত স্পর্শ, (৫) নাম করণ (৬) নিষ্ক্রামণ (চতুর্থমাসে সূর্য্যদর্শনার্থ শিশুকে বহির্নয়ন) (৭) অন্নপ্রাশন (৮) চূড়াকরণ বা চৌল (তৃতীয় বৎসরে শিরোচূড়ার এক

গুচ্ছ ব্যতীত সমুদায় কেশ মুণ্ডন।) (৯) উপনয়ন (যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্তি) (১০) কেশান্ত (ব্রাহ্মণদিগের ষোড়শ বৎসরে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বৎসরে ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বৎসরে কেশছেদন) (১১) সমাবর্ত্তন (গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া সসমারোহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন) (১২) বিবাহ।

উপরোক্ত সংস্কার গুলির মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ও ১০ম এই কয়টী প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় না। ৮ম ও নবমটী অদ্যাপিও ব্যবহারশাস্ত্রে অতীব প্রয়োজনীয়; ৭মটী স্মার্ত্তিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৭ম ও ১২শ কেবল এই দুইটীর অনুষ্ঠান করিতে শূদ্রেরা অধিকারী। ১২শ টী সকল লোকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম। ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে অনুষ্ঠিত কর্ণবেধ প্রভৃতি কয়েকটী সংস্কারের উল্লেখ আছে। এবং কথন কথন উপনয়ন কালে সম্পাদ্য গায়ত্রী প্রদান সংস্কার উপনয়নের চারিদিন পরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সংস্কার গুলির মধ্যে উপনয়ন একটী অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার। ব্রাহ্মণের পক্ষে অষ্টম বৎসরে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একাদশ বৎসরে ও বৈশ্যের পক্ষে দ্বাদশ বৎসরে উহার অনুষ্ঠানের বিধি আছে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ সময়ের অতিক্রম করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য ভেদে যজ্ঞোপবীতেরও প্রকার ভেদ ছিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কার্পাস নির্ম্মিত ক্ষত্রিয়ের শণ-নির্ম্মিত ও বৈশ্যের পশম-নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক।

উপনয়ন সংস্কারের প্রারম্ভে বালককে সূর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে হয় ও তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে গুরু দশবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞোপবীত সংস্কৃত করেন। পরে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বালক সমবেত ব্যক্তিবর্গের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে। উহাতে এই সূচিত হয় যে সে গুরুর ও আপনার পরিপোষণের ভার গ্রহণ করিল। অনন্তর গুরু তাহাকে গায়ত্রীর ব্যবহারাদি শিক্ষা দেন। তাঁহাকে বেদ উচ্চারণের ও উপনয়নের পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়া কলাপে তাহার অধিকার ছিল না সেই সকল অনুষ্ঠানের অধিকারী করেন। গায়ত্রী মন্ত্র একটী জপমালার* সাহায্যে সূর্য্যোদয়-কাল ও সূর্য্যাস্ত-কাল এই ত্রিসন্ধ্যায় পাঁচ, দশ, অষ্টবিংশতি, কথন কথন বা একশত আটবার উচ্চারিত হইয়া থাকে। যাহারা অতি পবিত্রতা লাভ করিতে চান, তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যাই গায়ত্রী জপ করেন। মুঞ্জ তৃণের মেখলা ধারণ করিয়া উপনয়ন সংস্কার সম্পূর্ণ হয়।

তদনন্তর ব্রাহ্মণবালক ব্রহ্মচারী হয়েন ও বেদে অভিজ্ঞতা হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে গুরুর সহিত বাস করিতে হয়। প্রতিদিন স্নান, দেবতা, ঋষি ও প্রেতপূর্ব্বপুরুষগণের জলতর্পণ তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু যতদিন তাঁহার শিক্ষাকাল অতিবাহিত না হয় ততদিন মৃতব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাহার

---

* বৈষ্ণব ও শৈবভেদে জপমালা যথাক্রমে তুলসীকাষ্ঠ বা রুদ্রাক্ষফল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের মালায় ১০৮টী থাকে, শৈবদিগের মালায় ৩২টী বা তাহার দ্বিগুণ রুদ্রাক্ষ থাকে। এক্ষণে জপমালার সাহায্যে গায়ত্রী না জপিয়া প্রায় অঙ্গুলির সাহায্যে জপিয়া থাকে।

সুগন্ধ দ্রব্য উপভোগ, ইন্দ্রিয়পরতা, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যা-কথন, ও সকল প্রকার অপবিত্রতা হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে হইবে। তিনি কদাচ কোন জীবের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে যথাবিহিত স্নানাদির সহিত তাঁহাকে সমাবর্ত্তন সংস্কার সম্পাদন করিতে হইবে। অনতিবিলম্বে তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে।

মনুতে অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে; যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুমোদিত। গান্ধর্ব্ব বিবাহ দম্পতীর প্রণয়জাত; উহাতে বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান নাই এবং রাক্ষস বিবাহে, যে কন্যাকে যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়া যাইবে সেই বিবাহের অধিকারী। এই দুই প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়েরা করিতে পারিত। আসুর ও পৈশাচ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বিবাহের পর ব্রাহ্মণের প্রতিদিন সমুদায় গার্হস্থ্য, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষতঃ নিম্নলিখিত পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। (১) ব্রহ্মযজ্ঞ, ইহা বেদোচ্চারণে সম্পাদিত হয় (২) পিতৃযজ্ঞ, ইহা প্রতিদিন বারিপ্রদানে ও সাময়িক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সম্পাদিত হয় (৩) দেবযজ্ঞ, ইহা প্রভাত ও সন্ধ্যায় অগ্নিতে হোম দ্বারা সম্পন্ন হয়। (৪) ভূত যজ্ঞ অর্থাৎ সদসৎ যাবতীয় জীব জন্তু আদির পূজা; ইহা গৃহের বাহিরে জন্তুদিগের ভক্ষণার্থ তণ্ডুল কণা নিক্ষেপে সম্পাদিত হয় (৫) মনুষ্য যজ্ঞ; ইহা অতিথি সৎকারে সম্পাদিত হয়।

এই গুলির কতিপয়টী ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসময় মিত্র।

তিনটী রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বোধ হয় পাঠক মহাশয় কামিনীর বিষয় জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কামিনীর বর্ণ উজ্জলশ্যাম, মুখশ্রীসুন্দর, নয়নদ্বয় আয়ত ও চঞ্চল, বয়স বাইশ বা তেইশ। কামিনীর শৈশবাবস্থার কথা কিছু বলিবার আবশ্যক নাই; এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহার ১০ বৎসর পর্য্যন্ত খেলায়, ধূলায়, কথামালা প্রভৃতি পাঠে অতিবাহিত হইয়াছিল। একাদশবর্ষ বয়সে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহাবধি তাহার মানসিক উন্নতি আরম্ভ হইল। যে সময়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি সে সময়ে কামিনী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক এবং কতকগুলি ইংরাজি পুস্তকও পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন ও সামাজিক বিষয় চিন্তা করিতে পারিতেন। বোধ হয় বলিতে হইবে না তাঁহার এ উন্নতির মূল তাহার স্বামী সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্র এম এ, বি, এল আলিপুর কোর্টের উকিল। তাঁহার যেরূপ

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান তাহাতে বেশ পসার জমিতে পারিত,কিন্তু তাঁহার সমগ্র মন অর্থোপার্জ্জনের দিকে ধাবিত ছিল না। বিদ্যাচর্চ্চায় ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। বঙ্গবামার অবস্থার উন্নতি সাধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। অতএব এরূপ স্বামীর সংসর্গে থাকিয়া যে কামিনী সুশিক্ষিতা হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কামিনী কিরূপ উন্নতা হইয়াছিলেন তাহার পরিচয়, পাঠকগণ তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলেই পাইবেন। কামিনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাটী কমলিনীর পিতৃগৃহের নিকট। কামিনী মধ্যে মধ্যে ভগিনীর বাটী আসিতেন,সে উপলক্ষে তাঁহার সহিত কমলিনী ও বিনোদিনীর সহিত আলাপ হইয়াছিল। আজ অনেক দিনের পর আবার ইহাদিগের সাক্ষাৎ হইল।

কামিনী বলিতে লাগিল। "ক্রমে যাহা শুন্‌লেম তাহাতে আমার মন আনন্দ ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হলো—আনন্দ হলো তোদের অন্ধ চক্ষু ফুটেছে দেখে, বিষাদের উদয় হলো আমাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় ভেবে। যাহাই হউক, তোদের কথা শুনে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। তোদের নিকট হতে ওরূপ উচ্চভাবযুক্ত কথার আমি কখনই আশা করি নাই। তোদের তর্ক বিতর্ক শুনে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে অচিরে বঙ্গবামার দুঃখের নিশা পোহাইবে। বঙ্গাঙ্গনার অবস্থোন্নতির এরূপ আন্দোলন যে সুলক্ষণ তাহার আর সন্দেহ নাই। যত অধিক সর্ব্বত্র এইরূপ আন্দোলন চলিবে, তত শীঘ্র আমাদিগের শুভদিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। কিন্তু এই সকল আন্দোলন করিবার সময় আমাদিগের যেন স্মরণ থাকে, আমরা বঙ্গাঙ্গনা,এই দেশ বঙ্গদেশ, ইংলণ্ড বা আমেরিকা নহে ইহার অধিবাসীগণ বঙ্গবাসী ইংলণ্ড বা আমেরিকাবাসীগণের ন্যায় উন্নত ও সুশিক্ষিত নহে, আর যে সকল অধিকার ইংলণ্ড বা আমেরিকাবাসিনীগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বঙ্গবালাগণ তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থার ও অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষে সে সকল অধিকার পাইবার নিতান্ত অনুপযুক্তা। এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া স্ত্রীজাতিসম্পর্কে আমি কিছু বলিতে অভিলাষ করি। আমাদিগের সমস্ত দুরবস্থার মূল বালিকা বিবাহ। কমল তুই যে রূপ যুক্তির সহিত বালিকা বিবাহের দোষ দেখাইয়া দিয়াছিস্, তাহাতে আমার বা অন্য কাহারো আর কিছু বলিবার নাই। তাহার পর আমাদিগের সুশিক্ষার অভাব ;এই বিষয়ে তোরা কিছুই বলিস্ নাই। এই চির প্রসিদ্ধ অজ্ঞতা আমাদিগের সামাজিক অবস্থার ফল। প্রথমতঃ কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া অনেকেই আবশ্যক বোধ করেন না। আর যাঁহারা একটু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা ঊর্দ্ধসংখ্যা কন্যাগণকে দশ বা একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন, তাহার পরে বিবাহ হইলে আর তথায় যাইতে দেন না। অনেকে উত্তমাবস্থাপন্ন নহে বলিয়া বাটীতে শিক্ষয়ত্রী রাখিয়া কন্যাগণের অধ্যয়ন কার্য্য সম্পাদন করাইতে পারেন না, অতএব বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষার আর উন্নতি না হইয়া বরং ক্রমশঃ অভ্যাসের অভাবে অবনতিই হইতে থাকে। তার পর বালিকা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীভবনে গমন করেন। স্বামীর অত্যন্ত ইচ্ছা যে তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী, তাঁহার আদরের আদরিণী শিক্ষিতা হইয়া তাঁহার হৃদয়ের

সঙ্গিনী হইতে পারেন। দুই চারিমাস বা দুই এক বৎসর তাঁহার ইচ্ছা থাকে বালিকা কিছু শিক্ষাও পাইয়া থাকেন। তাহার পর বালিকার প্রাণনাথের যত্ন ও চেষ্টার শৈথিল্য জন্মে এবং ইহার সঙ্গে বালিকার শিক্ষা অঙ্কুরিতাবস্থায় বিলয় প্রাপ্ত হয়, বা অসার নাটক, প্রহসন বা উপন্যাস প্রভৃতির উপর স্বরাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। ফলে বঙ্গবালার উপযুক্ত শিক্ষা হয় না। স্বামীরা সদা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন তাঁহাদিগের গৃহ অরণ্য, অশিক্ষিতা স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে তাঁহাদিগের সুখ হয় না, তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সুখের সামগ্রী না হইয়া অসুখের ভার আরো বৃদ্ধি করে। হায়! যাহাদিগের যত্নের অভাবে আমরা অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা, তাঁহাদিগেরই মুখ হইতে আমাদিগের এই সকল কথা শুনিতে হইতেছে এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নহি। হায়! বিধাতঃ! আমাদিগের অদৃষ্টে আরো কতদুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছ। হে পুরুষপ্রবর! হে সৃষ্টির সারপদার্থ! হে নয়নরঞ্জন! তুমি না অন্যায় দেখিতে পার না, তুমি না পৃথিবীতে ন্যায়ের রাজ্য স্থাপিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছ! এই কি তোমার ন্যায়পরতা? ছিছি কেন পুরুষনামে কলঙ্কদাও; কেন নিজের দোষ পরের স্কন্ধে চাপাইবার উপক্রম কর। জিজ্ঞাসা করি কাহার হৃদয় প্রথমে অবলার দুঃখ দেখিয়া গলিয়া গিয়াছিল? সে হৃদয় কি পুরুষের নয়? তুমি কি সে মহাপুরুষের শ্রেণীভুক্ত নও? কে বলিবে না। আর যে বলে বলুক আমরা অদ্যাপি তত অসারা, অকৃতজ্ঞা নহি যে তোমাদের কৃত উপকার মানিব না। যত দিন এদেহে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব পুরুষ আমাদিগের গুরু, পুরুষ আমাদিগের দেবতা। আমাদিগের অবস্থার সমালোচনা করিতে কখন কখন আমাদিগকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন কোন পুরুষের প্রতি তীব্র কটু উক্তি প্রয়োগ করিতে হয় বটে, কিন্তু যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, ন্যায়বান, ক্ষমাবান্ পুরুষ! তাই বলিয়া আমাদিগের উপর রাগ করিও না। তোমরা আমাদিগের স্বামীর জাতি, আর তোমরাই আমাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছ। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমরা দেখিতে শিখিলাম, তখন ন্যায়ের কোন্ যুক্তির আশ্রয় লইয়া চক্ষু নিমীলিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছ।

ছি! যাহা তোমরা আমাদিগকে দিয়াছ তাহাই আবার কেন কাড়িয়া লইতেছ, যাহা তোমাদিগের দোষে হয় নাই তাহার জন্য অবলাগণকে কেন দোষী কর। তোমাদিগের স্ত্রী বা ভগ্নী অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা তাহার জন্য তোমরা দায়ী। তোমার পুত্রের বা ভ্রাতার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে তুমি ক্রটী করনা, কিন্তু ভগ্নী বা কন্যার শিক্ষার পথে অনেক কণ্টক দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে চাওনা। তুমি তোমার কন্যা বা ভগ্নীকে ১০ বা ১১ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাক. তাহার পর সমাজের ভয়ে তাহার বিবাহ দাও, আর তাহার শিক্ষারও শেষ হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাহাকে লইয়া সমাজ? আর তোমার সঙ্গে সমাজের কি সম্বন্ধ আছে? তুমি কি সমাজের এক জন নহ? তা যদি হও তবে তুমি তোমাকে ভয় কর, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আজি কালি অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার ও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী

ও বালিকা বিবাহের বিরোধী, কিন্তু বলিতে পারি না কেন তাঁহারা সমাজের ভয়ে তাঁহাদিগের মনের উচ্চভাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। তোমরা এক এক জন সমাজের এক একটী অঙ্গ, তোমরা সকলে না হউক অধিকাংশ অর্থাৎ শিক্ষিতেরা মিলিয়া যাহা মনে কর তাহা করিতে পার, তথাচ সমাজচ্যুত হইবার ভয় কেন কর বলিতে পারি না। আবার জিজ্ঞাসা করি সমাজ কাহাকে লইয়া? তোমাকে আর পাঁচ বা ২৫ জনকে লইয়া অবশ্য। যদি ২৫ জনের মনের ভাব সমান হয় তাহা হইলে সে পঁচিশ জনকে লইয়া তোমরা একটী ভিন্ন সমাজ বা ভিন্ন জাতি স্থাপিত করিতে পার। যে কোন ব্যক্তির সহিত তোমাদের মতের ঐক্য হইবে, তিনিই তোমাদিগের নবানুষ্ঠিত সমাজভুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। আর একটী জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত বঙ্গে বালিকাবিবাহ বিরোধী ২৫ জন ব্যক্তি ভিন্ন কি আর নাই? ইহা কি সম্ভবে? কখনই নহে। প্রকৃত কথা এই বালিকাবিবাহরূপ কুপ্রথাবিরোধী লোক এদেশে অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহারা গোঁড়া প্রাচীন প্রথাস্বপক্ষ আত্মীয়দিগের সহানুভূতিতে চিরকালের তরে বঞ্চিত হতে শঙ্কিত ও দুঃখিত হয়েন। শিক্ষিত যুবকের বিধবা বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই, বরং আন্তরিক ইচ্ছা আছে, কিন্তু তাঁহার পিতা, খুড়া বা মামা বিধবাবিবাহের ঘোর শত্রু বলিয়া তাঁহার উচ্চ ভাব কার্য্যে পরিণত হয় না। হায়! যাঁহাদিগের পদতলে বসিয়া আমাদিগের আজও অনেক শিখিবার আছে, তাঁহাদিগের দোষ আমাদিগকে—অবলাগণকে—দেখাইয়া দিতে হইবে ইহাপেক্ষা আর লজ্জার, দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আর্য্যগণ! যদি এ অবলার ধৃষ্টতা ও চপলতা ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বিনয়াবনত হইয়া আপনাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি "কোথায় পৃথিবীর কোন্ অংশে কোন্ একটী মহতী কীর্ত্তি অধিষ্ঠাতার বিনা আয়াসে, বিনা আত্মত্যাগে সাধিত হইতে দেখিয়াছেন?" বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তর নাই। যতদূর স্মরণ আছে ইতিহাসে এমন কোন কীর্ত্তির উল্লেখ নাই যাহা বিনা আত্মত্যাগে সাধিত হইয়াছে। প্রভুগণ! যদি স্বীকার করেন—আর স্বীকার না করিবেনই কেন, কারণ ইতিহাস প্রমাণিত সত্য স্বীকার না করিয়া কে থাকিতে পারেন—বিনা আত্মত্যাগে কোন মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে না, তবে বলিতে পারি না বঙ্গবালার সামাজিক অবস্থা উন্নতিরূপ মহৎকার্য্য বিনা আত্মত্যাগে কেমনে আপনারা সম্পন্ন করিতে আশা করেন। গুরুগণ! বঙ্গবালার দুঃখে যদি আপনাদিগের হৃদয় শেলবিদ্ধ হইয়া থাকে তবে কিছু কিছু কেন—আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, আত্মীয় কুটুম্বের বিচ্ছেদ ক্লেশ অনুভব করিতেহইবে, পিতা মাতার কোপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। কি করিবেন, বলুন, মহোপকারক কার্য্য করিতে হইলে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, ইহ জীবনের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়। হইতে পারে এই সমস্ত যন্ত্রণার ফল আপনাদিগের জীবৎদশায় ফলিবে না, কিন্তু আপনাদিগের স্মরণ থাকা উচিত যে কার্য্যে আপনারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা যদি কখন সাধিত হয়, তাহা হইলে পরকালে আপনাদিগের সদ্গতি হইবে, আর এ জগতে আপনাদিগেরই

পুত্র কন্যাগণ, পৌত্র পৌত্রীগণ, আপনাদিগের মত মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত না হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। আপনাদিগের এ যন্ত্রণা সাগর হইতে আপনাদিগেরই পৌত্রপৌত্রীদের সুখ মথিত হইলে কি আপনাদিগের পরিশ্রমের, আত্মত্যাগের উপযুক্ত প্রতিদান হইবে না? অবশ্য হইবে। বঙ্গীয় যুবকগণ! আলস্য পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের ভগ্নীগণের দুঃখে যদি হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বালিকা বিবাহরূপ সর্ব্বনাশ সমূলে উৎপাটিত কর। বালিকা বিবাহই সমস্ত অনিষ্টের মূল। বালিকা বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া বঙ্গবামার শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয় না, আর বালিকা বিবাহ হেতুই বঙ্গবামার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে।

তার পর বঙ্গবামার স্বাধীনতা। বিনোদ্ — স্বাধীনতা কথাটী বঙ্গবামার সহিত সন্নিবিষ্ট হইলে, আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এ পরাধীন দেশে স্বাধীনতা কথাটী ব্যবহারের প্রয়োজন কি? আবার বঙ্গবামার স্বাধীনতা তো হইতেই পারে না। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্না অশেষ যন্ত্রণোৎপীড়িতা বঙ্গবামার আবার স্বাধীনতা কি? বিনোদ্ তোর কর্ণকুহরে যখন বালকবক্তার হৃদয়োদ্দীপক বাণী প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তোর হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইয়াছিল। বিনোদ, তুই আজও বালিকা। তোর হৃদয় ভাল মন্দ না ভাবিয়া, একেবারে নাচিয়া উঠে। তোর ইচ্ছা বালকদিগের সহিত মিশিয়া বেড়াস্ তা কি কখন ঘটিতে পারে? কখন ঘটিতে পারুক না পারুক আপাততঃ হতে পারেনা এটী নিশ্চয়। আর পঞ্চদশ বয়স্কা বালিকা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বয়স্ক বালকের সহিত সদা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিবে আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আপাততঃ রমণীগণের একটী স্বতন্ত্র সমাজ থাকিবে তাঁহারা সেই সমাজ মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনরূপে কার্য্য করিতে পারিবে ইহাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, বিনোদ, তোর দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর্। বঙ্গ সমাজ আজও সুশিক্ষিত নহে এ কারণে তোর মনের সাধ মিটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত পুরুষের সহিত রমণীগণের একত্র থাকায় বামাগণের অনেক ধর্ম্ম নৈতিক অবনতির সম্ভাবনা ও অনেক ব্যাভিচার ঘটিতে পারে। অতএব পুরুষের সহিত একত্রাবস্থানে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব, আমাদিগেরই বিমল চরিত্রে কালিমা পড়িবে। আপাততঃ অতি সতর্কতার সহিত আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে।

একণে বিবেচনা করা যাউক কিসে আমাদিগের অবস্থার উন্নতি হয়, কিসে আমাদিগের জীবন অপেক্ষাকৃত সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বালিকা বিবাহ সমস্ত অনিষ্টের মূল। মূলে কুঠারাঘাত না করিলে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না। কিন্তু আমাদিগের মত যাহাদিগের বালিকা বয়সে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, যাহাদিগের পায়ে শৃঙ্খল পড়িয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বের কথা খাটে না। তাহাদিগের অর্থাৎ আমাদিগের কিসে অবস্থার উন্নতি হয় সে বিষয় একণে আন্দোলন করা যাউক। আমাদিগের শিক্ষার সহিত বালিকা বিবাহের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমাদিগের সুশিক্ষা একণে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের উপর ও আমাদিগের স্বামীর উপর

নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বামীর চেষ্টা ও যত্নের শৈথিল্য হেতু বিবাহিতা অঙ্গনাগণের বিদ্যালাভ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও মনে যেন এরূপ ধারণা না হয় অবলাগণের কোন দোষ নাই, তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী ধীরতা। না আমরা এরূপ বলি না যে আমাদিগের কোন দোষ নাই। আমরা জানি এবং অনন্ত কাল স্বীকার করিব যে বিলাসপ্রিয়তা আমাদিগের বিদ্যালাভের পথে সর্ব্বনাশকারী কণ্টক স্বরূপ। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, পঞ্চদশ বা ষোড়শ বয়স্ক বিলাসপ্রিয় শিথিলযত্ন বালককে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার দ্বারা কর্ত্তব্যপথে আনয়ন করা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বিলাসপ্রিয়া কর্ত্তব্যপথবহির্ভূতা অবলাগণকে মিষ্ট তিরস্কারে জ্ঞান-মার্গে আনয়ন করা কি তদ্রূপ উচিত নহে? যদি উচিত বোধ হয়—আর উচিত অবশ্যই বোধ হইবে—তাহা হইলে প্রেমিক ভাবুক প্রাণনাথ প্রণয়িণীর হৃদয়ভেদী কটাক্ষপাতে ও অধরপ্রান্তস্থিত মধুর হাসিতে গলিয়া গিয়া যেন স্ত্রীশিক্ষারূপ কর্ত্তব্যে ও গুরুতর কার্য্যে অবহেলা না করেন। অতএব বঙ্গবালার শিক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বঙ্গের যুবক যুবতী উভয়ের সমান উদ্যম, চেষ্টা ও যত্ন থাকা উচিত। বিদ্যালাভের পথ কুসুমাবৃত নহে, কণ্টকময়। যিনিই বিদ্যালাভের প্রয়াসী তিনি পুরুষ হউন, রমণী হউন, ধনী হউন, দরিদ্র হউন, বালক হউন, আর বৃদ্ধই হউন তাঁহাকেই এই কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিতে হইবেই হইবে। যাহার এই কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিতে পারিবার উপযোগী অধ্যবসায় ও বর্ত্তমান বিলাসসুখ বিসর্জ্জন করিবার ক্ষমতা আছে তাহারই অদৃষ্টে সেই কণ্টকপথপ্রান্তস্থ কুসুমোদ্যান বিহারের কবিবর্ণিত অনুপম স্বর্গীয় সুখ ঘটিয়া উঠে। অনেকেই সম্মুখে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ ভয়ানক পথ দেখিয়া ও বর্ত্তমান বিলাস সুখ ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া আর অগ্রসর হইতে পারেন না। শুনিতে পাই অনেক বঙ্গবালা এত বিলাসবতী ও বর্ত্তমান সুখের কাঙ্গালিনী, যে তাঁহারা স্বামীর শিক্ষা দানরূপ সদুদ্দেশ্য বালিকাসুলভ চপলতা বশতঃ অহরহ ব্যর্থ করিয়া থাকেন। স্বামী যখন পত্নীকে সযত্নে অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া স্ত্রীর অধ্যয়ন বিষয়ে অযত্ন ও অমনযোগ দেখিয়া তিরস্কার করেন, অভিমানিনী অমনি অভিমানে আদরে ফাটিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। যদি বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে এরূপ অভিমান স্রোত বহিতে থাকে, তাহা হইলে বঙ্গবামার অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক আরও অবনতিই হইতে থাকিবে। হে ভগিনীগণ। যদি তোমাদিগের দুঃখরাশি অসহনীয় হইয়া থাকে, আর বাস্তবিক তোমাদিগের সামাজিক অবস্থা জঘন্য বলিয়া তোমরা হৃদয়ঙ্গমকরিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে বালিকাসুলভ অভিমান ও সর্ব্বনাশক বিলাসে জলাঞ্জলি দাও এবং সারবান পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ কর। আমাদিগের সামাজিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আমাদিগকেই অধিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, অধ্যয়নাদিতে আমাদিগেরই অধিক প্রবৃত্তি দেখাইতে হইবে। পুরুষগণ আমাদিগের জন্য সকল কার্য্য করিবেন এরূপ কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারেনা। শিক্ষাই অস্মদাবস্থাপন্না বামাগণের অবস্থোন্নতির প্রথম সোপান স্বরূপ।”

কবিতা ও বিজ্ঞান।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাই সমাজোন্নতির চিরশত্রু। গোঁড়ামী মানব সমাজের যত অনিষ্ট করিয়াছে তত আর কিছুতেই করে নাই। সময়ে সময়ে পৃথিবীতে যে সকল মহা মহা হত্যাকাণ্ড—হৃদয় বিদারক অকুন্তুদ ব্যাপার পরম্পরা সংঘটিত হইয়াছে সে সমস্তই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও কাকাঙ্ক্ষিতার ফল। ভারতের অধঃপতন হইল কেন? ভারতের উন্নত শিল্প-বিজ্ঞান ও আদর্শসভ্যতা বিলুপ্ত হইল কেন? ভারত পরাধীন হইল কেন?—ইহা অতি অল্পমাত্র চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি এবং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাই যে গোঁড়ামীই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রথমে আর্য্যদিগের আভ্যন্তরিক দলাদলি ভারতের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, পরে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গোঁড়ামী অনায়াসে সেই অধঃপতন সুসম্পন্ন করিয়া যায়। কুরুঃপাণ্ডবের শোচনীয় বিগ্রহ নিবারিত হইতে পারিত, লক্ষ লক্ষ বীরচূড়ামণির অকালমৃত্যু নিবারিত হইতে পারিত, ভারতের বল বিভাগ ও অন্তদৌর্ব্বল্য নিবারিত হইতে পারিত, যদি কৃষ্ণ ও কর্ণের সাম্প্রদায়িক সাঙ্কীর্ণতা ও পাক্ষপাতিত্ব না থাকিত। এ ঘোর রাজ্যবিপ্লবেও ভারত পতিত হইত না, যদি অব্যবহিত পরেই আবার ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব না ঘটিত, যদি বৌদ্ধ ও বৈদিক সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব না জন্মিত। বৈদিক ও বৌদ্ধদিগের বহুকালব্যাপী বিবাদে ভারত একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল। তবু ভারত আবার উঠিলেও উঠিতে পারিত—ভারত-হৃদয়ে পুনর্ব্বার বলসঞ্চার হইলেও হইতে পারিত যদি নবোদয়োন্নত মহম্মদীয় চূড়ান্ত গোঁড়াদিগের নিদারুণ পদাঘাত প্রাপ্ত না হইত! ভারত মুমূর্ষ অবস্থায় আহত হইয়া পড়িল—আর উঠিল না!! সাম্প্রদায়িক অন্ধতা নিবন্ধন কত দেশে যে কত প্রকার লোমহর্ষণ ব্যাপারসজ্ঞ সংঘটিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গোঁড়ামী যে কেবল ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে আবদ্ধ এমত নহে। বিদ্যা বিষয়েও গোঁড়ামী বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কাব্যামোদীদিগের পরস্পর বৈরিতা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এক সময়ে লর্ড ক্রহাম জেরেমী বেন্থাম এবং জেম্‌স মিল প্রভৃতি বিজ্ঞান ভক্তগণ কবিতা দেবীকে মিথ্যাবাদিনী, মহানিষ্টকারিণী কুহকিনী বলিয়া ইংলণ্ড হইতে বলপূর্ব্বক বিদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দল এখনও খুব প্রবল রহিয়াছে। কিন্তু এ দলাদলী কেন? শাক্ত ও বৈষ্ণবে যেমন অনর্থক বৈরিতা, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য-প্রিয় দিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব সেইরূপ অর্থ শূন্য। শক্তি যেমন বরাবর বিষ্ণুর সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, কবিতাও সেইরূপ চিরকাল বিজ্ঞানকে সাহায্য দান করিতেছেন। কবিতা, বিজ্ঞানের চিরসহচরী যেখানে বিজ্ঞান সেইখানেই কবিতা।

আমরা দেখিতে পাই সকল মহাকাব্যেই বিজ্ঞানাভাস জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দান্তে, মিল্‌টন্ কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের কাব্যাবলী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ, জর্ম্মানির

অদ্বিতীয় কবি গেটে প্রণীত কাব্যের ত কথাই নাই তিনি নিজেই একজন প্রধানতম বৈজ্ঞানিক ছিলেন। প্রাচীন মহাভারতেও জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্মৃতি শাস্ত্র, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের অনেক বার্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক তাহাই কবিতারসে পরিপুর্ণ। বৈজ্ঞানিক যখন প্রকৃতির গুহ্য তত্ব সকল জানিবার জন্য স্থল, জল, তেজ ও প্রভঞ্জন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে থাকেন তখন এই অখিল বিশ্বরচনার অসীম সৌন্দর্য্য ও মহান্ গাম্ভীর্য্যে তাঁহার হৃদয় কি ভরিয়া যায় না? যখন তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করেন যখন তিনি দেখেন এক বিচিত্র স্থত্রে, বিচিত্র কৌশলে সংখ্যাতীতগ্রহ উপগ্রহগণ অসংখ্য সূর্য্যমণ্ডল বেড়িয়া অনবরত পরিক্রমণ করিতেছে আবার যেই দেখেন গণনাতীত সৌরজগৎ সকল একটী একটী প্রকাণ্ডতম সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন তাঁহার হৃদয় কি গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হয়না? নীলাকাশের অপূর্ব্ব শোভা নক্ষত্র রাজির সুস্নিগ্ধ প্রভা এবং হৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্রমার সহাস্য বদন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কি সৌন্দর্য্য রসে প্লাবিত হয় না। গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যই কবিতার প্রাণ, অতএব যেখানে বিজ্ঞান সেই খানেই কবিতা। বিজ্ঞান ও কবিতা একত্রে প্রতিপালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চিরকাল পরস্পর সহায়তা করিয়া আসিতেছে। কল্পনার সহায়তা ভিন্ন কেবল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পন্ন ও কোন্ তত্ব প্রকাশিত হইত? কবিতার মৎলব, বিজ্ঞানের কারুগিরী। মানবের জ্ঞানপ্রদীপে কবিতা স্নেহ, বিজ্ঞান বর্ত্তিকা। বিজ্ঞান কবিতার বাসনানুবর্ত্তী, কবিতা যে দিগে লইয়া যায় বিজ্ঞান সেই দিগে যায়। কবিতা যাহা চায়, বিজ্ঞান তাহা আনিয়া দেয়। কবিতা বলিল আকাশে উঠিব, বিজ্ঞান অমনি ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া আনিল। কবিতা বলিল জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া নদীপার হইব, বিজ্ঞান অমনি টনেল প্রস্তুত করিয়া দিল। কবিতা বলিল একমাসের পথ এক দিনে যাইব, বিজ্ঞান অমনি বাষ্পীয়রথ সাজাইয়া আনিল। কবিতা বিজ্ঞানের চির সহচরী, কবিতা ও বিজ্ঞান শিবশক্তির ন্যায় অভেদ-আত্মা; কবিতাও বিজ্ঞান যে অভেদ্য ইহা প্রশস্তচেতা সহৃদয় আর্য্যাচার্য্যেরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন সেই জন্য তাঁহাদের সকল শাস্ত্রই কবিতায় লিখিত ও কবিতারসে পরিপ্লুত।

উপকারিতার নিকষে পরীক্ষা করিয়া ও আমরা দেখিতে পাই, বিজ্ঞান ও কবিতা তুল্য মূল্য। কেনা জানে সুখই মনুষ্য জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য। কবিতা ও বিজ্ঞান মনুষ্যের সেই সুখ সাধনে সমান সাহায্য করিয়া থাকে। কেনা জানে মনুষ্য বিমিশ্র প্রকৃতি? মনুষ্য, শরীর ও আত্মার সমষ্টি? শরীর ও আত্মা উভয়ে সুখী হইলে তবে মনুষ্য জীবন সার্থক হয়। শরীর ও আত্মা উভয়কে সুখী করিতে হইলে কবিতা ও বিজ্ঞান উভয়েরই সাহায্য আবশ্যক। বিজ্ঞান শারীরিক সুখ অন্বেষণ করে, কবিতা মানসিক সুখবিধানে তৎপর। বিজ্ঞান মর্ত্তলোক স্বর্গতুল্য করিতে চাহে, কবিতা স্বর্গের সুখ মর্ত্ত্যে আনিয়া দেয়। বিজ্ঞান দূরস্থ বস্তুসমূহ নিকটস্থ ও নিকটস্থ বস্তু সমূহকে নিকটতর করিতে চাহে, কবিতা ইন্দ্রিয়াতীত অভূতপূর্ব্ব পদার্থ সমূহ মন-

শক্ষুর বিষয়ীভূত করিয়া দেয়। অতএব দেখা গেল কবিতা ও বিজ্ঞান উভয়েই মনুষ্যের সমান উপকারী, উভয়েই মনুষ্যের সমান আদরের সামগ্রী। বিজ্ঞান চর্চ্চায় যেমন আবশ্যক সাহিত্যালোচনায় ও সেই রূপ প্রয়োজন। ক্রমাগত কেবল কাব্য নাটক ও উপন্যাস পাঠে মনুষ্য অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া পড়ে এবং ক্রমাগত কেবল বিজ্ঞান চর্চ্চায় মনুষ্য হৃদয় কঠোর ও কর্কশ হইয়া যায়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় এবং তাঁহার দেবাভাস বিলুপ্ত হইয়া দানব প্রকৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে। ঈশ্বর ও মানব বিদ্বেষী জেমশ মিল, ভারতবর্ষবাসীদিগের পরম শত্রু * জেমস মিল বিশ্বনিন্দুক, জেমস মিল, সত্যের অপহ্নকারী জেমস মিল, যে পদ্ধতিতে নিজপুত্রকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন সে শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ্যে প্রচলিত হইলে মানব সমাজের বড়ই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে। জেমসমিলের মত যে শিক্ষক সাহিত্য বিদ্বেষী তিনি মানব সমাজের পরম শত্রু এবং কাপ্তেন রিচার্ডসনের মত যে অধ্যাপক বিজ্ঞান বিদ্বেষী তিনিও মানব সমাজের পরমশত্রু। বাঙ্গালী আজিও যে কার্য্যশীল হইতে পারে নাই সে কেবল রিচার্ডসনের শিক্ষা প্রণালীর দোষে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

* The book which I consider most mischievous, nay, which I hold responsible for some of the greatest misfortunes that have happened to India is Mills's "History of British India" * * * * Next to the charge of untruthfulness, Mill upbraids the Hindoos for what he calls their litigiousness. He writes:–"As often as courage fails them in seeking more daring gratification to their hatred and revenge, their malignity finds a vent in the channel of litigation * * * * In fact he represents the Hindoos as such a monstrous mass of all vice, as Col, Van Kennedy remarked, "Society could not have held together, if it had really consisted of such reprobates only."

Max Muller.

মধুযামিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অভ্যাগত ক্রমশঃ দর্শনপথের অন্তর্হিত হইলে, নবপ্রেম-মুগ্ধা হিঙ্গনা সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শিশু হস্ত হইতে মিষ্টান্ন পড়িয়া গেলে শিশু যেরূপ কাঁদিয়া উঠে, কুসুম-হৃদয়া তাঁহার অদর্শনে সেইরূপ কাঁদিলেন। বালিকা! স্বার্থপর কুটিল পৃথিবী উহাঁকে কেন রূপ ছলনা করিতে, বা অসার সমাজ সভ্যতা উহাঁকে হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে শিক্ষা দেয় নাই;—যাঁহারই দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে নব আশার উদ্ভাবন হইল, যাঁহা হইতে

পৃথিবী সমস্ত সুখময় দেখিতে ছিলেন, যাঁহারই সন্নিকটে তিনি রমণী জীবনের সার্থকতা বোধ করিতেছিলেন, তিনি চলিয়া গেলেন, সুতরাং বিচ্ছেদের এই প্রথম আঘাতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অরুণা সঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হিঙ্গনা কেন কাঁদিলে? হিঙ্গনা অঞ্চলাচ্ছাদিত নব বদনে, গদ গদ স্বরে কহিলেন "অরুণা! তুমি তাঁকে কেন সঙ্গে আসিতে দিলে না?"

"অরুণা। কা'কে হিঙ্গনা—ঐ—ঐ—পুরুষটীকে—ও—উনি কে?"

হিঙ্গনা। (সেই মত ভাবে) দিদি আমি চিনি না।

অরুণা। সেকি হিঙ্গনা তুমি উহাকে চিন না, তবে তাঁর জন্যে কাঁদিলে কেন? আমি ত উহাকে যাইতে বলি নাই, তুমি আপনি যাইতে বলিলে—

হিঙ্গনা। (দুঃখে) আমিই যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি বিরক্ত হইলে বলিয়া যাইতে বলিলাম, আমি যাইতে বলি নাই।

অরুণা। (হাসিয়া) বেস্ দিদি, তুমি যাইতে বল নি, আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম বলিয়া তুমি উহাঁকে যাইতে বলিলে, তুমি উহাঁকে চিন না, তবু তুমি কাঁদিলে।

হিঙ্গনা। (মৃদুস্বরে) উনি আমার গান শুনিতে চাহিয়া ছিলেন।

অরুণা। কবে?

হিঙ্গনা। কাল সকালে-

অরুণা। তবে তোমার মনের কথা আমি কেমন করে জানবো, তুমি গান শুনালে না কেন? উনি আশা করে ছিলেন, উনি না কেঁদে তুমি কাঁদিলে কেন?

হিঙ্গনা। উনি শুনিতে পেলেন না বলে দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন, আমি তাই কাঁদিলাম।

অরুণা। উনি ত গান শুনিবার কথা কিছু বলেন নি, উনি তোমার গরুগুলি লয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী আসিবার কথা বল্লেন।

হিঙ্গনা। অরুণা! উনি আমাকে ভালবাসেন।

অরুণা। আর তুমি?

হিঙ্গনা। (হেঁট মুখে, নীরব)

অরুণা। ক দিন?

হিঙ্গনা। কাল সকালে প্রথম দেখা হইয়াছিল—

অরুণা। কাল সকালে! প্রথম!! হ্যাঁ দিদি উনি ত তোমার কেউ ন'ন্; উনি তোমায় কেন ভাল বাসবেন? তুমিত উহাঁকে চেন না, তুমি কেন ভালবাস্‌লে?

হিঙ্গনা। তা আমি জানি না;—অরুণা তুমি ত আমার কেউ না?

অরুণা। (চিন্তা করিয়া) এ চুড়ী কি উনি দিয়েছেন?

হিঙ্গনা। না এ উদয়গিরি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

অরুণা। তবে তুমি কিসে ভালবাস্‌লে?

হিঙ্গনা। তুমি কি এইমাত্র ওঁর মিষ্টি কথা শুন নি?

অরুণা। কৈ কি কথা বলেছিলেন? উদয় এলে তুমি তাকে কি বলবে?

হিঙ্গনা। (অনন্য মনে) কা'কে?

অরুণা। (হাসিয়া) উদয়কে।

হিঙ্গনা। আমি ত তাকে কিছু বলি নি-

অরুণা। উদয় ভাটিয়াদের কাছ থেকে অনেক জিনিস পত্র, গহনা, টাকা নিয়ে আসবে।

হিঙ্গনা অরুণা! তুমি নিও—।

অরুণা। ও—উনি কি তোমায় বেশি দেবেন?

হিঙ্গনা। কে?

অরুণা। যাঁর জন্যে কাঁদিলে।

হিঙ্গনা। তা হলে আমার বাড়ীতে কাজ কর্‌তে আস্‌তে চান্‌?

অরুণা। ওকি সত্তি কাজকর্‌তে আস্‌বে?

হিঙ্গনা। কেমন কোরে বলবো, যা শুন্‌লুম্ তাই বল্‌লুম।

অরুণা। তুমি কি তাই বিশ্বাস কর্‌লে? না একদিনের জন্যে তোমার সঙ্গে আস্‌তে চাইলে—

হিঙ্গনা। যা বল্‌লে আমি তাই বিশ্বাস কর্‌লুম।

অরুণা। ও কি তোমার সব কাজ কর্‌তে পারবে?

হিঙ্গনা। আমি দেখিয়ে দিব, না হয় আমি কর্‌বো, এখনত সব আমিই কর্‌চি—

অরুণা। উদয় আসিলে কি হবে?

হিঙ্গনা। কি হবে? সে জিনিস পত্র টাকা নিয়ে আস্‌বে, সেত, কাজ করবেনা?

অরুণা। যদি মন রাখ্‌বার জন্য করে?

হিঙ্গনা। তা আর কর্‌বে না, আর বিয়ে করা আমার ইচ্ছা।

অরুণ। তুমি কি মনে কর ওর কিছু নেই। ও দেখ্‌তে অমন বড়মানুষের ছেলের মতন।

হিঙ্গণা। কেন দিদি একশবার টাকা গহনার কথা কও। ওঁর টাকা থাকু আর না থাক, আমার ত শরীর আছে।

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে হিঙ্গনা নব-প্রেম-মুগ্ধা হইলে ও নিতান্ত সরল-প্রকৃতি ও মধুর-হৃদয়। অরুণা স্বার্থপর ও বিষয়-লোভী। প্রণয় হিঙ্গনার জীবন; প্রণয় অরুণার বিলাস ইচ্ছা পরিতোষের উপায় মাত্র। যতক্ষণ তরুণ পুরুষকে ধনবান বলিয়া অরুণার জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ তিনি হিঙ্গনার সহিত আলাপন কালে "উনি, উহাঁকে," এইরূপ শব্দ উল্লেখ করিয়াছিলেন, যখন জানিলেন তিনি বিষয় হীন, তখন অবধি 'ও' 'উহার' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা তাঁহার ভাবান্তর কিছু লক্ষ্য করেন নাই, তিনি আপন সুখ দুঃখ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি যদিও কথোপকথনে অরুণার স্বার্থপরতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, তথাচ তিনি আপন সরল প্রকৃতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহাকে উদয় গিরিকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। গুণ্ডজাতি দিগের বিবাহ প্রথানুসারে, উদয় গিরি বিশেষ ধনবান হইলেও হিঙ্গনার অনিচ্ছায় তাঁহার সহিত বিবাহ করিতে পারেন না। হিঙ্গনার পিতা মাতা ইচ্ছা করিলেও উদয় গিরির কোন আশা নাই! কেননা হিঙ্গনা আপন ইচ্ছায় ইহার বশবর্ত্তিনী হইয়া, যে কোন দিন অভিলষিত পুরুষের সহিত স্থানান্তরে যাইয়া বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে সমাজের কেহই তাঁহাকে কোনরূপ দোষ দেতে পারিবে না। হিঙ্গনা পূর্ব্বে আপন বিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করেন নাই। উদয় গিরির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে তাঁহার পিতা মাতা এইরূপ বলিতেন, তিনি ও শুনিতেন, কিন্তু প্রণয়ের মধুরতা ও বিবাহের সহিত উহার পবিত্র সম্বন্ধ তিনি কিছুই উপলব্ধি করেন নাই। নবীন অভ্যাগতের সহিত প্রথম দর্শনাবধি তিনি ভাবান্তর হয়েন, অরুণার কথায় তাঁহার সহসা আপন অবস্থা জ্ঞান হয় এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি অধিক

চিন্তা না করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন যে ঐ নবীন অভ্যাগতেরই গলে বরমাল্য দিবেন, এক্ষণে ভবিষ্যত ও ভবিতব্য ঈশ্বরের হাত।

চতুর্থপরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনা আপনি পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি রাজগুও। মাণ্ডালা প্রদেশে গুণ্ডজাতি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, যথা রাজগুও ও রাবণবংশী। রাজগুও রাজপুতদিগের অপভ্রংশ বলিলে অন্যায় উক্তি হয় না, কিন্তু উহারা কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি শুচি বিষেব ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা অধিক দূর যায়; এই জন্য উহারা অপরাপর গুওদিগের অপেক্ষা শুদ্ধাচারী ও অধিক সম্মানিত। উহাদিগের সচরাচর গৃহদেবতা ঠাকুর দেব নামে খ্যাত। ইনি গৃহের শান্তিরক্ষা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ঘনশ্যাম-দেব, নারায়ণদেব, সূর্য্যদেব, মাতাদেবী প্রভৃতি কয়েকটী দেব দেবী সর্ব্বদা পূজ্য হইয়া থাকে। মাতাদেবী—বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা করেন এই বিশ্বাসে গুওরা তাঁহাকে একান্ত ভয় ও ভক্তির সহিত মহাসমারোহে তাঁহাকে পূজা করে ও তাঁহার প্রীতির জন্য নানা প্রকার বলি প্রদান করে। ঘনশ্যাম দেবও বিশেষ পূজ্য। ইহাঁর মন্দিরে (যদি সামান্য কুটীরকে মন্দির কহা যায়) কার্ত্তিক মাসের শেষে শস্যের মঙ্গলার্থে মহাসমারো-হের সহিত পূজা ও বলি হয়; পরন্তু ইনি নিত্য আরাধ্য দেবতা, যেহেতু ইনি সকলের কামনা পূর্ণ করেন ও বিপদগ্রস্থ শরণাগত জনের দুঃখভার লাঘব করেন।

রাবণ বংশী গুওরা গোত্রভেদে ৪০ ভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ভাটের কার্য্য করে, কতকগুলি লৌহপত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু অধি-কাংশ অনাচারী, মদ্যপায়ী ও শ্রম-বিমুখ হইয়া কষ্টে কালযাপন করে।

গুওজাতির স্ত্রীলোকই সম্পত্তি; কেন-না সংসারের যাবতীয় শ্রমের কার্য্য উহা-রাই করে। এইজন্য কাহারও তিনটী কাহারও চারিটীর অধিক বিবাহ।

গুওদিগের প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতি মতে বিবাহ হয় না। তাহারা সচরাচর ভগিনীর পুত্র কন্যার সহিত আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে; ইহাতে ব্যয় কম হয়, ও সংসারের বন্ধন দৃঢ় হয়। কিন্তু কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইলে, তাহার সম্মতি আবশ্যক। বর সম্মতিহীন হইলে উহাকে কন্যার বাটীতে দাস্যবৃত্তি করিতে হয়। এই দাস্যবৃত্তি সময় কিছুই নিরূপিত নাই। উহা কন্যা-কর্ত্তার স্বেচ্ছানুসারে সাত আট মাস হইতে তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত হইতে পারে। কন্যা ইচ্ছা করিলে পলাইয়া ভিন্ন জনের সহিত বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু বিবাহ হওয়া আবশ্যক।

বিবাহের পূর্ব্বে বর আপন অবস্থানুসারে কন্যাকে উত্তম চুড়ী দিয়া উহার সম্মতি লয়েন ও গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষদিগের একদিন উত্তমরূপ আহার করান।

গুওদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহ প্রচ-লিত আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে না। স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বত্বে বিধবা অন্যজনকে বিবাহ করিতে পারে। এরূপ বিবাহের পূর্ব্বেও বরকে চুড়ী দিয়া বিধবার সম্মতি লইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত সামাজিক প্রথানুসারে উদয় গিরির স্বামিত্বের বিশেষ অধিকার আছে যেহেতু তিনি হিঙ্গনার পিতৃভগীনীর পুত্র, তাহাতে আবার তিনি সঙ্গতিপন্ন। উদয় গিরি এক্ষণে স্বদেশে উপস্থিত নাই। তিনি ফিরিয়া আসিলে হিঙ্গনার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইবে। প্রস্তাব কি? উহা একবারে স্থিরই আছে যে উদয়ই হিঙ্গনার পাত্র।

উদয়গিরি হিঙ্গনার জন্য চুড়ী পাঠাইয়াছিলেন হিঙ্গনাও তাহা পরিয়াছিলেন, উপহার মাত্র বিবেচনা করিয়া পরিয়াছিলেন; কিন্তু যখন অরুণা তাঁহাকে বার বার উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার সহসা চৈতন্য হইল যে তিনি উদয়কে কখন ভালবাসিতে পারিবেন না। তিনি এই বোধে একে একে সমস্ত চুড়ী খুলিয়া গাভিগণের শৃঙ্গে পরাইয়া দিলেন। অরুণা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি মনে মনে প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সেই দিন অবধি অরুণা উদয় গিরির ধন সম্পত্তি নিরন্তর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি তিনি প্রিয়সখী হিঙ্গনার রূপ সম্পত্তি, তাঁহার কৌমুদীর যৌবন কান্তি. বিষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, পাছে উদয় আসিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হয়েন। সেই দিন অবধি তিনি তাহারি ধ্বংশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি তিনি তাঁহার দুরদৃষ্টের ছায়া স্বরূপ-কাল ফণী স্বরূপ, হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ রহিলেন, সহৃদয়া সরলা হিঙ্গনা তাহার অণুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

মহীরাবণ বধ কাব্য

প্রথম সর্গ।

"মোহন তেঁ মোহে সবহি মন্ত্রনহ মুখ মুন্দি।
ভয়উ অদৃশ্য উঠাইকরিপ্রভুহিচলেউ সৈ কুদি॥"

কি সুখে উল্লাসে আজি ঘোর নিশাযোগে
সাগর আরোহী লঙ্কা? কহ দেবী
শ্বেত শতদল বন নিবাসিনী, শ্বেত কান্তি
সারদে, প্রণমি আমি তব পদাম্বুজে।
শোভে দীপমালা উর্দ্ধে, প্রাচীর উপরি,
প্রাসাদ চৌদিকে, সৌধ শিরে, উজলিয়া
রাজবর্ত্ম, উপবন, রণভূমি, দূর
বারিধি উপকূল. নীলাম্বু রাশি। কহ
মাতঃ বাগ দেবী! এ দাসেরে কৃপাকরি,
কেন শোভিল নিশীথ গগণ রাক্ষসী
পতাকাচয়ে নানাবর্ণে, কেন বাজিছে
ভেরী, তুরী, শঙ্খ, শিঙ্গা, করতাল, কাংস্য,
মৃদঙ্গ তমূল রবে? মিলিল সাগর
কল্লোল ধ্বনি জয়নাদ সনে বিদারি
শ্রবণ পথ, কম্পিয়া হৃদি থর থরে।
হতরণে অকম্পন, ভস্মাক্ষ, নিকুম্ভ,
কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, অতিকায়,
তরণি, ত্রিশিরা, মেঘনাদ, বীরশূন্য
এবে লঙ্কাপুরী, দেবী! পতি, পুত্র, ভ্রাতৃ
শোকে কাতরা নিশাচরীগণ, কিহেতু

তবে উৎসবিত রক্ষালয় কহ গো
জননী। এক পুত্র বিয়োগ শোক নাহি
সহে হৃদে, শত শত অনুতাপ শূল
হেন বিদ্ধে দশানন বক্ষঃস্থল; নাহি
জানি কোন ধৈর্য্যবলে প্রবোধিয়া মনে
বৈসে স্থির ভাবে রাবণ, কর্ব্বুর পতি,
আনন্দময় পুরে কনক সিংহাসনে! ॥

অযুত আবাস মাঝে শোভে সভাগৃহ,
বিশাল মন্দির, ময় দানব নির্ম্মিত
উজ্জ্বল ধবল পাষাণে, বিংশতি দ্বার
স্থার লৌহময় আবরিত হেমপত্রে;
রজত গঠিত তাল তরু সম উচ্চ
প্রকাণ্ড সহস্র স্তম্ভ শিরে রহে ছাদ
আচ্ছাদিত নীল কোশজ বসনে, চন্দ্র
সূর্য্য তারাবলি, সুরচিত স্বর্ণ রৌপ্য
সূত্রে, চমকে তায় নানা রতন মিলি
নয়ন উল্লাসি; রৌপ্য স্তম্ভ মেখলিত
একহারে সর্ব্বঠাঁই কনক প্রসূনেঃ
স্ফাটিক দর্পণ হেন প্রকাশে প্রাচীর
শুভ্র, কুট্টিম চিক্কণ। সম্রাট আসন
আরোপিত মধ্যভাগে রতন কাঞ্চনে
সুজ ভীমকায় চারি সিংহ পৃষ্ঠে হেম-
ময় স্থূল চারি দণ্ড, তাহার উপর
শোভে সুবর্ণ আসন চারু চক্রাকারে,
স্বর্ণ সোপান চারিধারে, রাজ ছত্র
হিরণ্ময়, সজ্জিত মুকুতা মণি মালে,
সংলগ্ন ছাদে সুবর্ণ দণ্ড সহকারে:
দীপিছে চৌদিকে স্বর্ণ দীপবৃক্ষে লক্ষ
লক্ষ সুবর্ণ প্রদীপ সুন্দর, সুগন্ধ
তৈলে পূর্ণ প্রতিভা চমকে শ্বেত শিলা
অঙ্গে, হৈম রৌপ্য কারুকার্য্যে, মণিময়
স্থানে অন্তর বিলাসি। বসেছে রাবণ
রাজা বিচিত্র আসনে; গলে দোলে মালা
মুকুতা গ্রথিত, দেব দুর্লভ, লোহিত।
তনু-ত্রাণ আবরে অঙ্গ, উজলে তায়
অমূল্য হীরক, মরকত, পীতরাগ,
কত শত মণি, কতবিধ আভরণ
নারি বর্ণিবারে; সশস্ত্র বিংশতি বাহু;
শিরে শোভে দশবিধ উপলে মুকুট
দশখান। শত শত রক্ষবীর ঘেরে
সিংহাসন, ভুজে অসি নিকোষিত, ভীম
মুরতি; কিঙ্করী দশ ঢুলায় চামর।
দাঁড়ায় সারণ, রাজ সচিব, সম্মুখে
কর যোড়ে নম্রভাবে; নীরব সকলে,
চিন্তায় নিমগ্ন এবে দশানন বলী।
যথন বারণ পতি অরণ্য ভিতর
উঠে গিরি শিরে, দূর বারি অন্বেষণে,
দাঁড়ায় চৌদিকে যূথ তার স্থির ভাবে
নেহারি তাহায়, সেইভাবে উপবিষ্ট
লঙ্কার ঈশ্বর আজি নিশাচর মাঝে॥
গভীর নিশ্বাস ছাড়ি কহিল পৌলস্ত্য,
গর্জ্জিল জলদ যেন প্রাবৃটে," সারণ!
এতদিনে পূর্ণ মনোরথ, কিন্তু, হায়!
কোথায় সোদর মোর প্রভঞ্জন হেন
বলশালী প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণ, কোথা
মোর পুত্র মেঘনাদ, ভুবন বিজয়ী,
অব্যর্থ কোদণ্ডধারী, কোথা অতিকায়
অঙ্কের ভূষণ মোর বীরকুলর্ষভ,
কোথাপুত্র বীরবাহু, নয়নের নিধি,
রাক্ষস গৌরব, হায়! একা আমি আজি
লঙ্কার ভিতর, দহে অহরহঃ হিয়া
মোর পুত্রশোকে,ভ্রাতৃশোকে,পৌত্র শোকে;
কেন বা পাঠানু, হায়! না যাই আপনি,
ইহাদের হেন কাল সদৃশ করাল
সমর ভিতর, নিজ দোষে হারাইনু
মহার্হ রতন, নিজে মজিনু, মজানু
সকলে। সারণ! এশুভ বারতা আজি
দিলকে? তোমারে কহ প্রকাশি আমায়॥"

শক্তি—সঙ্কীর্ত্তন।

জড়, জীব, দেহ, মন, যা হইতে প্রকটন
অনুক্ষণ সেইরূপ হৃদিমাঝে জাগায়ে,
পাই যেন পুনরায়, পূজিতে সে রাঙ্গা পায়,
জগৎ মধুর বারি তারা নাম শুনায়ে।

হেমচন্দ্র

পরজ—ঝাঁপতাল।

১

ইচ্ছাময়ী আদ্যাশক্তি বিশ্ব বিকাশিনী,
অচিন্ত্য অব্যক্তরূপা বুদ্ধি বিধায়িনী।

২

জড়বুদ্ধি জড়বাদী
জড়েরে বলে অনাদি,
জড়ে যে বিবেক গড়ে বিচিত্র কাহিনী!
পরমাণু নহে মূল,
স্থানু কি প্রসবে ফুল;
কেন তব হেন ভুল, বিদ্যাভিমানী?

৩

যবে সব একাকার
নিরাকার অন্ধকার
আছিলা কেবল শক্তি আকাশ ব্যাপিনী
আলো হলো অন্ধকারে
সাকার সে নিরাকারে
হইলা প্রকৃতি পরমাণু প্রসবিনী।

৪

পঞ্চভূত ক্ষয় হবে
পরমাণু নাহি রবে
নাহি রবে চন্দ্র সূর্য্য মঞ্জুলা মেদিনী
কালে নাহি ছিল যাহা
কালে নাহি রবে তাহা
কেবল কালিকা শক্তি কাল বিজয়িনী।

৫

কাল জিনিবারে চাও
কালিকা শরণ লও
মহাকালী মানবের নিস্তার কারিণী
ডাকরে জননী বোলে
জননী লইবে কোলে
তারা নাম গাও তারা ত্রিতাপ হারিণী॥

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

দুর্গোৎসব।

আজি বাঙ্গালার যে দিকে যাও, যেদিকে চাও, সকল স্থানই শোভাময়, উৎসবময় গীত বাদ্য আনন্দধ্বনি পরিপ্লুত। আজি চিরদুঃখী বঙ্গবাসীর এত আনন্দ এত উৎসাহ কেন? বাঙ্গালী কোন্ রণে জয়ী হইল? বাঙ্গালী কোন্ হারানিধি পুনঃ-

প্রাপ্ত হইল? সমস্ত বাঙ্গালা আজি কোন্ সুখে উন্মত্ত প্রায়? পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত বঙ্গবাসী সম্বৎসররূপ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া, লোভনীয় ফল ফুলশালী, সুরম্য উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই আজি বঙ্গবাসীর এত আনন্দ এত উৎসাহ। সম্বৎসর পরে আনন্দময়ী, বিশ্বজননী বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়াছেন—সম্বৎসর পরে সকলে মিলিয়া নয়ন ভরিয়া স্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিবে—হৃদয় ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিবে—দেহ মন মায়ের সুশীতল চরণে অর্পণ করিয়া জুড়াইবে, তাই আজি সমস্ত বঙ্গবাসীর এত আনন্দ ও উৎসব।

বাঙ্গালী নিখিল বিশ্বরচনার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া বহুকাল হইতে বিশ্বমাতা অনাদ্যা আদ্যাশক্তির উপাসনা করিতে শিখিয়াছে—বহুকাল হইতে বুঝিয়াছে একমাত্র পরমাশক্তি হইতেই চেতন, অচেতন, দেহ ও মন সকলেরই উৎপত্তি। প্রত্যেক বাঙ্গালী সেই আদ্যাশক্তিকে জননী বলিয়া জানে। মা আছেন, ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস। কিন্তু সেই মায়ের স্নেহময়ী মূর্ত্তি কেহ কখন দেখে নাই। ভক্তিমান বাঙ্গালীর মাতৃদর্শন সাধ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। জননীর অদর্শনে কোমলহৃদয় বাঙ্গালী অত্যন্ত কাতর হইতে লাগিল। কিন্তু সে সাধ সাধনা করিয়া ও মিটিল না—সে অন্তরের কাতরতা কিছুতেই দূর হইল না। ব্যাকুল হইয়া, হতাশ হইয়া বাঙ্গালী, জননীর রূপ কল্পনা করিল হৃদয়োচ্ছাসে, ভক্তিপ্রাবল্য বাঙ্গালী অচিন্ত্য অব্যক্ত-রূপার, মূর্ত্তি রচনা করিল। বাঙ্গালী আজি সেই আনন্দময়ী জগদম্বার দর্শন পাইয়াছে—বাঙ্গালীর চির দিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে—তাই আজি বঙ্গবাসীর এত আনন্দ এত উৎসাহ।

বিশ্বজননীর মৃণ্ময়ী, হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে বলিয়া বাঙ্গালী কি মহাপাপী হইল? এ কথা যে বলে, সে কিছুই বুঝে না। পৌত্তলিকতা মনুষ্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠাংশ। যেখানে প্রেম, যেখানে ভক্তি, যেখানে কৃতজ্ঞতা—সেই খানেই মূর্ত্তি রচনা, সেইখানেই আলেখ্য লেখা, সেইখানেই পৌত্তলিকতা। স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কি রামচন্দ্র মহাপাতকী হইয়াছেন? রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ স্বর্গীয় পিতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, রাজোদ্যানে প্রস্থাপিত করিয়া কি মহাপাপ করিয়াছেন? না, প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্ব প্রেমিক হেয়ারের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে? এই সকল মহৎ কার্য্য—এই সকল মনোহর পৌত্তলিকতা যদি মানব সমাজে মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী অবশ্যই মহাপাতকী। সহস্র মুখে সমস্ত মানবজাতি যুগপৎ বাঙ্গালীকে পৌত্তলিক বলুক—পশু, পক্ষী, কীট, কীটাণু যে যেখানে আছে যুগপৎ বাঙ্গালীকে পৌত্তলিক বলুক—পৌত্তলিকতা বাঙ্গালীর শ্লাঘার বিষয়। কর, বাঙ্গালী যুগে যুগে সেই সর্ব্বমঙ্গলা আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা কর ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান এক হইয়া সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আর্য্যচিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া শুদ্ধ মনে ও শুদ্ধাচারে ভক্তি সহকারে সেই পরমাশক্তির মহিমা কীর্ত্তন কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে, তোমাদের শরীর ও হৃদয়ে প্রভূত শক্তির

সঞ্চার হইবে, এবং তোমাদের এই প্রাণ তুল্য বঙ্গদেশ, মর্ত্তে নন্দনকানন হইবে। কর, বাঙ্গালী চিরদিন শক্তির পূজা কর।

"জ্বাল ধূপ, জ্বাল ধূনা; শঙ্খ ঘণ্টারবদুনা।
কর বঙ্গ বাসী যত জন;
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিল্ব অগণন
বৃষ্টিকর মাথায়ে চন্দন;
দেও জল দূর্ব্বাদল, পঞ্চ গব্য সিন্ধু জল
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ;
ঢাল চরু ঢাল সুরা, অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
কর হোমে হব্য বরিষণ।"

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

মধুযামিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিন দিবস অতীত হইল তরুণ পুরুষের কোন সংবাদ নাই; হিঙ্গনা চিন্তাকুলা। তাঁহার কবরী বন্ধনশ্লথ। একটী পুষ্পিত লতা পাশে উহার উপরিভাগ আবদ্ধ। হস্ত নিরলঙ্কার, মুখখানি ঈষৎম্লান। অধরটী রসহীন, কান্তিহত। নয়নদুটী বিষাদসিক্ত সুমিষ্ট ও ক্ষণ-চঞ্চল। বামহস্তে বাঁশরি দক্ষিণহস্তে রক্তবর্ণ ওড়নার কিয়দংশ ধরিয়া তিনি সম্মুখে গিরি, নদী, উপত্যকা, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, অরণ্য, আকাশের প্রতি চাহিয়া আছেন। প্রেম, যৌবন, আশা, আকাঙ্খা, সুখ বাহ্য ও অন্তর সমস্তই এক জন অপরিচিতে নীত হইয়াছে। এই অপরিচিত জন কে? উহার অন্তর কীদৃশ? উঁহার কে আছে? উঁহার বসতি কোথায়? বা উপজীবিকা কি কিছুই জ্ঞাত নহেন। সরল অন্তরে হৃদয় তাঁহাতেই অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে ভাবিতেছেন তিনি কোথায়? প্রণয়ের দেবশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনিও অনতিবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত। এই সুখময় সংযোজন কল্পনা সৃষ্ট নহে। উহা আধ্যাত্মিক আকর্ষণ, শুভ-সংঘটন, বা ঐশ্বরিক সম্মিলন যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই! কিন্তু উহা যে রচনা চাতুরী একথা বলিলে প্রাণে নিতান্তই ব্যথা পাইব সন্দেহ নাই; কেননা উহা কাতর ব্যথিত, অধীর প্রাণের একমাত্র বিশল্যকরণী।

অপরিচিত নিকটবর্ত্তী হইলে, হিঙ্গনা সজল নয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাপদগ্ধ প্রাণে সহসা সুবৃষ্টি হইল। হৃদয়-ক্ষেত্রে নব আশা পুনরপি সজীব হইল। অপরিচিত হিঙ্গনাকে সহসা কাঁদিতে দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না! কিহেতু কাঁদিলেন! তিনি বীর ও ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান ও স্নেহ সহকারে তাঁহার নিকট আসিয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হিঙ্গনা নিরুত্তর। পুনরপি জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি নতমুখে মৃদুস্বরে কহিলেন "আপনি কয়েক দিন

আসেন নি” এইস্নেহপূর্ণ বচনে অপরিচিতের নয়ন যুগল ও স্নেহবারি অভিষিক্ত হইল। প্রণয়ীর প্রাণ হতাশে আশা করে; আশা পাইলে পুনরায় আশ্বাসিত হইতে চায়। অপরিচিত কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি আমার জন্য চিন্তিত ছিলেন!” হিঙ্গনা পূর্ব্ববৎ ভাবে কহিলেন “আপনি শীঘ্র আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন, আমি আশা করিয়াছিলাম।”

অপরিচিত। আমি আজ অবধি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইব বলিয়া আমি আপন বাটীর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম, এইক্ষণে অনুমতি হয়ত আপনার অনুবর্ত্তী হই।

হিঙ্গনা। (হেঁটমুখে) আপনাকে আমার পিতার অনুমতি লইতে হইবে।

অপরিচিত। তিনি যদি সম্মতি না দেন?

হিঙ্গনা। “আপনাকে প্রথমে কিছু অর্থ দিতে হ'বে—যদি না থাকে”—(এই বলিয়া তিনি তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া—)

অপরিচিত। কত অর্থ?

হিঙ্গনা। আমি জানি না—আ—আপনি —যা—পারেন।

অপরিচিত। তবে আমি আপনাকে বাটীতে রাখিয়া ঐ দূর গহন বনে ব্যাঘ্র শীকারে যাই। যদি অদৃষ্টক্রমে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র শীকার করিতে পারি, তাহ'লে কিছু অর্থের সংস্থান করিতে পারিব।

হিঙ্গনা। (সভয়ে) না—(হেঁটমুখে) আপনি শরের অগ্রভাগ দিয়া এই বৃক্ষতলের মৃত্তিকা খনন করুন, অর্থ পাইবেন।

অপরিচিত। উহা কাহার অর্থ? আমি অন্য জনের দ্রব্য লইব না।

হিঙ্গনা। (ছলছল নয়নে) উহা আমার আপনি লউন।

অপরিচিত। আপনি আমাকে ধার দিতেছেন।

হিঙ্গনা। হাঁ—হাঁ—আমি ধার দিতেছি। আপনি ব্যাঘ্র শীকার করিতে যাবেন না বলুন?

অপরিচিত। (ঈষৎ হাসিয়া) না—

অপরিচিত বৃক্ষ তলের মৃত্তিকা খনন করিয়া বারোটী মুদ্রা পাইলেন। তিনি মুদ্রাগুলি লইয়া গদগদ স্বরে কহিলেন “হিঙ্গনে! আমি আপনার এধার আজীবন সুধিতে পারিব না। এক্ষণে চলুন আপনার বাটী যাই”। হিঙ্গনা কহিলেন, “একটু অপেক্ষা করুন্ আমি কয়েকটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব”। অপরিচিত সরলভাবে উত্তর দিতে স্বীকৃত হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার নাম কি? আপনি কি রাজপুত? আপনার কে আছে? আপনার বাটী কোথায়?’ অপরিচিত ঈষৎ সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন “আমার নাম কুমার, আমি রাজপুত দিগের শ্রেষ্ঠ বংশীয় লোক, আমার একটী ভগিনী মাত্র আছেন। আমার বাটী আমার অগম্য পার্ব্বতীয় স্থানে, আপনি সে স্থান কখন দেখেন নাই, সুতরাং ঐ স্থানের নাম করিলেও আপনি জানিতে পারিবেন না।” হিঙ্গনা আর বিশেষ কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া অপরিচিতকে তাঁহার সঙ্গে বাটী আসিতে বলিলেন; তিনি অনুচরের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনার নিতান্ত অনুরোধে ও আপাততঃ কয়েকটী মুদ্রা পাইবার লোভে তাঁহার পিতা ও মাতা কুমারকে বাটীতে রাখিতে সম্মত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা কুমারকে বিশেষ করিয়া কহিলেন যদি তিনি সর্ব্বদা অলস হয়েন বা কার্য্যে অনিচ্ছুকতা প্রকাশ করেন, বা বিনা অনুমতিতে হিঙ্গনাকে গন্তব্য স্থানে ব্যতীত অন্য কোন স্থানে লইয়া যান, বা রাত্রি-কালে নিজ বাটীতে না যাইয়া এস্থানে থাকেন। তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ বিবাহের কোন আশা থাকিবে না। কুমার তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সম্মত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হিঙ্গনার হস্তে সমর্পণ করিয়া দাস-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। হিঙ্গনার পিতা মাতা মনে মনে স্থির করিয়াছলেন যে উদয়গিরি বাটীতে আসিলেই তাঁহারা কোন না কোন বিষয়ে দোষ দেখাইয়া কুমারকে তাড়াইয়া দিবেন, ইতিমধ্যে বিনা বেতনে যে কয়েক দিন তাহার দ্বারা গৃহের কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন যে কয়েক দিনই মঙ্গল।

এদিকে হিঙ্গনা প্রফুল্ল হৃদয়ে কুমারকে গৃহের নানারূপ কার্য্য করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এমন শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষায় এরূপ মধুময় পরিণাম সদা সম্মুখে থাকিলে শিক্ষায় কাঠিন্য, পরাধীনতায় ক্লেশ ও দাসত্বের হীনতা কোথায়? কুমার ও সানন্দ হৃদয়ে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতি কার্য্যে উভয় পক্ষে সরল অন্তর সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সুমিষ্ট বাক্য, সুধাপূর্ণ হাস্য কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, সম্মান, দাক্ষিণ্য ও অভিন্নতার প্রকাশ পাইতে লাগিল! এতদ্ভিন্ন নিঃস্বার্থ প্রেমের জ্যোতিঃ আত্মায় আত্মায় নিরন্তর প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ হৃদয় প্রীতিপূর্ণ, জগৎ সুধাপূর্ণ, দেহ স্বাস্থ্যসম্পন্ন, চিত্ত সরল ও সুবুদ্ধির অনুগত, যৌবন ধর্ম্মের শরণ্য— এইরূপে দুইটী প্রিয়তম আত্মার ক্রমশঃ শুভ সম্মিলন, সংযোজন, পরিণয় ও একতা সংস্থাপন হইতে লাগিল।

হিঙ্গনা প্রভাতে গাভীগণ লইয়া পর্ব্বতদেশে গমন করিলে কুমার কোন কোন দিন গৃহে থাকিয়া হিঙ্গনার কার্য্য সমাপ্ত করেন, কোন দিন বা তাহার সহিত পর্ব্বতদেশে যাইয়া কাষ্ঠ আহরণ করেন। কুমার রাজপুত হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, তাহা হিঙ্গনার পিতা মাতা বিশেষ জানিতেন সুতরাং তাঁহার সহিত একত্র পর্ব্বতদেশে যাইতে তাঁহারা কুমারকে কোন বাধা দিতেন না। সন্ধ্যা হইলে তিনি হিঙ্গনার নিকট হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন।

হিঙ্গনার পিতা মাতা কুমারের আবাস কোথায়ও কিরূপ কিছু জানিতেন না, জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল না; যেহেতু তাঁহারা যদিও প্রথমে কুমারের সুকুমার বয়স ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তথাচ তাহাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে উদয়গিরি বাটীতে আসিয়া বস্ত্র,

অলঙ্কারাদি হিঙ্গনাকে দেখাইলে তিনি নিশ্চয় উদয়গিরিকে পতিত্বে বরণ করিবেন। হিঙ্গনাও কুমারের আবাস কোথায় জানিতে বা দেখিতে বিশেষ উৎসুক হয়েন নাই, কেননা তিনি কুমারের রূপ ও গুণের পক্ষপাতিনী, তাঁহার আবাস জীর্ণকুটীর হইলেও তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে প্রস্তুত।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, কুমার প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দাসের কার্য্য করেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে তিনি আপনি পাক করিয়া সামান্য আহার করেন। এইরূপ পরিশ্রম ও সামান্য আহারে তাঁহার দেহের লাবণ্য হ্রত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হিঙ্গনাও সতত প্রিয়তম সঙ্গে থাকিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিলেন।

অরুণা প্রায় প্রতিদিনই হিঙ্গনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ও প্রসঙ্গ ক্রমে উভয়ের হৃদয়ের ভাব পরীক্ষা করিয়া যান, তথাপি হিঙ্গনার ক্রমশঃ যৌবন বিকাশ ও দেহের অনুপম লাবণ্যের দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া তিনি বিশেষ ঈর্ষান্বিতা হইতে লাগিলেন। এই ঈর্ষা তাঁহার হৃদয়ে যত প্রকাশ হইতে লাগিল ততই তিনি শুষ্কদেহী ও মলিন-মুখী হইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, যখন কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহাকে অসুখী বা রুগ্ন দেখিতেছেন বলিতেন, তখন তাঁহার কষ্টের আর সীমা থাকিত না; বিশেষ এরূপ কথা হিঙ্গনার নিকট শুনিলে তাঁহার আহার ও নিদ্রা হইত না। তিনি ক্রমশঃ হিঙ্গনাকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন;—তাঁহাকে চিররুগ্ন বা এককালে ধ্বংশ করিতে পারিলে সুস্থ হয়েন। কিরূপে ধ্বংশ করিতে পারেন এই তাঁহার নিরন্তর চিন্তার বিষয় হইল।

একদা হিঙ্গনা অরুণার সহিত বসিয়া কুমার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভাটিয়া আসিয়া একখানি পত্র ও একটী কাঠের বাক্স তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "এই পত্রখানি ও এই বাক্সটী উদয়গিরি পাঠাইয়া দিয়াছেন।" হিঙ্গনা পত্র সহিত বাক্স লইয়া পিতার নিকট গেলেন অরুণাও শীঘ্র উঠিয়া দেখিতে গেলেন বাক্সে কি আছে। হিঙ্গনার পিতা পত্র পড়িয়া তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত আহারাদি করাইবার জন্য তাঁহার পত্নীদিগকে ডাকিলেন, এবং ঐ বাক্সটী তুলিয়া আপন সিন্দুক মধ্যে রাখিলেন। অরুণা হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার হিঙ্গনার নিকট আসিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ঈর্ষানল দ্বিগুণতর প্রজ্জলিত হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

নিদাঘে চাতক।

১

দারুণ নিদাঘ কাল! জলন্ত মরীচিমালা
আতপে তাপিত সদা নিখিল সংসার
দিবা নিশি জীবকুল করে হাহাকার!
শীতল সমীর হায়! হুতাশন সম বায়,
শীতল সলিলে নাহি শৈত্যগুণ তার,
দাবদাহে জলে যেন প্রান্তর কান্তার!

২

চাতক কাতর মনে, নিভৃতে বসিয়া বনে,
আকাশের পানে চাহি অনিমেষে রয়,
পরমুখ চাহি ভবে কেবা সুখী হয়?
দেখিতে দেখিতে নীল, নব ঘন দেখা দিল,
পুলকে চাতক চাহি রহিল তাহায়।
আশার আশয়ে জীব জীবন কাটায়!

৩

বিস্তারিল মেঘমালা, ভাতিল বিদ্যুৎবালা,
অধিক উৎসুকে পাখী রহিল চাহিয়া;
'অধিক উৎসুকে' মেঘ যায়কি গলিয়া?
নশ্বর নিটোল কায়, ঢলে ঢলে চলে যায়
প্রতিপল জল যেন হয় মনে লয়;
মনের বাসনা কিন্তু মনে মনে রয়।

৪

যথা আশা প্রকাশিল, মেঘমালা মিলাইল;
চাতক রহিল চাহি হতাশ নয়নে,
দীনের তাকান, বল, ঘুচিবে কেমনে?
না ঝরিল মেঘদল, চাতকের চক্ষে জল,
তথাপি আকাশ মুখে তাকায়ে রহিল;
উপহাসি কাদম্বিনী যথা লুকাইল।

৫

চাহনি হইল সার, তোর, পাখী, বারবার;
আকাশের মেঘে আশ মর্ত্তে করি বাস?
কেন না হইবি, বল, তুইরে হতাশ?
স্বর্গবাসী মেঘরাশি, তুই ক্ষুদ্র বনবাসী,
বামনে ধরিতে চাঁদ কেবা কোথা পায়?
তুই তার মুখ চাস্, সেকি তোর চায়?

৬

ভাল যে বেসেছে প্রাণে, স্বর্গমর্ত্ত সে কি জানে?
মানে কি সে গিরি নদী সাগর ভীষণ?
কোথা আকর্ষণ ভালবাসার মতন?
সঁপিব হৃদয় যায়, সে যদি না ফিরে চায়
তথাপি পরাণ আমি সঁপিব তাহায়!
ভাল শিক্ষা আজ, পাখী, দিলিরে আমায়!

এক ফোঁটা জল।

সেদোর এবার সর্ব্বনাশ। কাচ্ছা বাচ্ছা গুলি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যাবে। সেদোর স্ত্রী ঢের বারণ করেছিল যে মিন্সে এমন কাজ করিনে। তা সেদো কি কাহারও কথা শোনবার লোক। যখন সেদোর পরিব্যর দেখ্‌লে যে অবলা কুল-

বালার কথা রহিল না তখনও স্বামীকে এক দিন বলিয়াছিল "গুরুর কথা না শুনলি কানে, প্রাণ যাবে তোর হড়কাটানে।" বাস্তবিক সেই কথা এখন ফলেছে।

সেদো চাষা চিরকালটা পরের চাকরি করে। দিন আনে দিন খায়। এক বেলা ভাত এক বেলা উপবাস। আবার সময়ে সময়ে ঝড় বৃষ্টির দিনে কাজ কামাই হ'লে দুবেলা উপবাস ঘটিত। এইত সেদোর সুখ।

এক দিন বেলা দুপ্রহর, সেদো মনিবের জমি চসিতেছে। ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপ, সহজ লোকের মাথা গরম হয়, সেদোরত একটু ছিট ছিল। সেদো আপনা আপনি কত কি বকিতে আরম্ভ করিল। বলি, চিরকালটাই কি এক রকমে কাটাব। এত বড় মিন্সে হলুম, চাষের সকল রকম কাজই শিখেছি, তা পরের জন্যে খেটে খেটে কি বুড় হব। বুড় হলেত আর খাটতে পারব না, তখন খাওয়াবে কে? আমার মনিবের কেমন মজা, নিজেত লাঙ্গলে হাতটি দেন্‌না, আমিই সব করি, লাভে হতে তাঁর সম্বৎসরের ধন গোলাজাৎ করেন, বীজের ধান থাকে, জমিদারের খাজনা দেন, আবার কি বৎসর, গিন্নির এক খানা রুপোর গহনা হয়। আর আমার মাগের সেই রুপোর পৈচে আর কাঁসার মল। না, আর গোলামি করব না, আজই কাজে জবাব দেব। মাগের গহনা বেচে কিনে কতক জমি খাজনা করে নেবো এক বৎসর চাষ করি, মরি-আর-বাঁচি।

সেদো যা বল্লে তাই কল্লে। কাজে জবাব দিয়ে এখন নিজের খাজনা করা জমিতে চাষ করচে। সেদো এখন স্ত্রীর গুরুবাক্য গ্রাহ্য না করে সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিশ বিঘে জমির চাষ আরম্ভ করেছে সেদোর কপালে সে বৎসর বিস্তর ফসল হইয়াছিল। আশার দ্বিগুণ ফল ফলিয়াছিল। আর হাবার মার (সেদোর স্ত্রীর) সেদোর খোঁটার জ্বালায় ঘর করা দায় হইয়াছিল।

এবার হাবার মার পালা। আকাশে এক ফোঁটা জলের নামটি নাই। সেদোর সোনার ফসল শুকিয়ে গেল। সেদো আর ঘরে আসে না। দিন রাত মাঠেই থাকে। মেয়েটি দুটি দুটি ভাত মাঠে দিয়া আ'সে, সেদো তাই খায় আর আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। "হা ঈশ্বর কল্লে কি!" সর্ব্বদা সেদোর মুখে এই কথা। এখন আর রাত দিন কাঁদিলে কি হ'বে। চোখের জলে কি ফসল হয় সেদোর যা হচ্ছে তা সেদোই জানে জমি টুকুর খাজনা দিতে আর লাঙ্গল গরু কিন্‌তে তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ঘরে পিত্তল কাঁসার নামটি নাই। সকল গুলিই বেচিতে হইয়াছে, তাই ছাই খেতে পায় না পায়, নিজের ঘর খানিতে পড়ে থাক্‌বে, সেটীও হবার যো নাই। ঘর খানি বাঁধা এখন খায় কি! যায় কোথা।

সেদো এক পসলা বৃষ্টির জন্য দেবতাগণকে বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়াছে। কত পূজা মানিয়াছে। কিন্তু চাষার কথা শোনে কে। এখন ভাল কথায় কিছু হইল না দেখিয়া সেদোর মুখে বাঁকা বুলি আরম্ভ হইয়াছে। "দেবতারা কি মরেছে, না আকাশে আগুন লেগেছে? তা,না হ'লে এমন দিনে একটু বৃষ্টি নাই কেন। বৃষ্টি

হওয়া দূরে থাক্, পোড়া আকাশে এক খানা কাল মেঘের দেখা নাই"।

সেদো আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আপনার মনে কত কি বকিতেছে। এখন একখানি মেঘের কোলে বসিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টি সেদোর বকাবকি শুনিতেছিল। আর একটী ফোঁটা বৃষ্টি সেইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "অমন একদৃষ্টে কি দেখ্‌চিস্ ভাই"। পূর্ব্বের ফোঁটাটি বলিল "দেখ ভাই একটা মিন্সে আমাদের দিকে চেয়ে আমাদের কি বল্‌চে"। "কই, কই"? "এই চিলের ঝাঁকটা আড়াল করেছে, ঐ দেখ্ দেখেচিস্"? দেখেছি, সত্যি ভাই মিন্সেটা পাগল, আচ্ছা চুপ কর দেখি শুনি, মিন্সে কি বলে"।

বৃষ্টি ফোঁটা দুটি স্থির হইয়া সেদোর দুঃখের কাহিনী শুনিল। তন্মধ্যে একটী হাসিয়া উঠিল, অপরটী হাসিতে যোগ না দিয়া বলিল "দেখ ভাই লোকটার কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ, এক ফোঁটা জলের জন্য লালায়িত; যদি এক বিন্দু আকাশের জলে লোকটার উপকার হয়, না হয় আমিই যাই"। এই বলিয়া জল বিন্দুটী শূন্য হইতে পড়িবার উদ্যোগ করিল। অপরটী তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিল "কর কি? একটা সামান্য চাষার জন্য নিজের প্রাণটি খোয়াবে কেন। চাষা ভারি সেয়ানা, ওকি এক ফোঁটা—মুখে বল্‌চে এক ফোঁটা ইচ্ছা এক পস্‌লা। দাঁড়াও না ছাই, আগে আমার কথাটা শেষ হউক, তখন ইচ্ছা হয় পড়িও। তুমি এক বিন্দু জল বইত নয়, হয়ত তোমাকে নিচে পড়িতে হইবে না, শূন্যেতেই কোন পক্ষী পান করিয়া ফেলিবে। যদি ভাগ্য ক্রমে পৃথিবীতে পড়িতে পার, তাহলেও বিপদ। একলা পাইয়া পৃথিবী তোমাকে হরণ করিবে। চাষার কোন উপকারে আসিবে না। যখন আমরা দলবদ্ধ হইয়া যাই, তখন আমাদের অনিষ্ট করে কার সাধ্য। পৃথিবী হরণ করিলে, তাহাকে ভেদ করিয়া আমরা সবলে নদী গর্ভে পতিত হই। আবার সূর্য্য মামার লেজটি ধরে নাচিতে নাচিতে স্বর্গে আসি।"

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে অপরটি বলিল "যা বল যা কও, আমি নিশ্চয়ই যাইব। পরোপকারে প্রাণ যায় সেও স্বীকার মনে কর দেখি ভাই, সামান্য কষ্টে কি অত বড় মিন্সের চোখে জল আসে! আমি চলিলাম।" যেমন বলা, অমনি শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে জল বিন্দুটি সেদোর থ্যাব্‌ড়া নাকে টপাস্ করিয়া পড়িল। জলটুকু আর জমিতে পড়িতে পাইল না, থ্যাবড়া নাক ভিজাইতেই সবটুকু ফুরাইয়া গেল।

সেদো নাকে হাত বুলাইয়া চার পাটী দাঁত বাহির করিয়া ফেলিল। "অ্যাঁ, বৃষ্টি হবার আশা আছে। হাজার হোক পরমেশ্বর আছেন কি না, পোকা মাকড়ের আহার যোগান যিনি, তিনি আর আমাদের দুমুটো খেতে দিবেন না।"

পতিত বৃষ্টি ফোঁটাটির সঙ্গী আকাশে থাকিয়া সেদোর হাসি দেখিল। তাহার মনে মনে ধিক্কার জন্মিল। "কি আশ্চর্য্য আমার সঙ্গী যা বলিয়াছিল সব সত্য। আমিও যদি সঙ্গে যাইতাম, নাজানি চাষার আরও কত আনন্দ হইত। আমি এখনও যাইনা কেন। যেমন প্রতিজ্ঞা অমি পতন॥ এ ফোঁটাটি সেদোর মস্তকে পড়িল।

সেদো এবার আর মনের আহ্লাদ মনে রাখিতে পারিল না। বগল বাজাইয়া এক লাফ।

পতিত দুইটি ফোঁটার কথা বার্ত্তা দূর হইতে কতক কতক শুনিতে পাইয়া আর কতকগুলি বৃষ্টিফোঁটা উহাদের নিকট আসিতে ছিল; কিন্তু ইতি মধ্যে উহাদিগকে পড়িতে দেখিয়া এবং দুফোঁটা বৃষ্টি পাইয়া চাষার সেই গাল ভরা হাসি দেখিয়া তন্মধ্যে একটী ফোঁটা বলিল "দেখ দেখ দুফোঁটা জল পাইয়া চাষা কত খুসি, না জানি আমাদের সকলকে পাইলে উহার কতই আনন্দ হইবে, এস আমরাও পড়ি।

টপা টপ্ টপ্ টপ্ চড় চড় চড় চড় শব্দে বৃষ্টিফোঁটাগুলি চাষার ক্ষেতের উপর পড়িতে লাগিল। মেঘেরা মহা বিপদে পড়িল। বৃষ্টি শূন্য হইলে তাহাদের গাম্ভীর্য্য থাকে কই? তাহারা সকলে একত্র হইয়া বৃষ্টি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল হুড় মুড় দুড় দুড় গুড় গুড় শব্দে গর্জ্জন করিয়া জলবিন্দু গুলিকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কার কথা কে শোনে; দেখিতে দেখিতে ধূমল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। চারিদিক অন্ধকার। মেঘেরা আপনা আপনি অন্ধকার করিয়া আপনারাই দেখিতে পায় না। কোথা দিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কিছুই ঠাওরাইতে পারে না। মহা মুস্কিল। বিদ্যুৎ সহচরী আসিয়া আলো ধরিল। পোড়া বাতাসে কি আলো থাকে। একবার নিবিয়া যায় আবার জলিয়া উঠে। মেঘগুলির পাগলামি দেখিয়া বৃষ্টি গুলির আরও মজা হইল। তাহারা এদিক ওদিক চারিদিক দিয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল।

সময়ে জল পাইয়া সে বৎসর বিস্তর ফসল জন্মিল। সেদোর দেনা শোধ গিয়া হাতে দুটাকার সংস্থান হইল। এক বৎসরের মধ্যেই সেদো সাধুচরণ হইল।

পরের উপকার করিতে কিম্বা দেশের হিতসাধন করিতে কখনও বলিও না যে আমি অতি সামান্য লোক, আমি আবার কাহার কি উপকার করিতে পারি। যদি মনে এরূপ অসদ্ভাবের উদয় হয়, তখনই এই এক ফোঁটা জলের কথা ভাবিও।

দেখ আমাদের দেশের হিতের জন্য জাতীয় ধনভাণ্ডার করিবার উদ্যোগ হইতেছে, এস আমরা সকলে কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি কেরাণী, কি গরিব, কি ভিখারি—এক এক ফোঁটা জলের ন্যায় অগ্রসর হই; দেখি তাহাতে এক পসলা বৃষ্টি হয় কি না! আশার দ্বিগুণ ফল জন্মাইতে পারি কি না!

তিনটী রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কামিনী।—আরো বলিতে লাগিলেন দ্বিতীয় সোপান একটী রমণী-সভাস্থাপন, সে সভার অধিবেশন আপাততঃ প্রকাশ্য স্থলে না হইয়া অন্তঃপুরেই হইবে; তথায় কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। এই সভায় শিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা অঙ্গনাগণ আপনাদিগের সামাজিক অবস্থার আন্দোলন করিবে। বিনোদ, আপাততঃ আমাদিগের স্বাধীনতা এই সাময়িক সভায় উপস্থিতিরূপ সঙ্কীর্ণ অধিকারে বদ্ধ থাকিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এই অধিকার সকলের স্বামী সকলকে দিতে প্রস্তুত কি না। অবশ্য সকলেই স্বীকৃত হইবে না, কিন্তু অনেকেই অন্তঃপুরস্থ সভায় আপনাদিগের সহধর্ম্মিণীকে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইবে না; কারণ এই সভা আর কিছুই নহে, কেবল আধুনিক শ্রাদ্ধাদি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কুটুম্ব-বাটী গমনের নামান্তর মাত্র। এখন যে নিমন্ত্রণ প্রণালী চর্ব্ব্যচোষ্য আহারে, পরনিন্দায়, অলঙ্কারের আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে স্বামীর আসক্তি অনাসক্তি যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিরূপণে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বোধ হয় সে প্রথার উদ্দেশ্য হয়তো একসময় মহৎ ছিল। হইতে পারে প্রতিষ্ঠাতা সমাজ সমালোচনাভিপ্রায়ে এপ্রথা স্থাপন করিয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক আমাদিগের সীমাবদ্ধ অন্তঃপুরস্থিত সভায় অধিকাংশ বঙ্গবামাগণের উপস্থিত হইবার সুবিধা হইবে এবং অল্পে অল্পে অনেক উত্তম কার্য্য সাধিত হইতে থাকিবে। পরে যেমন আমাদিগের শিক্ষার ও মনের দৃঢ়তার উন্নতি হইবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্য্য ও উদ্দেশ্য প্রসারিত হইবে। (কমলমণির দাড়িতে হাত দিয়া) কমল! যা বল্লুম তাকি অসঙ্গত বোলে বোধ হল।

কমল—কিছু না। তোমার নিকট হতে আমরা অনেক শিক্ষা করিলাম, অনেক অসঙ্গত ভাব যাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম, তোমার হৃদয়গ্রাহিনী বাণী শুনে তিরোহিত হলো। আজ তোমার সহিত কথোপকথনে যে সুখ উপভোগ করিলাম, যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম, আর কখন যে অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল তাহাতো মনে পড়ে না। প্রাণনাথের উপদেশে যাহা শিক্ষা করিতে পারি নাই, তাহা আজ তোমার নিকটে শিখিলাম।

কামিনী।—আজ যাহা বলিলাম তাহার যদি কিছু গুণ থাকে, সে আমার নয় সুরেশ চন্দ্রের। সুরেশচন্দ্রকে স্বামী পাইয়া আমি যে কত সুখী তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে পারি না। অন্য কোন নারী বা আমি আমাদিগের সামাজিক [illegible] যতদূর না দুঃখিতা বা অবস্থোন্নতির জন্য যত না ব্যগ্রা সুরেশ চন্দ্র আরো অধিক দুঃখিত ও ব্যগ্র।

সুরেশচন্দ্রের মত পুরুষ সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে তত শীঘ্র বঙ্গবামার শুভদিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। বিনোদ, তোর কানে আমার কথা গুলি কি প্রবীণার মত বাজলো ?

বিনোদ।—না দিদি, তোমার কথা শুনে আমার অনেক ভ্রম অপনীত হইয়াছে ও মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে এক দিন না একদিন আমাদিগের দুঃখনিশা পোহাইবে !

কামিনী।—বিনোদ, যদি তোর একটী ভ্রমও দূর করিতে ও মনে একটুও আশা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার আজিকার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। বিনোদ, আরও অনেক বক্তব্য ছিল বিশেষতঃ শাশুড়ী ও বধু সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিবার বাসনা ছিল কিন্তু আজ রহিল, আর একদিন বলিব।

সন্ধ্যা উপস্থিত—আর এ বাগানে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নয়—চল বাড়ী যাই। কমল, তোর জ্যোতিশ্চন্দ্র কেমন আছে? শুনেছি (হাসিতে ২) তোর কুড়ি বৎসরেও ছেলে হলো না দেখে (কাণে২ কি ফিস২ করিয়া বলিল) আবার একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী—রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন—কথাটা কি সত্য ?

কমল—(হাসিতে২) হেঁ সত্যই তো দিদি। শুনলেম জ্যোতিষের আবার বিবাহ হবে—আর—তুমি এ বিবাহের ঘটকী। আর একটী কথা শুনেছি—যে নিয়মে জ্যোতিষ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে পরিণয় বন্ধনে বদ্ধ করিতে প্রস্তুত সেই যুক্তিযুক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সুধীর সুরেশচন্দ্র দুইটী পত্নী বিবাহ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন কি ?

কামিনী—(হাসিতে২) কি নিয়মে না ? আমারও সন্তানাদি হয় নাই, আর বয়সে তোর অপেক্ষা বড় বলে ?

এখন রমণীত্রয় কথোপকথন ও মল-ধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছিলেন বাটীর ভিতর হইতে "বিনোদ, সন্ধ্যা হলো—তোরা কি কচ্চিস" এই রব বহির্গত হইল। বিনোদিনী "যাচ্চি" বলে উত্তর দিল। ক্রমে আর হারমো-নিয়মনূপুরলাঞ্ছন মলের সুমধুর ধ্বনি ও কামিনী কণ্ঠ বিনিঃসৃত স্বর শুনিতে পাওয়া গেল না—ক্রমে শৃগালের "হুয়া হুয়া" রবে উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা হৃদয়ে।

যদি আকাশের শোভা দেখিতে চাও, তবে এই শরৎকালে দেখ; যদি চাঁদের শোভা দেখিতে চাও, তবে এই শরৎকালে দেখ; যদি সরোবরের শোভা দেখিতে চাও, তবে এই শরৎকালে দেখ; যদি মাঠের শোভা দেখিতে চাও, তবে এই শরৎকালে দেখ; যদি সকল শোভা একত্রে দেখিতে চাও, তবে শরৎকালে দেখ। আকাশে চাঁদের হাসি, সরোবরে পদ্মের হাসি, অন্তঃপুরে সুন্দরীদিগের হাসি। মাঠে ধান্য—গৃহে অন্নপূর্ণা—শরতে সকলেই সুন্দর, সকলই মনোহর। প্রায় ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে এই মনোহর সময়ে পূজা উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হইলে দেওয়ান গোবিন্দরাম নিয়োগী নৌকারোহণে বাটী আসিতে ছিলেন। হুগলির পশ্চিম রত্নপুর গ্রামে তাহার বসতি, তিনি যশোহরে কর্ম্ম করিতেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এথা সেথা নীল আকাশে এক একটী প্রকাণ্ড জলদস্তূপ কাঞ্চন গিরির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, চতুর্থীর চন্দ্র দেখা দিয়াছে কিন্তু এখনও হাসে নাই এবং পশ্চিম গগণে একটীমাত্র নক্ষত্র উঠিয়াছে, এইরূপ সময়ে মাজিরা ঘুগুড়ির পাড়ি ধরিল। গঙ্গা একটানা এজন্য নৌকাখানি মৃদু গতিতে যাইতে লাগিল, দেওয়ান গোবিন্দরাম তদীয় ভগ্নীপতি হরজীবন কুমার, পাচক ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ রায় এবং শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায় এই চারিজনে নৌকায় বসিয়া তাস খেলিতে ছিলেন। কে জিতিয়াছিল বা কে হারিয়াছিল তাহা আমারা বিশেষ অবগত নহি। সন্ধ্যা হওয়ায় তাঁহারা খেলা বন্ধ করিলেন। নিত্যানন্দ ও শ্রীনিবাস ছপ্পর হইতে বাহিরে আসিয়া, নৌকার ধারে বসিয়া গঙ্গাজলে সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিলেন, হর জীবনও জপে বসিলেন। দেওয়ানজীর জপে তপে বড় আস্থা ছিল না। এখনও তিনি সম্পূর্ণ যুবা পুরুষ, বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি টাকিস্বরে একটী পরিপাটি গান ধরিলেন। গানটী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসুর আগমনী। সে গীতটী এই—

পুরবাসী বলে,—

রাণী, তোমার হারা তারা এল ঐ,
রাণী পাগলিনী প্রায়,
এলো কেশে ধায়,
বলে কৈ মা, আমার উমা কৈ?
উমা দু বাহু পশারি,
মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে, মায়েরে বলে—
কৈ মা মেয়ে বোলে,
আনতে গিয়েছিলে?
হিমালয়, আর কৈলাশ শিখর, নহে
বহুদূর যাতায়াতে—

মনে হলে মা, দিনে শতবার, তত্ত্ব নিতে
পার অনায়াসে।
গেলে না আনিতে,
এলেম্ আপ্‌না হতে,
রব না. যাব মা, দু দিন বৈ ॥

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, গঙ্গার নিভৃত জলময় সুবিশাল বক্ষে কল কল রবে নৌকা চলিতেছে, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, আকাশে চন্দ্রমা হাসিতেছে এবং দেওয়ানজী মধুর স্বরে সেই মধুময় সঙ্গীত মন খুলিয়া গাহিতেছেন—সে সময়ে সকলই মধুর বোধ হইয়াছিল। সে সময়ে দেওয়ানের চিত্ত পটে কতই মধুর ভাবনা, কতই মনোহর ছবি চিত্রিত হইয়াছিল। তিনি যুবা পুরুষ, তাঁহার কল্পনা এখনও খুব প্রবলা—বলবতী কল্পনাবলে তিনি কতই সুখের আশা করিতেছিলেন। মনে মনে কত নন্দন কানন, কত অপ্সরাপুরী, কত কাঞ্চন গিরি গড়িতেছিলেন ও ভাঙ্গিতেছিলেন। হায়! মনুষ্যের সকল আশা কি ফলবতী হয়। যাঁহার একটী আশাও পূর্ণ হইয়াছে তিনি ভাগ্যবান। ক্রমে পাড়ি জমিল—তরণী ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেওয়ানজীর গান থামিল, সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, তিনি জিজ্ঞাসিলেন "মাজি এটা কোন গ্রাম"?

মাজি। হুজুর অ্যাহন্ মোরা বেলুড়ির টেক দে বাইমার লাগ্‌চি।

দেওয়ান। বালির খাল মুখ এখান হইতে কতদূর?

মাজি। "কর্ত্তা। এহান্ হত্তি তিনরশি পথ। হৈ দেহা বাইমার লাগ্‌চে।" এই সময়ে মাজি ঝিঁকা মারিয়া বলিল "জোরারে মোর বাপ্পা আর দুহাত টেনে, আর দুহাত টেনে বা"। একজন দাঁড়ী রুষ্টভাবে বলিয়া উঠিল হঃ ভোলা মাজ্জিগিরী করমার আয়েচেন্, আর মোরা কত জান টান্‌মু। দাঁড় টানি২ পরাণটা খোয়াইমু নাহি—

মাজি। "আরে বাপা রাগ করিস্ কেন্? এ জায়গাটা ডর্ মালুম দেয়। সাধি কি টানে যাতি বল্‌ছি।" এই কথায় হরজীবনের চৈতন্য হইল। তার জপ তপ ঘুরিয়া গেল। একটু কাশ্‌কাশি কাশিয়া বলিলেন হাঁ হে মাঝি একথাটা কেমন হল? এখানে কিছু ভয় আছে নাকি? মাজিকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া গলুইয়ের দাঁড়ী বলিয়া উঠিল—"ডর নাই-কর্ত্তা; মোশাই, হৈ সামনেডার্ যে বাহান-খান্ দ্যেখ্‌চেন্ উহারে পাখীর বাহান কয়, ওহানডা একবার পার হত্তি পাল্লি হয়।"

দেওয়ান। সে-কি-রে! আমাদের যে আজ বালির ঘাটে নৌকা বেঁধে থাক্‌তে হবে।

মাজি। "আরে বাপ্‌রে—হুজুর কন্ কি? এমন কেটা, ঝার্ বাপের মাথাডার পর মাথা, যে এহানে না ভেড়ায়।" অমনি দুই জন দাঁড়ী বলিয়া উঠিল "মোদের হত্তি সে কাজ হবিনি কর্ত্তা। আপনকার লাগি কি মোরা জান্ খোয়াইমু?"

দেওয়ান। আরে বলিস্ কি? আমার যে এখানে ভারি প্রয়োজন রয়েছে। আমাকে এখানে নাম্‌তেই হবে। কুমারজি (কতক বিরক্তভাবে, কতক পরিহাস-চ্ছলে বলিল) 'আরে শ্যালা প্রাণ বড় না স্ত্রী বড়? এখন বাড়ী চল, বাড়ী

গিয়া না হয় লোক পাঠাইয়া গৃহিনীরে লইয়া যাইও। আজ না হয়, সপ্তমীর দিন সে চাঁদ মুখ খানি দেখতে পাইবে। অত উতলা হয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াবে?

দেওয়ান। (কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে) তুমি বল কি হে। আমি যে তাদের পত্র লিখেছি, আজ নাগাদ রাত্রি যেখানে থাকি, আর যত রাত্রি হউক, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। আমি না গিয়ে পৌঁছিলে—(উঁকি মারিয়া) মাজি ওরে ও মাজি, এই না বালির ঘাট? "নৌকা ভিড়াও"। মাজি, বাবুর আজ্ঞামত নৌকা ভিড়াইতে ভিড়াইতে বলিল, "হুজুর মোর্ কথাডা শোন্‌লা না। শেষে টেরটা পাবা।" নৌকা ক্রমে বালির ঘাটে ভিড়িল। দেওয়ান সদর্পে আয় ভীমে বলিয়া নৌকা হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। ভীম সদ্দার আপনার লাঠি ও বাবুর বাক্সটি লইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। অন্যান্য দ্রব্য সকল নৌকাতেই রহিল। দেওানজী তীরে উত্তীর্ণ হইয়া ভগ্নিপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "দেখ কুমারজি তোমাদের এত যদি ভয় হয়ে থাকে, তোমরা আজি শ্রীরামপুরে যাইয়া থাক। কল্য প্রাতেঃ আবার এইখানে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিও।

হর জীবন। আমরা যেন আসিব কিন্তু তোমার দেখা পাব কি?

দেওয়ান। কেন? আমার শশুরবাড়ী ত এখান হতে অধিক দূর নয়। এখানে আমার দেখা না পাও, সেখানে পাইবে।

মাজি। "কর্‌তা মোরা আর দেয়র কর্‌ত্তি পারি না।" এই বলিয়া নৌকা ঠেলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি মধ্য গঙ্গায় গিয়া উপস্থিত হইল ও পূর্ব্বের মত মৃদু মন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। দাঁড়িরা প্রাণ পণে বাহিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাখীরবাগান।

বালির খালের দক্ষিণ ধার ধরিয়া কিয়দ্দূর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে একটী বাগানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়, পূর্ব্বকালে এই স্থানটি ঘোর জঙ্গলময় ছিল, এবং এই স্থানই এক্ষণে পাখীর বাগান বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু কেন যে এই স্থানকে পাখীর বাগান বলে বোধ হয় একালের লোকে অনেকেই তাহা অবগত নহেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন সময়ে "রত্নাপাখী" নামে একজন দুর্দান্ত ডাকাইত ছিল। তাহাকে কেহ কোন প্রকারে গ্রেপ্তার করিতে পারিত না। তাহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, সে সন্ধ্যার সময় তোমার সহিত কথা বার্ত্তা

কহিয়া বিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি করিয়া সেই রাত্রেই পুনরায় আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত। তাহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা থাকায় লোকে তাহাকে "রত্নাপাখী" বলিত এবং সেই জঙ্গলময় স্থানে তাহার আড্ডা ছিল বলিয়া সেই স্থান পাখীর বাগান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পাঁচ ছয় দণ্ড রাত্রি হইয়াছে এমন সময় এক খানি জেলে ডিঙ্গি ঐ জঙ্গলের একধারে আসিয়া লাগিল। একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ সেই নৌকা হইতে নামিয়া নৌকা খানি খাল ধারে তুলিয়া রাখিয়া, বন মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই রাত্রে, সেই জন শূন্য কণ্টকাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল নিবিড় বনের মধ্য দিয়া অকুতোভয়ে যাইতে লাগিল। বিস্তৃত বনের মধ্য প্রদেশে হোগল দলাবৃত এক জলাশয় ছিল। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল গগণস্পর্শী শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বনস্থল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেই সকল শাখা পল্লব ভেদ করিয়া সূর্য্য কিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। বস্তুতঃ স্থানটী এইরূপ ভয়ঙ্কর যে দিনমানেও তথায় যাইতে কেহ সাহস করিত না। এতদ্ব্যতীত জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বে অভেদ্য কেতকী ও বেত্র বনে পরিবৃত। সেই জলাশয়ের মধ্যভাগে নারিকেল পাতাচ্ছাদিত একটী বৃহৎ কাষ্ঠ মঞ্চ। আগন্তুক হামাগুড়ি দিয়া বেত্র ও কেতকী বন পার হইয়া জলাশয়ের জলে নামিল। এবং হস্ত স্থিত সুদীর্ঘ যষ্টির দ্বারা জলের গভীরতা পরীক্ষা করিতে করিতে কিয়দ্দূর গিয়া, জল নিমজ্জিত কি যেন একটী কঠিন পদার্থের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তথা হইতে সেই যষ্টির উপর ভর দিয়া লম্ফ প্রদানে মঞ্চোপরি উত্তীর্ণ হইল। মঞ্চের একপার্শ্বে মিট মিট করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতে ছিল। এবং কৃষ্ণবর্ণ যমদূতের ন্যায় অন্যূন বিংশ বিকটাকার মূর্ত্তি তথায় উপবিষ্ট ছিল। সেই কদাকার ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগণ হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পৃথগাসনে তাকিয়া হেলান দিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক একজন গম্ভীরাকৃতি পুরুষ একটী রূপার গুড়গুড়ীতে তামাক খাইতে ছিল। এই ব্যক্তির নাম রাঘব দাস সেন, জাতিতে কায়স্থ। তৎকালীন হুগলী জেলার মধ্যে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। এক জন দুর্দ্দান্ত জমীদার বলিয়া সকলেই তাহাকে জানিত। তাহার বাটী যেরূপ বৃহৎ, দাস, দাসী, লোক লস্করও তদুপযুক্ত। তাহার বাটীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ, সকল গুলিই অতি সমারোহের সহিত রক্ষিত হইত। যদিও তাহার বয়স হইয়াছিল তথাপি তাহার শরীর দুর্ব্বল হয় নাই তাহাকে দেখিলে যুবা পুরুষ বলিয়া হঠাৎ ভ্রম হইত। সে লাঠি, তলবার ও সড়কি খেলায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিল। এমন কি এ বয়সেও সে একাকী দশজনের মহড়া নিতে পারিত। সে, আগন্তুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল। "রতন খবর কি"?

রতন। প্রকাণ্ড কাৎলা। কমবেশ দশটি হাজার।

রাঘব। (ত্রস্তভাবে নল পরিত্যাগ করিয়া।) অ্যাঁ লোকটা কেরে?

রতন। তা হাতেবহরে খুব—মস্ত বড় লোক।

রাঘব। ব্রাহ্মণ নয় ত?

রতন। আজ্ঞা রতন কি এতই বেতালিম?

মধুযামিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অরুণার মনস্তাপ।

বাক্সের ভিতর কি আছে দেখিবার জন্য অরুণা উঠিয়া আসিলেন, দেখিতে পাইলেন না; যেহেতু হিঙ্গনার পিতা শীঘ্র বাক্সটী আপন সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া চাবি দিলেন। হিঙ্গনার বাক্স সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না, সুতরাং তিনি তাঁহার পিতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। হিঙ্গনার মাতা ও বিমাতারা বুঝিলেন যে বাক্সটী গুপ্তভাবে রাখিবার অবশ্য কিছু কারণ আছে, অতএব তৎক্ষণাৎ কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সময়ান্তরে জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বাহক, হিঙ্গনা ও অরুণার দিকে পুনঃ পুনঃ ও দূরে একএকবার কুমারের দিকে চাহিতে লাগিল, অরুণা তাহা লক্ষ্য করিল।

এদিকে অরুণার মনে কতই কল্পনা আসিতে লাগিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে "ঐ বাক্সটী অবশ্য উদয়গিরি পাঠাইয়া দিয়াছেন; উহাতে অনেক গহনা আছে, ও গহনা সকল অবশ্য রূপার হইবে, কে বলিতে পারে দুই তিন খানি সোনারও থাকিতে পারে, তাহাতে উঃ—কত দাম হবে! হিঙ্গনা এই সকল দেখলে কি কুমারকে বিয়ে কর্‌বে? পোড়ারমুখি! আমি সঙ্গে আছি বলে বাক্সের কথা একবারও বাপ্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে না;—কর্‌বে কেন? মনেত জান্‌ছে আমারই আছে। হয়ত এই গহনা গুলি লয়ে ফাঁকি দিয়ে কুমারকে বিয়ে কর্‌বে; তা করুক্, তাহলে আমিত উদয়কে পাব, সে না হয় আমাকে আবার দেবে; কিন্তু এই যদি তার সব জিনিস হয়, তা হলে উদয় ও আমি দুজনেই ঠক্‌বো। তাই বা কেমন করে হবে? হিঙ্গনা যদি কুমারকে বিয়ে করে, তাহলে উদয়ের মা কি উদয়ের গহনা দিতে দেবে? তা'হলে ওরাই ঠক্‌বে! যদি উদয় এর মধ্যে এসে গহনাগুলি হিঙ্গনাকে দেয়, আর হিঙ্গনা পালিয়ে গিয়ে কুমারকে বিয়ে করে, তাহলে কি হবে? রোসো, এই লোকটা এখনি স্নান করতে যাবে, আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আস্তে আস্তে সব কথা বলে দিব, ও গিয়ে উদয়কে বল্‌বে, আর উদয় এসে সব কেড়ে নেবে!"

অরুণা এইরূপ মনে কর্‌ছিলেন, এমন সময় বাহক নদীজলে স্নান করিবার জন্য উঠিল। অরুণা অল্প বিলম্বে বিদায় লইয়া বাহকের কিছু দূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অবশেষে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"তোমাকে কি উদয়গিরি এখানে পাঠিয়েছেন?"

বাহক। হাঁ

অরুণা। বাক্‌সে কি আছে।

বাহক। কি জিনিস আছে?

অরুণা। কি জিনিস?

বাহক। আমি বাহক বৈদ্য নয়, আমি কেমন করে বল্‌বো?

অরুণা। উদয়গিরি ভাল আছেন?

বাহক। হাঁ, আপনার নাম কি?

অরুণা। অরুণা।

বাহক। কি নাম?

অরুণা পুনর্ব্বার আপনার নাম বলিলেন।

বাহক। তবে আপনার নাম হিঙ্গনা নয়?

অরুণা। না!

বাহক। আমি তাই মনে করেছিলুম।

অরুণা। (ক্ষুব্ধা হইয়া সঔৎসুক্যে) কেন? কিসে?

বাহক। ও লোকটী কে যিনি বসে কাজ কর্‌ছিলেন।

অরুণা। ও লোকটীকে হিঙ্গনা বিয়ে করবে।

বাহক। কি বল্লেন?

অরুণা। ও হিঙ্গনাকে বিয়ে করবে?

বাহক। আপনি তামাসা কর্‌ছেন।

অরুণা। না, সত্যি বল্‌চি, সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করে বল্‌চি; তুমি কিন্তু ওদের কাছে বা কারো কাছে বোলোনা। সাবধান।

বাহক এই কথা শুনিয়া নীরবে স্নান করিতে গেল। অরুণা আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার মনে হর্ষ ভয় বিষাদ তিনই এককালে উদয় হইল। তিনি যে বাহককে মনের কথা বলিতে সুযোগ পাইয়াছেন, এই জন্য বিশেষ সুখী হইলেন, কিন্তু তাহার মনে ভয় হইল যে বাহক এই কথা উদয়গিরিকে বলিলে পাছে তিনি শীঘ্র বাটী আসিয়া বলিয়া দেন যে তিনি হিঙ্গনার সহিত কুমারের বিবাহের কথা বাহককে বলিয়াছেন।

অরুণা অবশেষে ভীতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "উদয় নিশ্চয়ই হিঙ্গনাকে ভাল বাসিবেন? উদয় কেন? বাহক ও এই মাত্র আমাকে মুখের উপর বলিল" "তুমি যে হিঙ্গনা নহ তা আমি মনে করেছিলুম।" হায়! সুন্দরী না হওয়া কি দুঃখ? যত দিন যাচ্চে হিঙ্গনার রূপ উথ্‌লে উঠ্‌চে, আর আমি যতই ভাল দেখাতে চেষ্টা কর্‌ছি, ততই দিন দিন শুখাইয়া যাচ্চি। ও পোড়ারমুখী বেঁচে থাক্‌তে আমার আর নিস্তার নাই। (বিকট হাসিয়া) যদি কোন রকমে ওকে ডাইন বলে ধরিয়ে দি, তা হলেই আমার নিস্তার—হি-হি-হি;—তা হলে ওকে আর কে বিয়ে কর্‌বে, ওর রূপ আর কোথায় থাক্‌বে?—হি-হি-হি-রোসো-যোগাড় দেখ্‌চি, পোড়ারমুখী! পোড়ার মুখী! তখন বল্‌বো বিয়ে করো—হি-হি হি——"

এদিকে বাহক স্নানহেতু চলিয়া গেলে হিঙ্গনা ছল ছল নয়নে কুমারের নিকট আসিয়া বসিলেন। কুমার তাঁহাকে ব্যথিত হৃদয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হিঙ্গনে! সহসা এরূপ ভাবান্তর কেন? হিঙ্গনা মৃদু বচনে কহিলেন" "উদয় আবার কি জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে—"

কুমার। কি জিনিস্?

হিঙ্গনা। তা—আমি জানি না।

কুমার। দেখে এস না।

হিঙ্গনা। কি দরকার?

কুমার। তোমাকে দিয়াছেন, তুমি দেখবে না?

হিঙ্গনা। আমার ইচ্ছা নাই।

কুমার। কেন?

হিঙ্গনা। (ঈষৎ হাসিয়া) বেইমান্! এখন জিজ্ঞাসা কর্‌চো "কেন"?

কুমার। (সহাস্য বদনে) ওতে যদি সোণার গহনা থাকে?

হিঙ্গনা। বেইমান! আবার?

কুমার। তিনি যে তোমায় দিয়াছেন নেবে না?

হিঙ্গনা। না বেইমান্! না নেবো না। শুন্‌লে?

কুমার। আমি তোমাকে কি দিব, আমার কি আছে?

হিঙ্গনা। তুমি রোজ সকালে ফুল তুলে নিয়ে আস্‌বে।

কুমার। (হাসিয়া) আন্‌বো, তারপর?

হিঙ্গনা। আমি যেমন বল্‌বো, তেমনি গহনা তৈয়ার করে দেবে?—

কুমার। আগে শিখান্।—

হিঙ্গনা। কাল সকালে শিখাব।

কুমার। উদয়গিরি বাড়ী আস্‌বেন কবে?

হিঙ্গনা। এখনও ত শুনি নি।

কুমার। তিনি বাড়ী এলে আমার অন্ন যাবে।

হিঙ্গনা। (ছল ছল নয়নে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) কিসে জান্‌লে?

কুমার। এর আর জান্‌তে অধিক বুদ্ধি আবশ্যক করে না।

হিঙ্গনা। তাঁর টাকা আছে বলে, আমার বাপ কি আমাকে বেচবেন?

কুমার। যাতে তুমি সুখে থাক্‌বে, ওরা তাই চেষ্টা কর্‌বেন।

হিঙ্গনা। আমি ত উদয়কে ভাল বাসি না।

কুমার। ক্রমে তিনি যত তোমার প্রতি যত্ন কর্‌বেন, তুমিও তাঁকে সেইরূপ ভাল বাস্‌বে—

হিঙ্গনা। তোমার কথা আমি আর শুনবো না, আমি উঠে যাব—

কুমার। আজ না শুন দু দিন পরে শুন্‌বে, আমি দুঃখী মানুষ, আমার অদৃষ্টমত কাঠ কাটা, কাঠ বহাই সার হ'লো—

হিঙ্গনা। না—হবে—না, আমি মার কাছে যাই।

কুমার। শুন হিঙ্গনা শুন, এখন যেও না!

হিঙ্গনা। কেন?

কুমার। কিছুদিন যা'ক্, একদিন সকালে আমার বাড়ী গিয়ে আমার অবস্থা দেখে এসো। দেখে শুনে যদি মন হয়, তখন মাকে বোলো।

হিঙ্গনা। বাড়ী কেমন? একদিন আমি দেখ্‌বো—

কুমার। দেখ্‌বে বইকি, আরও কিছুদিন যা'ক, এখন তোমার বাপ মা একলা আমার সঙ্গে যেতে দিবেন কেন?

হিঙ্গনা। সকালে যাব।

কুমার। সকালেই যেও। আমি যেমন মানুষ, আমার তেমনি বাড়ী।

হিঙ্গনা। কেমন আমাদের মত?

কুমার। (হাসিয়া) কিছু ভাল।

হিঙ্গনা। তবে কেন গরিব বল্‌চো।

কুমার। তোমার প্রণয়ের কাছে আমি, আমার বাড়ী, আমার সম্পত্তি—সব-সব-ই গরিব।

হিঙ্গনা। কি বল্‌চো।

কুমার। কিছু বিশেষ বলিনি, কাল সকালে আমাকে গহনা গাঁথিতে শিখাবে?

হিঙ্গনা। শিখাব। আমি তোমার বাড়ী যাব। কত দূর?

কুমার। ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে গেলে শীঘ্র যাওয়া যায়, ঘুরে গেলে একদিনের পথ।

হিঙ্গনা। আমি পাহাড়ে উঠ্তে পার্বো। শুনেছি ওদিকে নাকি একটী রাজার বাড়ী আছে। লোকে তাঁকে দস্যুরাজ বলে, রাজা এখন নেই; তাঁর একটী ছেলে আছেন, তাঁর নাম বীরকেশর শুনিছি তিনি বড় বীরপুরুষ। একবার একটীবার একলা ছোরা দিয়ে মেরেছিলেন—সত্তি কি?

কুমার। (হাসিয়া) লোকে বলে—

হিঙ্গনা। আসবার সময় আমাকে রাজার বাড়ী দেখিয়ে আস্‌বে?

কুমার। (পূর্ব্ববৎ হাসিয়া) আস্‌বো। দস্যু রাজার বাড়ীর কাছ দিয়ে আস্‌তে তোমার ভয় হবে না।

হিঙ্গনা। কিসের ভয়?

কুমার। রূপের?

হিঙ্গনা। (হাসিয়া) বেইমান্! তুমি কি আমায় ছেড়ে পালাবে?

কুমার। না।

ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গীতে রমণী-হৃদয়

পুরুষ কর্ত্তৃক কতদূর চিত্রিত হইয়াছে।

বৃকভানু রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা স্বীয় অতুল লাবণ্য-রূপ কুহক বলে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। রাধিকা নব-প্রেমিকা ও নব-যৌবন-মুগ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-সহচর ভাবিতেন; কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠা বিগত-যৌবনা বৃন্দার কি বল কি সম্পত্তি ছিল? থাকিবার মধ্যে এক প্রাণ, আধার ও আধেয় দুই একত্র তিনি দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

"প্রাণ দিয়ে যদি প্রাণ যায়"

তিনি জানিতেন যৌবন মলয়ানিল দুই দিন মাত্র "এল'ত ফুরায়ে গেল"। তিনি জানিতেন প্রেমই জীবনের সুধা, রমণী-জীবনের একমাত্র আশা আকাঙ্খা ও আশ্রয়। তিনি ইহাই ভাবিয়া এক দিন শ্রীকৃষ্ণকে তমাল-বনে একাকী পাইয়া সকাতরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"বঁধু প্রাণ-দিবে কি আমায়?"

বস্তুতঃ এই জীবন-সুধাই রমণী-হৃদয়ের সর্ব্বস্ব। এ হৃদয় পূর্ব্বরাগে, মিলনে, অভিমানে, ঈর্ষ্যায়, ক্ষণ-বিচ্ছেদে, দীর্ঘ-বিচ্ছেদে অপ্রণয়ে, হতাশে, কি মধুর, কি শান্ত, কি

করুণ প্রভৃতি স্বতন্ত্র বা সংযোজন ভাব সকলের পরিচয় দেয়! আর্য্য কবির সময় অবধি এপর্য্যন্ত উহাদিগের মনোহারিত্বের কিছুই বৈলক্ষণ্য কিছুই হ্রাস হয় নাই। অবস্থা সময় ও পাত্র ভেদে উহারা প্রতিদিন নূতন, প্রতিদিন সুন্দর। কবিগণ এই ভাবসকল স্বহৃদয়ে চিত্র করিয়া আপনাদিগকে সার্থক জ্ঞান করেন; সাধারণ-জনগণ কবি-তুলিকা-নিঃসৃত পীযূষ পান করিয়া এই সতত দুঃখময় সংসারের দুঃখ হইতে অবসর পায়েন, ও দিব্য-নয়নে উহাদিগের মনোহারিত্ব দর্শন করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করেন।

সমগ্র রমণী-হৃদয় অদ্যাপি চিত্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। যত দূর হইয়াছে বা যত দূর আমরা পরিচয় পাইয়াছি, তাহাই এক্ষণে রসগ্রাহী সুধীজন সমীপে ক্রমশ নীত হইবে।

পূর্ব্বরাগ।

"সখি! কি হেরেছি স্বপন,
কহিতে বিদরে হিয়ে, বরষে নয়ন।
এমন রূপ মাধুরী, কভু নাহি চক্ষে হেরি,
নির্ম্মল কল্পনা করি, বিধির সৃজন॥
* * * *
করে কর বিন্যাসিয়ে, নানামতে প্রবোধিয়ে,
অতীব কাতর হয়ে, হ'ল অদর্শন।
কে হেন ভালবাসিল, দুঃখ নাশিতে আসিল,
প্রিয় বচনে তুষিল, ভাবিয়ে আপন॥"

পূর্ব্বরাগের করুণাশ্রিত এই একটী পবিত্র চিত্র। প্রণয়ের প্রভাত এখন হয় নাই। অনুরাগ রবি উদিত হইবার এখন বিলম্ব আছে। উষার রমণীয় সৌন্দর্য্য বা দিনমানের প্রোজ্জ্বল আভা ইহাতে কিছুই নাই। দুঃখনিশার অবসান মাত্র হইতেছে—হৃদয়ের সুষুপ্ত ইচ্ছা সকল জাগৃত হইয়া নিঃশব্দ হৃদয়-জগতে এক একবার সুস্বর লহরী বিস্তার করিয়া পুনরায় নিস্তব্ধ হইতেছে।

জাগৃত অবস্থায় নয়নে যে রূপরাশি প্রতিভাত হইয়াছিল;—হৃদয় যে রূপরাশি অতি স্নিগ্ধ ও কমনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, স্বপ্নে উহারই মোহিনী ছবির উদয় হইয়াছে। কল্পনা যাঁহাকে সকল সদ্গুণের আধার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তিনি যে তাঁহার উপস্থিত দুঃখে দুঃখী হইবেন, তাঁহাকে নানামতে সান্ত্বনা করিবেন ও প্রিয় মধুর বচনে তাঁহার সন্তাপিত হৃদয়ে সুবৃষ্টি বর্ষণ করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট।

এতদিন আপনার তাঁবেথেকে আজিও কি রতন শর্ম্মা গো ব্রাহ্মণ চিনে নাই।

রাঘব। তবু লোকটা কেরে?

রতন। খাদ্য খাদক সম্বন্ধ বটে;

রাঘব। আরে লোকটাই কে বল, না?

রতন। দেওয়ান গোবিন্দরাম।

গোবিন্দরামের নাম শুনিয়া রাঘবের বদন কিছু অপ্রসন্ন হইল। তিনি যেন কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

রতন পোড়ারী জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহারই অপর নাম রত্নাপাখী, ইহারই ভয়ে ভাগীরথীর উভয় কুলবাসী লোকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। ইহারই ভয়ে কেহ রাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিত না। ইহার নামে ভয় পাইত না তৎকালে এরূপ লোক অতি অল্প ছিল। এমন কি রতন যেখানে যাইত সেই খানেই তাহার মর্য্যাদা। সকলেই তাহাকে গুরু অপেক্ষা খাতির করিত। অনেক বাটীতে তাহার বার্ষিক বন্দোবস্ত ছিল। রতন বড়ই চতুর, রাঘবের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, সে গোবিন্দরামের নাম শুনিয়া ভয় পাইয়াছে। অমনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল কি সেন মহাশয় আপনি দেওয়ানের নাম শুনে ভয় পেলেন নাকি?

রাঘব। বাপু, ভয় ও নাই, ভরসা ও নাই।

রতন। ভরসা নাই বল্লেন্ কিসে? নিঃভরসা হবার কারণ?

রাঘব। গোবিন্দরামকে চেননা। সে রতন শর্ম্মার উপরে যায়।

রতন। আমার উপরে যায় এমন লোক তো আমি বাঙ্গলায় দেখিনা।

রাঘব। তুমি বাঙ্গালী লুটে খাও, গোবিন্দরাম ইংরেজ লুটে খায়।

রতন। সে ইংরেজের মাথা খায়, আজ আমি তার মাথা খাবো। রতনের কেরামত, হিম্মৎ আর তাকৎ কত, আজ তোমাকে দেখাব। আজ তোমার উপর আমার ঘৃণা জন্মে গেল। এই কায করে বুড়ো হলে, এখন ও তুমি প্রাণের ভয়কর।

রাঘব। দেখ, আমি দ্রোণ আর তুমি অর্জ্জুন, এটি যেন মনে থাকে।

রতন। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও ভীত হইয়া) আজ্ঞা, আপনি আপনি কি রাগ করলেন?

রাঘব। রাগ করিনি, তবে কি জান এরূপ দুঃসাহসী কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল নয়। আপনার ভুজবলের অতিরিক্ত কার্য্য করিতে গেলে, একদিন না একদিন ঠেকৃতে হবে।

রতন। আপনি সে ভয় করবেন না, দেওয়ান গোবিন্দরাম নৌকা হতে বালির ঘাটে নেমেছে, একজন মাত্র পাইক সঙ্গে লয়ে খুস্কি পথে যাচ্চে। আমার সঙ্গে কেবল ঝোড়ো, মাধা আর কালাকে দিন্ আমি এখনি কাজ হাসিল করে আস্‌ছি, বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেওয়ানের সঙ্গেই আছে, নৌকায় কেবল কতকগুলা বাসন ও কাপড় আছে বৈত নয়। জনকতক গোলা লোকে অনায়াসে সে কাজ সাবাড় করে আসতে পারবে।

রাঘবসেন দেওয়ান গোবিন্দরামকে বেস জানিত। তিনি কিরূপ পরাক্রান্ত ও সম্ভ্রান্তলোক তাহাও বিশিষ্টরূপ অবগত ছিল। কিন্তু দেওয়ান একজন মাত্র লোক সমভিব্যাহারে বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া জনহীন প্রান্তর মধ্য দিয়া, গমন করিতেছেন শুনিয়া, তাহার অর্থলালসা বলবতী হইল, তাহার সাহস বাড়িল। আর ইতঃস্ততঃ না করিয়া, রত্নাপাখী যেরূপ বলিল তাহাই করিতে হুকুম দিল। তৎক্ষণাৎ দুইখানি সড়পি প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া গেল এবং রতন উপরোক্ত তিন জনকে

সঙ্গে লইয়া দেওয়ানের অনুসরণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরে।

দেওয়ান গোবিন্দরাম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাঁহার দেহের গঠন ও মুখকান্তি মনোহর, বিশেষতঃ তাঁহার দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট আয়ত চঞ্চল চক্ষুদুটী বড়ই সুন্দর। তাঁহার পায়ে দিল্লীর নাগোরা জুতা, গায়ে নিমুর মেরজাই, মাথায় এক খানি উড়ানী বাঁধা, ও হাতে এক গাছি বাঁশের লাঠি ছিল। তিনি ঢাকাই ধুতি মালকোঁচা করিয়া পরিয়া দৃঢ় পদবিক্ষেপে গমন করিতেছিলেন, বস্তুতঃ ভয় কাহাকে বলে গোবিন্দরাম জানিতেন না। তিনি কোন বিপদকে বিপদ বলিয়াই গণ্য করিতেন না। কোন ঘটনাই তাঁহার মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারিত না। তিনি কি সম্পদে কি বিপদে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীমাকৃতি ভীমসর্দ্দার একটী বাক্স বস্ত্রদ্বারা আপন পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া সুবিশাল বক্ষে এক সুদীর্ঘ যষ্টি ন্যস্ত করিয়া মত্ত হস্তির মত কালিপুরাভিমুখে গমন করিতেছিল। কালিপুরে দেওয়ানের শ্বশুরালয়। বালি হইতে কালিপুরে যাইতে হইলে প্রান্তর পথ দিয়া যাইতে হয়। দেওয়ান ও ভীমসর্দ্দার ক্রমে ক্রমে গ্রাম পার হইয়া মাঠে আসিয়া পড়িলেন। মাঠে আসিয়া গোবিন্দরামের বড়ই আনন্দ হইল, অযুত নক্ষত্র খচিত অনন্ত নীলাকাশ-কৌমুদীরঞ্জিত, সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, অস্তগমনোন্মুখ নেত্র-রঞ্জন চন্দ্রকলা এবং অনিরুদ্ধ সুগন্ধ পবনহিল্লোলে তাঁহার চিত্ত প্রফুল্লতার সহায়তা করিতে লাগিল। তিনি একটী গান ধরিলেন, গানটি এই—

ভুলিতে বল, বল কেমনে ভুলিব তায়।
যৌবনের ভাল বাসা, জীবনে কি ভুলা যায়॥
যুগযুগান্তর গেল,
সে অনল না নিবিল,
সে দারুণ হৃদিজ্বালা, শুধু বুঝিমনে যায়॥

গোবিন্দরাম প্রথম যৌবনে কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি এই গীতটী বড়ই ভাবাবেশে গান করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরস্থ ভাবের সহিত গাইয়াছিলেন বলিয়া গানটী শুনিতে যার পর নাই মধুর বোধ হইয়াছিল। তিনি গান করিতে করিতে যতদূর গিয়াছিলেন তত দূর যেন সুধা বর্ষণ করিয়া গিয়াছিলেন, সে স্বরলহরীতে শ্রোতার পার্থিব শোক সন্তাপ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল, সে মধুর সঙ্গীতে মোহিত হইয়া সুকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ তাঁহার গানের সহিত যোগ দান করিয়াছিল এবং সকল স্বর-নিদান পবনদেব সে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বংশী বাদন করিয়াছিলেন। এপ্রকার অমিয় হিল্লোলে কাহার চিত্ত স্থির থাকে? কাহার মন আনন্দে উছলিয়া না উঠে?

ভীমসর্দ্দার সেই অপূর্ব্ব গান শুনিতে শুনিতে মহানন্দে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। সে কোন বিপদেরই আশঙ্কা করে নাই, পার্থিব কোন চিন্তাই সে সময়ে তাহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; তখন সে মর্ত্তে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু জগতে সুখ দুঃখ

কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সাঁ করিয়া তাহার পায়ের কাছ দিয়া তড়িৎবেগে কি যেন একটা চলিয়া গেল। সে ইশ্ করিয়া এক লম্ফে দেওয়ানের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল।

দেওয়ান। কিরে ভীম কি হয়েছে?

ভীম। আজ্ঞা বড় সাম্‌লেছি। আর একটু হলে পা টী গিয়েছিল।

দেওয়ান। কেন বল দেখি?

ভীম। শুন্‌তে পাননি ঐ যে বন্ বন্ কোরে একটা পাফ্‌ড়াআমার পায়ের নীচে দে বেরিয়ে গেল। যাহোক মশাই গতিক বড় ভাল নয়,ডাকাইতরা আমাদের পিছু লয়েছে।

দেওয়ান। তোর ভয় হয়েছে নাকি? এই কথায় ভীমের কিছু লজ্জা বোধ হইল, সে ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, ওরে শ্যালারা—যদি বাপের বেটা হোস্ সামনে আয়। ডাকাইতের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে তারা র‍্যারা র‍্যারা করিয়া ভয়ঙ্কর-নাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দরাম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, দেখ ভীমে আমি যদি ঘাইল হই তা হলে তুই আর এক দণ্ড বিলম্ব না করে উর্দ্ধশ্বাসে পালাবি আর বাক্সটী আমার পরিবারকে দিবি, দেখিস্ যেন নিমকহারামী করিস্ না। আর বাক্সের মধ্য হতে বিশখান মোহর তুই নিস্ তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে যমদূতের ন্যায় দুই জন দীর্ঘাকার পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের এক জনের হস্তে [illegible] লাঠী ও অপরের হস্তে তরবারী।

দেওয়ান। কে তোরা? কি চাস্?

রতন। ঐ বাক্সটী চাই।

দেওয়ান। ছেলের হাতের পিঠে নাকি?

রতন। মরবার এত সাধ কেন?

(দেওয়ানকে যষ্টি প্রহার করিবার উপক্রম করিল।)

দেওয়ান এক লম্ফপ্রদানে অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা অপর দস্যুর দক্ষিণ হস্তে এরূপ প্রহার করিলেন,যে তাহার হস্ত হইতে তরবারি বেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। রত্নাপাখী পুনর্ব্বার দেওয়ানকে আক্রমণ করিল। দুইজনে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ইত্যবসরে ভীমসর্দ্দার ভূমি হইতে করবাল খানি আত্মসাৎ করিয়া বেগে রত্নার প্রতি ধাবমান হইল। দেওয়ানের সজোর আঘাতে মাধার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে বাম হস্তে লাঠি ধরিল। ইতি মধ্যে আর দুইজন ডাকাইত আসিয়া জুটিল। ডাকাইতেরা এখন চারিজন হইল দেওয়ান ও ভীমসর্দ্দার তাহাতেও ভীত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রমের সহিত লাঠি চালাইতে লাগিল। তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কেহই হটে না কেহই কাহাকে কাবু করিতে পারে না। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর মাধা ডাকাইত দেওয়ান কর্ত্তৃক আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল পরক্ষণেই রত্নাপাখীর নিদারুণ প্রহারে বাত্যাহত তরুর ন্যায় দেওয়ানও ভূপতিত হইলেন। ভীমসর্দ্দার অবসর পাইয়া প্রভুর পূর্ব্বাদেশানুসারে বায়ুবেগে পলায়ন করিল।

রত্নাপাখী, ভীমসর্দ্দার পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া বলিল, "কালা তুই কাৎলা ছুটো সাবাড় কর, মাল ঐ ব্যাটার কাছে, আমরা ঐ ব্যাটাকে ধরিগে।" এই বলিয়া ঝোড়োকে সঙ্গে লইয়া রত্না ভীমসর্দ্দারের অনুধাবন করিল।

চন্দ্রমা অস্তগমন করিয়াছে। আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন। একটীও নক্ষত্র আর দেখা যাইতেছে না। চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, এক এক বার বিদ্যুৎ হানিতেছে। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে। অতি নিকটের বস্তুও নয়নগোচর হয় না। এবম্প্রকার ভয়ঙ্করী শর্ব্বরী সময়ে দস্যুপতি রতন পোড়ারীর অনুচর, মাধা মৃতবৎ, প্রান্তর মধ্যে পড়িয়া আছে। রক্তে চতুস্পার্শ্ব প্লাবিত হইতেছে। নিঃশব্দে একটা শৃগাল আসিয়া তাহার মুখাঘ্রাণ করিতে লাগিল, সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হায়! অবস্থার কি বিপর্য্যয়। যে ব্যক্তি একদিন শত শত অসহায় পথিকের প্রাণনাশ করিয়াছে আজ তাহার প্রাণ সংশয়, যে ব্যক্তি অসঙ্খ্য লোকের মস্তক রক্তে প্লাবিত করিয়াছে আজ তাহার রক্তে বসুধা রঞ্জিত হইতেছে। যাহার ভয়ে দেশ দেশান্তরের লোক কম্পিত হইত, আজ সে এক শৃগাল দেখিয়া ভয় পাইতেছে।

কালা কাৎলা চালানের ভার লইয়া, একটা ভগ্ন সেতুর ধাপে বসিয়া কটিদেশ হইতে কলিকা ও তামাকু বাহির করিয়া গাঁজা খাইবার আয়োজন করিতে ছিল, সে মাধার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইল এবং বলিল মাধা তুই বেঁচে আছিস? তামাক খাবি? মাধা অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল "বড় যাতনা—ঐ শিয়ালটাকে তাড়িয়ে দে—"

কালা। শিয়াল পালিয়েছে। গাঁজা খাবি?

মাধা। আমার কি আর উঠবার ক্ষমতা আছে-উঃ—বড় যাতনা। ভাই আমার মাথাটা বেঁধে-দে—আঃ—

কালা। আচ্ছা ঐ দেওয়ান শ্যালার কাপড় খানা খুলে আনি। কালা উঠিয়া দেওয়ানজির শব খুজিতে গেল কিন্তু দেওয়ানের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া বলিল, আরে মোলো শ্যালাকে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেল নাকি। পুনরায় মাধার নিকটে আসিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া, নালার জলে ভিজাইয়া তাহার মাথায় বাঁধিয়া দিল এবং কোমর হইতে আপনার গামছা খুলিয়া মুটী করিয়া তাহার উপাধান করিয়া দিল। মাধা একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "শ্যালা দেওয়ান মরেছে"?

কালা। আরে মোলো শ্যালাকে কোথা টেনে নিয়ে গেল—এই কথা বলিয়া সে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাস্তার ধারে, ঝোপে ঝাঁপে, ধানবনে, নানা স্থানে অন্বেষণ করিল কিন্তু কোন খানেও তাঁহার কোন চিহ্ন পাইল না; হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মাধার কাছে বসিল। দেখিল মাধা ঘুমাইতেছে গড়গড় করিয়া তাহার নাক ডাকিতেছে। সেও ক্লান্ত হইয়াছিল, শয়ন করিবার উপক্রম করিল এমন সময়ে কোথা হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ভূমিতে চিৎ করিয়া ফেলিল ও তাহার বুকে জানু পাতিয়া বসিয়া গলা চাপিয়া ধরিল ও বলিল দুরাত্মা এখন কি হয়? কালার আর নড়িবার শক্তি নাই, সে বলিল "হুজুর আমি আপনার

গোলাম, আমায় প্রাণে মারিবেন না, আজ অবধি আমি আপনার দাস হলেম "আপনি যখন যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" আক্রমণকারি বলিল "তুই ডাকাইত তোর কথায় বিশ্বাস কি?"

কালা। হুজুর বিশ্বাস করুন আমি কখন নিমক্‌হারামি কোরবো না। সে ব্যক্তি কালাকে ছাড়িয়া দিল ও বলিল আমি তোকে ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু তোর প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌। আমি যাহা বলি শোন্‌।

কালা। উঠিয়া যোড় হস্তে বলিল কি আজ্ঞা হয় হুজুর, অনুমতি করুন। সে ব্যক্তি বলিল এই আহত লোকটাকে কাঁধে করে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়। ঐ যে জলার মাঝে আলো দেখা যাচ্চে, ঐ খানে চল। এই মৃতবৎ ব্যক্তির শুশ্রূষা আবশ্যক। আদেশমত কালা মাধাকে স্কন্ধে করিল ও সেই দীপশিখা লক্ষ্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ক্রমশঃ—

মহাত্মার মৃত্যু।

১

হায়! হায়! একি দায় বুঝে না মানব,
সংসারের বিভীষিকা ভীষণ কেমন,
আজিকে যে ফুল ফুটে, কালি তাহা যায় টুটে,
সোনার প্রতিমা খানি ভস্মেতে লেপন,
তবুও মানবকুল মোহেতে মগন।

২

এই যে নেহারি নভে, মুদিনু নয়ন,
নিরমল শশধর রজনী রঞ্জন,
কত তারা নীল নভে, মদন মোহন ভাবে,
ব্রজবধু হৃদে যথা, গোপবধুগণ,
প্রাতে উঠে দেখি হায়! সুধুই গগন।

৩

এক বৃন্তে দুটী ফুল, মরি কি সুন্দর,
প্রেমের সোহাগে নাচে কতই যতন,
কত ভাল বাসাবাসি, ভুলায় জগত বাসী,
বহিল প্রবল বাত্যা গেল ফুল ধন,
এবে হায়! চিতাধূম ছাইল গগন।

৪

আজি দেখি পুত্র কোলে পুত্র সোহাগিনী
শতেক চুম্বন করে সংসারের সার,
কালি কাঁদে পথে পথে, জলন্ত অশনি মাথে,
হায় পুত্র! কোথা গেলি প্রাণের আধার,
ধুলায় ধূসর অঙ্গ হৃদি ছার খার।

৫

মোহ মদে মত্ত সবে নাহি কোন জ্ঞান
নিয়তির কালচক্র ভীষণ দর্শন,
জীবকুল শির পরে, নিয়ত অযুত ঘোরে,
কিবে ইন্দ্রজাল হায়, বুঝিব কেমন
হায়রে বুঝে না নর মোহের ছলন।

৬

মায়ার মোহিনী সখি অবিদ্যা সুন্দরী
বাজায় মোহন-বেণু পাতি মোহ জাল,
যথা রে গহন বনে, বধিতে হরিণীগণে,
বীণা ধ্বনি কিরাতিনী ডাকি আনে কাল,
সাদরে চুম্বন নর করে কাল ব্যাল।

৭

যে কাণ্ডারি কত তরি বাঁচাত তরঙ্গে
যুবতী, জননী, কন্যা পাইল জীবন,
এবে দেখি নিজ তরি, কালের তরঙ্গে পড়ি,
ভীম প্রভঞ্জন ভরে হইল মগন।
অসার সংসার হায় কোথা ধন জন।

৮

হায় রে মানবকুল সাহসে দুর্জ্জয়
সাজায় সংসার খানি রতন কানন,
পরে রে লইয়া মাথে, ভ্রময়ে প্রমাদ পথে,
পরের কারণে করে আত্মার নিধন,
মৃণাল ভাবিয়া গলে ভুজঙ্গ ধারণ।

৯

আজীবন প্রাণপণে সংসার কাননে,
মণি মুক্তা মরকত কামিনী কাঞ্চন,
করিল হে স্তূপাকার, এবে কার অধিকার,
আর তোমা নাহি জানে জায়া পুত্রগণ!
জীর্ণ বস্ত্র রজ্জু হায়, তোমার ভূষণ!!

১০

একি ভ্রম! একি ভ্রম! হায়রে মানব!
জীবের চরম গতি কেমন ভীষণ
দেখিতেছ নিতি নিতি, তথাপি সংসারে প্রীতি
জাননাকি মায়াজাল নিয়তি সৃজন
দূর্ব্বাদলে ঢাকা হায়! গহ্বর ভীষণ।

১১

মৃণাল কোমল কিন্তু ভীষণ কণ্টক
ফণি শিরে মণি কিন্তু উগারে গরল,
রত্নাকরে রত্ন মানি, কিন্তু তাহে প্রাণ হানি,
সংসারেতে সুখ কিন্তু অন্তে হলাহল!
ভ্রমর কভু কি চায় চম্পক কোমল?

১২

কূপগত চন্দ্র বিম্বে ভেকের ক্রন্দন,
যমুনায় হেরি কিম্বা রাধা বিনোদিনী,
তেমতি মানব কুল, আত্ম-জ্ঞানে সমাকুল
ক্ষণিক সংসার রতি, মায়া কুহকিনী
ইন্দ্রিয়-জনিত সুখ আশার অবনী।

১৩

যাও হে মহাত্মা তুমি যাও স্বর্গ ধামে,
পরহিতে করিয়াছ প্রাণ বিসর্জ্জন,
না খাইয়ে অন্ন জল, ভ্রমিয়াছ কত স্থল,
পূর্ণ করি ধনাগার মুদিলে নয়ন
এবে হায়! তব তরে শ্মশান শয়ন!

১৪

যাও হে মহাত্মা তুমি যাও সুরপুরে,
তব তরে দেখ ঐ সুরাঙ্গনাগণ,
পুষ্পক বিমান চড়ি, নাচিছে সুরভি ভরি
নন্দন কুসুম মালা ঘন বিমোহন,
ছায়াপথে রুণু রুণু নূপুর গুঞ্জন

১৫

যাও তুমি নরবর বৈজয়ন্ত ধামে,
পুলোমা নন্দিনী শচি রমণী রতন,
দেখ স্বর্গ দ্বার খুলি, অপরূপ বাহু তুলি
অমৃত বর্ষণ করে রুচির বসন,
কাম-বধূ সেবে সদা যুগল চরণ।

১৬

অপ্সর নর্ত্তন, গায় কিন্নর মিথুন,
মৃত-সঞ্জীবনী তান সুর বেণু বীণ,
সঙ্গীত সুরভি ভার, ভুবন রতন সার,
যাও হে মহাত্মা তুমি অমর ভুবন,
এ দগ্ধ সংসারে করো অমৃত বর্ষণ।

সোঽহং।

আমি কি? কেবল আমি "আমি" না আর কিছু 'আমি' আছে। শোনা যায় সকলেই আপনাকে 'আমি' বলে। নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কীটাণু সকলেই আপনাকে 'আমি' বলে বা ভাবে। তবে কেবল আমি 'আমি' কি প্রকারে? সকল বস্তুই যখন 'আমি' তখন আমি সঙ্কীর্ণ কি প্রকারে? আচ্ছা 'আমি' কি কেবল এক্ষণে বর্ত্তমান না চিরকালে 'আমি' আছে? আমার পিতা, পিতামহ হইতে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বরাবরই যখন 'আমি' ছিল ও আমার পুত্র পৌত্রাদি হইতে পরবর্ত্তী অনন্তকাল পর্য্যন্ত যখন 'আমি' থাকিবে, তখন 'আমি' জন্মাইবা 'আমি' মরি এ কথা কি প্রকারে বলি? আমি মরি না—আমি জন্মি না—ও আমি সঙ্কীর্ণ নহি—তবে 'আমি' সামান্য জিনিষ কি প্রকারে? তবে এক কথা এই যে সমস্ত প্রাণীই আমি হইতে পারে, অথবা বড় জোর উদ্ভিদ্‌গণও নয় 'আমি' হইল, কিন্তু জড় পদার্থ মধ্যে 'আমি কোথায়? তাহা যদি না হইল তবে 'আমি'র সর্ব্বময়ত্ব হইল কৈ? জড় পদার্থের 'আমি' জ্ঞান না থাকিতে পারে কিন্তু তাহায় 'আমি' বাচ্য নহে তাহা কি প্রকারে বলিব? কেননা 'আমি' বলে কারে? তুমিত স্বীকার করিলে, যে, সকল জীবই 'আমি' তবে আমিও তুমিও 'আমি' তিনিও 'আমি' কীটও 'আমি' পতঙ্গও 'আমি' তবে আমার 'আমি'র সুখ দুঃখে তোমার 'আমি'র সুখ দুঃখ হয় না কেন? অবশ্য হয়। তুমি তাহা বুঝিতে পার না। তাহা বুঝিতে পার নাই বলিয়া তুমি 'আমি'র এত সঙ্কীর্ণতা করিয়াছ এবং জড় পদার্থের 'আমি'ত্ব বুঝিতে পার নাই। বুঝিতে না পারিয়াই আমরা 'আমি'তে সীমাবদ্ধ করিয়াছি? কিন্তু বল দেখি 'আমি'র সীমা কি? হস্ত আমি, না পদ আমি, রক্ত আমি, না হৃদয় আমি, মন আমি না আত্মা আমি অবশ্য বলিবে ইহার কিছুই 'আমি' নহে। কেহ কেহ আত্মাকে 'আমি' বলিতে পারেন কিন্তু আত্মা যদি আমি হইল, তবে 'আমি' জন্মি কৈ বা 'আমি' মরি কৈ? ঐ আত্মাত ঈশ্বরের অঙ্গ, তবে আর 'আমি'র সঙ্কীর্ণতা কোথায়। তখন সকল আমিই ঈশ্বর হইল, সুতরাং আমাদের সকলকেই 'সোঽহং' বলিতে হইল। কিন্তু সকলে আত্মাকে 'আমি' বলেন না। তাঁহারা বলেন শরীরস্থ সকল পদার্থের সম্মিলনে 'আমি'। কিসের সম্মিলনে আমি? হস্ত পদাদি, অঙ্গ, রক্ত রসাদি ধাতু, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মেধা ধারণাদিবৃত্তি, মন ও আত্মা সর্ব্ব সমষ্টি 'আমি'। তাহা যদি হইল তবে ধান্য, মৃত্তিকা, বায়ু জলাদি জড় পদার্থ 'আমি' নয় কি প্রকারে? ঐ সকল

পদার্থ হইতে যখন রক্ত রস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি শরীর পদার্থ সকল উৎপন্ন হইতেছে' এবং রক্ত রসাদি, যখন আমি বাচ্য তখন ধান্যাদি কেন 'আমি' নহে? ঐ সকল পদার্থ নিয়তই 'আমি' সংলগ্ন রহিয়াছে। যদি স্থূল বলিলে বুঝিতে না পার, তবে বলিয়া দিতেছি ঐ সকল পদার্থ হয় আমার 'আমিতে' নয় তোমার 'আমিতে", হয় মানব 'আমি'তে নয় কীট 'আমি'তে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ যে পদার্থ আজ 'আমি' সে পদার্থ কল্য 'আমি' নয় কেন? ধান্য মাঠে ছিল, তখন উহা 'আমি' নয়, যখন রক্ত অস্থি আদি হইল, তখন 'আমি' হইল, আবার যখন উহা শরীর হইতে কোনরূপে বহির্গত হইল তখন 'আমি' থাকিল না এ কথার অর্থ কি? সুতরাং আমরা বলিব ধান্য সকল সময়ে 'আমি'। সকল জড় পদার্থ 'আমি'। 'আমি' সর্ব্বত্র বিরাজিত, এবং 'আমি' সর্ব্বকালে বিরাজিত।

একটী কথা—অর্থাৎ আমি 'আমি' না আমার 'আমি'। কৈ না আমরা দেখিলাম যে, যেসকল পদার্থসমষ্টি আমি বাচ্য তাহার একটীও আমি নহে, বস্তুতঃ সকলগুলিই আমার। আমার হাত, আমার পা, আমার রক্ত, আমার হৃদয়, আমার মন আমার আত্মা, আমার সর্ব্বস্ব। যাহা যাহা লইয়া 'আমি' তৎসমস্তই আমার। তবে 'আমি' কি? আত্মা যদি 'আমি হয় তবে আমার আত্মা ইহার অর্থ কি? ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে না যে আত্মাতিরিক্ত 'আমি' আছে। আর একটী মজার কথা—আমার যাহা, তাহার সমষ্টি যদি 'আমি' হয়, তবে আমার স্ত্রী আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা আমার বন্ধু, আমার স্বদেশীয়, আমার স্বজাতি, আমার পক্ষী, আমার জল ইহাদের সমষ্টি 'আমি' হইবে না কেন? বাস্তবিক এইসকলের সমষ্টিও যে 'আমি' তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা কিছু বুঝিয়াছেন তাঁহারা এই 'আমিকে' বড় 'আমি' (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) আর পূর্ব্বোক্ত রক্তমাংসাদির সমষ্টিকে "ছোট আমি" (জীবাত্মা বা প্রাণী) বলেন, এবং আত্মতত্ত্বকে সকল তত্ত্বের সার বলেন। ঐ বড় আমি ও ছোট আমি যে এক তাহাই জানাইবার জন্য 'সোঽহং' পদের ব্যবহার করেন। বাস্তবিক যখন দেখাগেল আমি অনাদি অনন্ত সর্ব্বময় বিরাট মূর্ত্তি তখন 'সোঽহং' তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব তাই বড় আমি ও ছোট আমি ভেদ জ্ঞান করিওনা। 'তোমার'আমি'তে আর আমার আমিতে ভিন্ন ভাবিও না। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ" সোঽহং জ্ঞানের বাক্য যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিও। নচেৎ যদি তোমার আমিতে ও আমার আমিতে ভিন্ন জ্ঞান কর, যদি বড় আমি ও ছোট আমির ভিন্ন ভাব দর্শন কর, তাহা হইলে তুমি অনন্ত দুঃখ ও মরণ যন্ত্রনা ভোগ করিবে। (মানবতত্ত্বের স্তোত্র পাঠ কর)

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম প্রণালীর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য একটী প্রধান বিষয়। তাঁহাদের মতে খাদ্য দ্রব্যে কেবল মাত্র শরীর পোষণ করে এমত নহে; মনুষ্যের নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অখিল চরিত্র উহার উপর নির্ভর করে। মনুষ্য খাদ্য সংস্কার-পূত হওয়া আবশ্যক; নতুবা জাতিচ্যুত হইতে হয়। খাদ্য কি প্রকার হওয়া আবশ্যক, উহা কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং কি প্রকার লোকের সংসর্গে ভোজন করিতে হইবে এই সকল বিষয়ের বহুল নিয়ম লিখিত হইয়াছে; ঐ সকল নিয়ম পরিপালনের উপর জাতিরক্ষণ নির্ভর করে। এতৎ সম্বন্ধে মনুর প্রধান উপদেশ এই;—

মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ দ্বিজের পক্ষে সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। মদ্যপান পঞ্চ মহাপাপের মধ্যে গণ্য। (পঞ্চ মহাপাপের অপর ৪টী এই;—(১) ব্রহ্ম হত্যা, (২) ব্রাহ্মণস্বাপহরণ, (৩) ধর্ম্ম শিক্ষকের পত্নী অপহরণ, (৪) উল্লিখিত অপরাধ ত্রয়ে অপরাধী ব্যক্তির সংসর্গ) পেঁয়াজ রশুন প্রভৃতি অপর অনেক প্রকার খাদ্য নিষিদ্ধ কিন্তু কোন কোন সমারোহক্ষেত্রে মনুতে মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পানের অনুমতি আছে, (৫ম, ৫৬) এবং কোন কোন শ্রাদ্ধে মাংস ভক্ষণের আদেশ আছে (৩য়, ১২, ৩; ৪র্থ, ১৩১)।

যে ব্রাহ্মণ যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থাশ্রম অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে সমুদায় সাংসারিক বিষয়ের সংসর্গ পরিত্যাগ বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য।

গুরুজনের মৃত্যু হইলে, অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা হিন্দুদিগের পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অমঙ্গল, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া মঙ্গল; যখন কোন মনুষ্যের মৃত্যু হয় তখন তাঁহার স্থূল শরীর দগ্ধ করা হয়। বস্তুতঃ ইহাই অন্ত্যেষ্টি কিন্তু তাঁহার আত্মা অপর কোন প্রকার শরীর মধ্যস্থ না হইয়া এই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই শরীরকে লিঙ্গ শরীর বলে; কখন কখন ইহাকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র বলা হয়। এই শরীরে পরিবৃত হইয়া মৃত ব্যক্তি শ্মশান ভূমির নিকট ঘুরিতে থাকে। আত্মা যখন এই সূক্ষ্ম শরীরে আবৃত হইয়া থাকে তখন তাহাকে প্রেত বলে। প্রেতলোকের আনন্দানুভব কি কষ্ট সহ্য করিবার প্রকৃত শরীর নাই, সুতরাং তাহার অবস্থা অস্থির অসচ্ছন্দ ও শোচনীয়। তিনি এই অবস্থায় অপবিত্র বলিয়া গণ্য; এবং যে সকল আত্মীয়েরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন, আদ্য শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহিত হওয়ার কাল পর্য্যন্ত তাঁহারাও অশৌচ। অধিকন্তু, যদি কোন ব্যক্তি, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অধিকারী ব্যক্তি

দিগের নিকটে প্রাণত্যাগ না করেন; ও তাঁহারা যদি তাঁহার মৃত্যুর বিষয় অবগত না থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যদি অসম্পাদিত থাকে; তবে তিনি পিশাচরূপ পরিগ্রহ করিয়া নিজ যন্ত্রনার প্রতিশোধের নিমিত্ত বহুলপ্রকারে যাবতীয় জীবকে কষ্ট দিতে থাকেন। অতএব পূত জলের তর্পণদ্বারা প্রেতব্যক্তিকে শান্তি প্রদান করাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা প্রেত ব্যক্তি স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের মধ্যবর্ত্তী এক শরীর প্রাপ্ত হয়েন। ঐ শরীর সুখ দুঃখানুভব সমর্থ। ঐ শরীরের সাহায্যে প্রেত ব্যক্তি ভাবী এক স্থূল শরীরে নীত হয়েন বলিয়া উহাকে কারণ শরীর বলে। প্রেত লোক কেবল এই প্রকারে গতি প্রাপ্ত হয়েন। কিছুকাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করার পর অন্যান্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করার নাম গতি।

নিম্নে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। মৃত্যুর পর প্রথম দিনের পিণ্ডে* প্রেত ব্যক্তির শরীরে মূল গঠিত হয়। এই প্রকারে ক্রমশঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হইয়া সর্ব্বশেষের দিনের পিণ্ডে মস্তক গঠিত হয়। প্রেত ব্যক্তি এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইবার মাত্র প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তখন তাঁহাকে অপবিত্র জ্ঞান না করিয়া দেবতুল্য বিবেচনা করা হয়। বস্তুতঃ তিনি শ্রাদ্ধ কালে দেবতার ন্যায় পূজিত হয়েন। এই হেতু শ্রাদ্ধ ক্রিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নহে, উহা পিতৃ যজ্ঞ মাত্র। কিন্তু এই পিতৃ পূজা প্রকৃত দেবপূজা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। কুশজলাদি সম্বলিত পিণ্ড প্রদান দ্বারা ও সাম বেদ হইতে মন্ত্রোচ্চারিত হইয়া ইচ্ছা সম্পাদিত হয়। উক্ত কার্য্য সমূহ কোন দেবালয়ে সম্পাদিত হয় না। কোন নদীতীরে বা গৃহের কোন পবিত্র স্থানে সম্পাদিত হয়। পিতৃলোকের স্বর্গাভিমুখিন গতির পরিবর্দ্ধনার্থ মধ্যে মধ্যে নিয়মিত সময়ে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করার ফল এই যে প্রেত লোক যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, এই শ্রাদ্ধদ্বারা তাঁহারা একেবারে বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মা বিষ্ণু সদনে নীত হয়েন।

নিম্নে যে সকল মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা লিখিত হইল, ১ম পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ; ২। মাতা, মাতামহ, প্রমাতামহ। (৩) বিমাতা ৪র্থ পিতামহী, পিতৃমাতামহী, পিতৃপ্রমাতামহী ৫। পিতৃব্য ৬। মাতুল ৭। পিতৃস্বসা ৮। মাতৃস্বসা ৯। ভ্রাতা ও, ভগিনী ১০। শ্বশুর (কখন কখন গুরুও এই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হয়েন)।

শ্রাদ্ধ নানা প্রকার এবং নানা সময়ে সম্পাদিত হয় যথা নিত্য, পার্ব্বণ, একোদ্দিষ্ট (ইহা বিশেষ ক্ষেত্রে ও কোন বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশে সম্পদিত হয়)। এতদ্ভিন্ন আর ও অনেক প্রাকার শ্রাদ্ধ আছে, যথা;—হস্ত শ্রাদ্ধ, হিরণ্য শ্রাদ্ধ, অমান্ন শ্রাদ্ধ, নান্দী শ্রাদ্ধ। শেষোক্ত শ্রাদ্ধটী বিবাহ, উপনয়নাদি মঙ্গল কার্য্যের পূর্ব্বে পিতৃলোকের সংপূজনার্থ নির্ব্বাহিত হয়।

শ্রীরসময় মিত্র।

---

* বিশ্বাস যে প্রেতলোক পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

মহীরাবণ বধ কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"লঙ্কানাথ" কর যোড়ে নিবেদিল মন্ত্রী,
"প্রদোষ কালীন আজি ছিনু আমি একা
আপন আলয়ে মগ্ন বিপুল চিন্তায়;
লঙ্কার সম্পদ হেতু সদা ভাবি আমি,
কিরূপে নিভিবে এই সমর অনল,
জন্মিল না জানি কোন্ কুক্ষণে গ্রাসিতে
বাসব বিজয়ী মহারথী রক্ষবীর-
দলে কালগ্রাসে, কেমনে হইবে তুষ্ট
বৈরনির্য্যাতন, হবে সুখে মহীপতি
লাভ তব বিজয় পতাকা, কত দিনে,
যাবে অস্তাচলে নর বানর গৌরব
রবি, কবে প্রকাশিবে লঙ্কার সুদিন; ১০০
ভাবিতে ছিলাম আমি নির্জ্জন মন্দিরে
অবরোধি গৃহ দ্বার। দেখিনু খুলিল
দ্বার অকস্মাৎ, প্রবেশিল বীরবেশে
গেহে মোর বীর এক, অঙ্গের ভূষণ
ছটা উজলিল দিকচয়, সচকিতে
হেরিনু সম্মুখে মম যুবরাজ মহী,
নমিনু তাঁহারে আমি ধরণী লোটাই,
কহিনু যুগল করে 'এত দিনে মনে
কি পড়িল তব লঙ্কাবলি, রাজপুত্র!
রাম নামে নর এক ঘেরিল ত্রিলোক- ১১০
ত্রাশ পিতৃরাজ্য তব বানর কটকে,
বান্ধি জলধিরে দৃঢ় পাষাণ নিগড়ে।
হত রণে হায়! নাহি সরে বাক্য মোর
জানাইতে যুবরাজ! হেন নিদারুণ
বার্ত্তা, হত রণে তব পিতৃব্য, বীরেন্দ্র
কেশরী, আর্য্য কুম্ভকর্ণ হত আহবে,
কুমার! কুমার হেন অজেয় জগতে,
তব ভ্রাতা ইন্দ্রজিত বীরশূন্য এবে
লঙ্কাপুরী, বিভীষণ, পিতৃব্য তোমার
নিয়োজিত রামকার্য্যে আপন ইচ্ছায়, ১২০
একা লঙ্কেশ্বর আজি পুর অভ্যন্তরে,
আকুল আত্মজ আত্ম-জনের বিরহে
ব্যাকুল রাজ্ঞীর শোকে, আকুল সর্ব্বদা
রক্ষবধূ অনুতাপে; লঙ্কার দোর্দ্দণ্ড
দর্প খর্ব্ব আজি, হায়! দৈব নিবন্ধনে
বানর মানুষে, মদমত্ত ঐরাবৎ
রুদ্ধ ঊর্ণনাভ জালে, সিংহের বিক্রম
রোধে শলভ মণ্ডলী; ঢাকে ব্যোমপথে
কপোত সমূহ পক্ষ সহকারে সূর্য্য-
কিরণ আঁধারি ক্ষিতি। কি কহিব আর ১৩০
তব সন্নিধানে, ভূভুজনন্দন, দহে
হিয়া মোর নিরন্তর লঙ্কার বিপদে।'
এরূপে কহিনু আমি সকল বারতা,
লঙ্কানাথ! রাজপুত্র বিদিত মানসে,
কেমনে সীতায় হরি আনিলে আপনি,
কেমনে সাগর লঙ্ঘি আইল পাবনি
জানকী উদ্দেশে, কেমনে দহিল লঙ্কা,
কেমনে সাগরে সেতু নির্ম্মিল রাঘব,
কেমনে হইল যুদ্ধ রাক্ষস বানরে,
একে২ নিবেদিনু আমি। শুনি মোর ১৪০
বাণী কতক্ষণ নীরবে রহিলা বীর,
হেরিনু কাতর হয়ে মুখ পানে চাহি
ঝরিছে নয়নযুগ তিতিয়া শ্বসন।

ক্রমশঃ—

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর আশ্রম।

কালাসর্দ্দার মুমূর্ষু মাধাকে কাঁধে লইয়া বীরপুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি বাঁধের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। বাঁধের উভয় পার্শ্বে সারি সারি কণ্টকাকীর্ণ বাবলা বৃক্ষ। একে সেই অন্ধকারময়ী রজনী তাহে সঙ্কীর্ণ কর্দ্দমময় পথ দিয়া যাইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কালার সে কষ্ট অপেক্ষা তাহার মনের কষ্ট অধিক হইয়াছিল। ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে কাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে? ও ব্যক্তি কে? ও কি মানুষ? কালাহেন সর্দ্দারের বুকে চাপিয়া বসিল, সে আর নড়িতে পারিল না; কি অসাধারণ শক্তি! এত বল কি মানুষের হইতে পারে? সে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, ভয়ে ও নীরবে বীরপুরুষের অনুসরণ করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অন্ধকারের গাঢ়তা পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া গেল, বর্ষাকালে জলাশয়ের কাল জলে যেরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ কুমুদপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ অনন্ত নৈশাকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল। পর্য্যটকগণ যে দীপালোক লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল এবং দেখিল দ্বীপের ন্যায় একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ তরুমূলে জটাজুট-শ্মশ্রুধারী, দীর্ঘাকার একজন যোগী নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে একটি অগ্নিস্তূপ প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। সেই অন্ধকার রাত্রে সেই নিভৃত প্রদেশে এপ্রকার গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া কালার মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভাবিল বীরপুরুষ সন্ন্যাসীর চেলা, সন্ন্যাসীর আজ্ঞামত তাহাদের দুইজনকে ধরিয়া আনিয়াছে, এই অগ্নিকুণ্ডেই তাহাদের জীবন নষ্ট করিবে। বীরপুরুষ ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং কালাকেও তথায় যাইতে ইঙ্গিত করিল। কালা অনিচ্ছাক্রমে তথায় গমন করিল এবং সাবধানে মাধাকে এক পার্শ্বে শয়ন করাইয়া বিমর্ষভাবে তাহার নিকট উপবেশন করিল। ভয়ে তাহার হৃদয় অস্থির হইতেছিল। সে কিপ্রকারে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মৃদুস্বরে বলিল "হুজুর আপনার পায়ে বড় কাদা লেগেছে অনুমতি হয়ত ঐ বিল হতে জল এনে পা ধুয়াইয়া দিই" কালার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, সে অনুমতি পাইয়া জল আনিবার ব্যপদেশে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। ঘোর নিশীথ সময়, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কিছুই শুনা যাইতেছে না, কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ অগ্নিস্তূপে চটাস্ চটাস্ করিয়া ইন্ধন পরম্পরা ফাটিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সন্ন্যাসী নীরবে নয়ন মুদিয়া বসিয়া

আছেন, এক পার্শ্বে মাধা ডাকাইত শবের ন্যায় পড়িয়া আছে ও অপর পার্শ্বে সেই বীরপুরুষ নিশ্চল ভাবে বসিয়া অন্য মনে কি ভাবিতেছেন। এই অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে সন্ন্যাসী নয়নোন্মিলন করিয়া জলদগম্ভীর রবে বলিলেন "ঘব্‌রাও মৎ বেটা।" আগন্তুক চমকিত হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

সন্ন্যাসী। ঘব্‌রাও মৎ বেটা—উও কঁহা ভাগেগা আবি পাখ্‌ড়া যায়েগা।

সন্ন্যাসীর এই সকল কথা শুনিয়া আগন্তুক বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন সন্ন্যাসী তাহার মনের কথা কি প্রকারে জানিতে পারিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই ভীম সর্দ্দার পলায়নপর কালাডাকাইতের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কালা ডাকাইতের দক্ষিণ হস্তের কিয়দংশ কাটা গিয়াছে, এবং ক্ষত স্থান হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত নিঃসৃত হইতেছে। ভীম সর্দ্দারের ও এখন আর সে মূর্ত্তি নাই। তাহার শরীর রক্তে প্লাবিত, সে বাম হস্তে কালার চুলের ঝুঁটি ও দক্ষিণ হস্তে তরবারী ধরিয়া ভয়ঙ্কর বেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কালা। দোহাই ঠাকুরজি, দোহাই ঠাকুরজি

সন্ন্যাসী। কম-বকৎ, চিল্লাও মৎ।

ভীম সর্দ্দার, সেই বীর পুরুষের মুখ পানে চাহিয়া কালাকে ছাড়িয়া দিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় হত বুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ন্যাসী। কেঁও তোম দেওয়ানা হো গেয়া, কেয়া দেখ্‌তেহো আপনা মনিব কো পছান্‌তা নেহি?

ভীম সর্দ্দারের তখনও কথা কহিবার শক্তি নাই। সে একদৃষ্টে দেওয়ানের পানে চাহিয়া রহিল।

দেওয়ান। কিরে ভীমে? তুই যে এখানে এলি?

আজ্ঞা বল্‌ছি, এই এইমাত্র বলিয়াই ভীমের দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল সে আর কথা কহিতে পারিল না। সে দেওয়ানকে পুনরায় জীবিত দেখিবে এরূপ আশা তাহার ছিল না। সে অনেক্ষণ পরে গদগদ স্বরে বলিল "হুজুর আপনাকে আবার দেখ্‌তে পাব বলে আশা ছিল না"

দেওয়ান। গোবিন্দরাম শিয়াল কুকুর নয়। এখন খবর কি? তুই কালিপুরে যাস্‌নি?

ভীম। আজ্ঞা বল্‌ছি। আমি ত আপনার হুকুম মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেম কিন্তু খানিক দূর গিয়ে ভাবলেম, ডাকাত বেটারা আমার পিছু নেবেই। আর আমি একা, সঙ্গে গহনার বাক্স, তাদের সঙ্গে যদি না পারি তাহলে আমিও যাব, আর বাক্সটাও যাবে। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রাণপণে দৌড়িতে দৌড়িতে, সাম্‌নে একজায়গায় কতকগুলি বটগাছ দেখ্‌তে পেলেম, সে খানটায় খুব অন্ধকার সেই অন্ধকারে আস্তে আস্তে জলায় নেমে একটা ভাঙ্গা সাঁকোর নীচে গিয়ে লুকুয়ে রইলেম অল্পক্ষণ পরেই শুন্‌তে পেলেম দুপ্ দুপ্ করে দুবেটা ডাকাত তীরের মত ছুট্‌ছে। একজন বল্‌ছে এ বেটা কত দূর গেল, আর একজন বল্‌ছে, যেখানে যাগনা কেন রত্নাপাথীর কাছে নিস্তার নাই। সে

যেখানে যাবে তাও আমি জানি, তুই চলে আয়। তাহারা দুইজনে বেরিয়ে গেলে আমি সাঁকোর নিচে হতে বেরিয়ে ভাবলেম যার নিমক খাই তাঁর কি দশা হল আগে দেখা চাই। এই ভেবে বরাবর এলেম। যেখানে ডাকাইতদের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল সেখানে এসে আপনাকে দেখতে না পেয়ে আর পা উঠিল না, এদিক ওদিক দেখতেছি, এমন সময় এই বেটা (সচকিতে) অ্যাঁ কোথা গেল।

দেওয়ান। অ্যাঁ তাইত—

সন্ন্যাসী এতাবৎকাল অগ্নিস্তুপের সংস্কার করিতেছিলেন, সকলকে অন্যমনা দেখিয়া কালা ডাকাইত পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল সে পাঁচ ছয় পদ যাইতে না যাইতেই সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন "ফিন্ ভাগতে হো বদ্‌মাশ্ ইধার আও।"

কালা ডাকাইত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী কটমট করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কি কথা বলিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলনা।

সন্ন্যাসী। দেখো বেটা উস্‌কা কেয়া হাল হুয়া, আউর এক কদম হিল্‌নেকা তাকৎ নেই হ্যায়!

দেওয়ান। সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ভক্তি গাঢ়তর হইল। তিনি বলিলেন ঠাকুরজী আপকা দোয়াসে ইয়ে বদ্‌মাশ আউর ভাগনে নেই সখেগা, আপকা হুকুম হোয় তো আভি হামলোক যাঁয়। ফিন্ ফজরকো আপকা চরণ দর্শন করেগা।

সন্ন্যাসী। যবতক তুম নেহি আওয়েগা ইয়ে দোনো বদ্‌মাশ হিঁয়াই রহেগা।

দেওয়ান। আউর এক বাত, ইয়ে দোনো ডাকাইতকো বহুত চোট লাগা। কুচ দাওয়াই ফরমাইয়ে।

সন্ন্যাসী। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন ইয়ে আরাম হোযাগা। (মাধাকে দেখিয়া) লেকেন ইয়ে নেই জীয়েগা। তিন রোজ বাদ মর যাগা।

দেওয়ান ভূমিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন এবং ভীমসর্দ্দারকে অনুসরণ করিতে বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমসর্দ্দারও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া দেওয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সঙ্গীতে রমণী-হৃদয়-

পুরুষ কর্ত্তৃক কতদূর চিত্রিত হইয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপিচ পূর্ব্বোক্ত গীতে প্রণয়ের আদিভাবেও যে দুঃখ আছে তাহা প্রকাশ করিতেছে। প্রণয় সুখ দুঃখ জড়িত, ইহাতে স্থির সুখ, বা স্থির দুঃখ নাই।

প্রণয়ীর চিত্ত ধ্রুবতারা সদৃশ। উহার গতি অদ্যাপিও নির্ণীত হয় নাই। উহা আশা রূপ সূর্য্যের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই অস্পষ্ট, ততই ক্ষুদ্র, ততই মলিন হইতে থাকে।

প্রণয় অভিধানে "আত্মন্" শব্দ নাই। স্বার্থ বিসর্জ্জনই প্রণয়ের আদি লক্ষণ, ও বিশুদ্ধ প্রেমের সার সুখ, যথা,

"কি জ্বালা ঘটিল সই?
মুখে বলি আমি, কিন্তু আমার আমি সই"

প্রণয়ের আদি ভাব কিরূপ তাহা ঐ মধুর গীতের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে :—

যে অবধি ও বদন, হেরিয়াছে এ নয়ন,
নাহি চাহে অন্য ধন, ও রতন বই—
চলিতে চরণ টলে, [illegible] পড়িগো ঢলে,
কি জানি সে কোন ছলে, মজাইল সই।"

এরূপ মধুময় সময়ে বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্যের সহিত মনের কিরূপ অমৃতময় সম্বন্ধ বা প্রণয়ীর চিত্ত কিরূপ বাহ্য জগতের মধুরতা আস্বাদনে সমর্থ তাহা নিম্নে সুপ্রকাশ—

"মরি কি মনোহর হেরি সখি! নয়নে,
সুধাময় শশধর সুনীল গগনে।
প্রকৃতি হাসিছে, দক্ষিণ বহিছে,
উপজিয়ে প্রেম সখি সবার মনে।
সরিৎ-সলিল, হেরি শশি হাসিল,
ধরি ছবি হৃদি মাঝে অতীব যতনে।"

মিলন ও বিচ্ছেদ।

পূর্ব্বরাগের পর মিলন প্রণয়ীর অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটে না। ক্ষণ মিলন, দীর্ঘবিচ্ছেদ অথবা ক্ষণ ক্ষণ দর্শন, ক্ষণ ক্ষণ আশা; ক্ষণ অদর্শন, ক্ষণ যাতনা; পুনরায় দর্শন ও ও পুন আশার উদ্ভাবন; অথবা একবার মাত্র দর্শন, সেই দর্শনেই মন প্রাণ সমর্পণ, পরে আজীবন সেই মনোরমা মূর্ত্তির আরাধনা; যেহেতু অনেক স্থলে জাতি, কুল, অবস্থা মিলন পথের চির বাধা হইয়া প্রণয়ীদিগের আশা এককালে দগ্ধ করে।

মিলন স্বর্গীয় সুধা। বিনা ক্লেশে সেই সুধা প্রাপ্ত হইলে উহার মধুরতা কোথায়? এই জন্য কবি কহিয়াছেন,

"মিলনেতে যত সুখ সে জানিবে কেমনে,
যে জন না দহিয়াছে বিচ্ছেদেরই জ্বলনে।
সুশীতল জল বল কে চাহিত যতনে,
যদি না তাপিত তনু তপনের তপনে॥"

কবি আর ও বলিয়াছেন,

"বিচ্ছেদান্তে পিরীতে কত সুখোদয়
হেমন্তে বসন্ত যেমন মেঘান্তে শশী উদয়!"

তবে কি বিচ্ছেদ প্রণয়ীজনের প্রার্থনীয়? যেস্থলে শুষ্ককণ্ঠ চাতকের; বা মরুভূমিস্থ পথিকের জলতৃষ্ণা অপেক্ষাও অধিক আকিঞ্চন সেস্থলে বিচ্ছেদ কিরূপে প্রার্থনীয় হইতে পারে? উহা প্রণয়াকাশে অমানিশা। অমানিশা অন্তেই পূর্ণিমার সূত্রপাত। যেজন তপোধন পুণ্ডরীক সদৃশ বিরহে একান্ত কাতর হইয়া প্রণয়ের জন্য প্রাণ প্রতীক্ষা করেন, তাঁহারই অদৃষ্টে পূর্ণশশী সন্দর্শন ঘটে না, কেহ বা প্রণয়ে হতাশ হইয়া সমাজ সুখ এককালে বিসর্জ্জন দিয়া, কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসতি করেন।

বিরহ আপাততঃ ক্লেশকর হইলেও উহা সদা ভাবী—সুখের নিদান স্বরূপ। ইহাতেই স্নেহের সত্যাসত্য, স্থায়িত্ব, ও গাম্ভীর্য্য নিরূপিত হয়।

"বিচ্ছেদ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব?
দুঃখ সুখ জ্ঞান করি তবু তাঁরে ভাবিব।
না থাকে তাঁহারি মন, না করিব দরশন,
তবু সে বিধুবদন, বিরলে হেরিব।"

মধুযামিনী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন গত হইল, একদা প্রভাতে কুমার হিঙ্গনার সহিত গাভীগণ লইয়া পর্ব্বতদেশে গমন করিয়াছেন। বেলা এক-প্রহর অতীত। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে হিঙ্গনা ঊর্দ্ধে চাইয়া দেখিলেন কতকগুলি বৃক্ষ কদম্ব অভ্যন্তরে একটী নবীন লকুচতরু ফলফুলে বিশোভিত হইয়া সেই নির্জ্জনস্থান অলঙ্কৃত করিতেছে। হিঙ্গনা সুদৃশ্য লকুচ ফলের অতিশয় পক্ষপাতিনী। তিনি দেখিবামাত্র কুমারকে মৃদু কুহক হাস্যে ঊর্দ্ধে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। কুমার হিঙ্গনাকে পার্শ্বে লইয়া উঠিতে লাগিলেন। সূর্য্য-তীক্ষ্ণ, পর্ব্বতদেশ বন্ধুর, হিঙ্গনার কোমল পদদ্বয় ক্রমশঃ শ্রমভারে ক্লিষ্ট। কুমার তাঁহাকে প্রতিপদবিক্ষেপে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, কুমার হাসিয়া হিঙ্গনাকে কহিলেন, "হিঙ্গনে যদি এক অল্পদূর উঠিতে তোমার এত ক্লেশ বোধ হইল, তবে তুমি আমার সহিত কিরূপে দুশ্চয় গিরি অতিক্রম করিয়া আমার বাটী দেখিতে যাইবে?" হিঙ্গনা যৌবনসুলভ চিন্তা ও বুদ্ধিশূন্যা হইয়া আহ্লাদ ভরে কহিলেন, "আমি যাব, আমি উঠিতে পার্‌বো, তুমি ছেড়ে দেও দিখিন্ আমি কেমন না আরও উঠ্‌তে পারি!" কুমার হাসিয়া কহিলেন, "তবে আমারই জন্যে উঠিতে ক্লেশ হচ্ছিল।" হিঙ্গনাও হাসিয়া কহিলেন, হাঁ।

তাঁহারা ক্রমে বৃক্ষমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; নবীন লকুচতরু আর অধিক দূর নাই, দশ বার হাত অন্তর মাত্র হিঙ্গনা নব উৎসাহে উৎসাহিনী, কুমার তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে সমধিক উদ্যোগী। বৃক্ষাভ্যন্তর অতি নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও পবিত্র স্থান। হিঙ্গনা কুমারের হস্ত ধরিয়া সুখে হাসিতে হাসিতে তরুমূলে আসিয়া ইঙ্গিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কুমার ফুল সকল পাড়িয়া একে একে স্নেহ-ভরে হিঙ্গনার হস্তে দিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি নিজহস্তে ফুল তুলিবেন, নিজহস্তে ফল পাড়িবেন—তাঁহার এই সাধ হইল। তিনি কুমারের সহিত কখন এদিকে, কখন ওদিকে, যেখানে যে ফলটী যে ফুলটী ভাল, ব্যগ্র হইয়া, কুমার পাড়িবার অগ্রে আপনি পাড়িতে লাগিলেন, সাধ্যাতীত হইলে সুহাস্য বদনে, সতৃষ্ণ নয়নে কুমারের দিকে চাহিতেন, কুমারও মন বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পাড়িয়া দিতেন। ক্রমে দুই জনে বৃক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, হিঙ্গনা একটী শাখায় চারিটী সুন্দর সুপক্ক ফল রহিয়াছে দেখিয়া আপনি সাধ্যমত চেষ্টা

করত বিফল হইয়া পূর্ব্ববৎ কুমারের প্রতি চাহিলেন, কুমার হাসিয়া বামহস্তে শাখাটী নত করিয়া দিলেন, হিঙ্গনা উন্নতমুখে ফল চারিটী পাড়িতে লাগিলেন, কুমার অনিমিষ ও সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার অনুপম মুখছবির প্রতি চাহিয়া আছেন, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, করে কর স্পর্শ হইতেছে হৃদয়ে হৃদয়ে মুখে মুখে ব্যবধান ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কুমার দক্ষিণ হস্তে কয়েকটী নব-ফুল্ল ফুলগুচ্ছ পাড়িয়া সস্নেহে হিঙ্গনার করবীবন্ধনে সংলগ্ন করিয়া দিলেন, কবরী স্পর্শে হিঙ্গনার সেই অভিনব আসল আবেশে শিথিল হইল, তিনি ফল ছাড়িয়া কুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া নতবদনা হইলেন, কুমার বামহস্তে আরক্ত নত বদনখানি ধরিয়া বিশুদ্ধ প্রেমভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন।

আজ অবধি কুমার হিঙ্গনারই।

তাঁহারা ফুল ফল লইয়া ক্রমে পর্ব্বত দেশ হইতে নামিয়া গাভীগণ লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এমন সময়ে দুইজন সশস্ত্র পুরুষ কুমারকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া যোড় হস্তে কহিল কুমার! আপনার ভগিনী সহসা পীড়িত হইয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসুন। কুমার এই সংবাদ শুনিবামাত্র বজ্রাহত সদৃশ হইয়া ছল ছল নয়নে হিঙ্গনার মুখের দিকে চাহিয়া বিদায় চাহিলেন, হিঙ্গনাও সজল নয়নে কুমারকে যাইতে বলিয়া শূন্যনয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাভীগণ স্বেচ্ছাক্রমে বাটী প্রবেশ করিল। হিঙ্গনা পূর্ব্ববৎ ছল ছল নয়নে কুমারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এসংসারের সুখ তুমি ছায়া মাত্র! দুঃখ তুমি শরীরী।

কুমার নয়নপথের অন্তর্হিত হইলেও তিনি যে পথে গিয়াছেন, সেইদিকেই চাহিয়া চাহিয়া করপল্লবে বিগলিত নয়নযুগল আচ্ছাদিত করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি কুমারের পীড়ার কথা শুনিলেন কিন্তু তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে জানিতে পারিলেন না। কবে তিনি আরোগ্য হইবেন, কবে পুনরায় কুমার ফিরিয়া আসিবেন তিনি অনেকক্ষণ সেই ভাবনায় নিমগ্ন রহিলেন। এদিকে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল হিঙ্গনার মাতা কুমারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, হিঙ্গনা মলিন অবনত মুখে "বলিলেন, তাঁহার ভগিনী হঠাৎ পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া বাটী গিয়াছেন"—তিনি "ইহা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মাতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা কুমারের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ ভাল বাসা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন উদয়গিরি আসিলে যদি কুমারকে তাড়াইতে হয় তাহা হইলে হিঙ্গনা হয়ত অত্যন্ত রুগ্ন হইবে, না হয় কোনরূপ অনিষ্ট করিবে।

হিঙ্গনা একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ঐ দুইজন সশস্ত্র পুরুষ যাহারা কুমারকে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, উহারা কে? উহাদের সহিত কুমারের সম্বন্ধ কি? উহারা কুমারের বয়স্য নহে, উহারা যেরূপ সম্মানের সহিত কুমারকে অভিবাদন করিল তাহাতে বোধ হয় কুমারের সহিত উহাদিগের প্রভু ও ভৃত্য সম্বন্ধ। কিন্তু কুমার দরিদ্র হইয়া তাঁহার এরূ

সশস্ত্র ভৃত্য কিরূপে সম্ভব? কুমারের প্রকৃত নাম কুমার হইলে, ভৃত্যেরা কি প্রকারে "কুমার" বলিয়া সম্বোধন করিবে? বয়স্য হইলে অভিবাদনের প্রয়োজন কি? কুমার কি প্রকৃত রাজপুত্র হইয়া তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন? রূপেগুণে তিনি রাজপুত্রের কিছুই ন্যূন নহেন। কিন্তু রাজপুত্র হইয়া তিনি প্রতিদিন এরূপ কষ্ট কেন সহিবেন? যিনি একবার মাত্র আজ্ঞা করিলে আমার অপেক্ষাও শত শত সুন্দরী পাইতে পারেন, তিনি কি কখন দুই প্রহরকাল পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া আপনি রন্ধন করিয়া আহার করেন? কুমার দরিদ্রই হইবে, সশস্ত্র পুরুষ তাঁহার প্রতিবেশী হইতে পারে, কুমার উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া তাহারা অভিবাদন করিতে পারে, তিনি এইরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু মনোমত হইল না। তিনি চঞ্চল পদে উঠিয়া মাতার নিকট আসিয়া কহিলেন "হ্যাঁ মা কুমারকে যখন দুজন সশস্ত্র পুরুষ ডাকতে এসেছিল, তারা যোড় হাত করে তাঁকে বল্লে "কুমার আপনার ভগিনী হঠাৎ পীড়িত হয়েছেন"—এরা কে মা?" তাঁহার মাতা সহসা তাঁহার কথা কিরূপে বুঝিবেন, তিনি বলিলেন "তারা কে বাছা আমি ত দেখিনি, দেখ্‌লে বল্‌তে পার্‌তুম"।

হিঙ্গনা। মা, কুমার কি রাজপুত্র?

মাতা। ও কথা কারও কাছে বলিস্‌নে, সকলে হাস্‌বে। রাজপুত্র কি বন্দুরে কাট কাট্‌তে যায়?

হিঙ্গনা। "আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম মা"। তবে ওরা কে ডাকতে এসেছিল?

মাতা। তা আমি কেমন করে বল্‌বো কুমার এলে জিজ্ঞাসা করিস্; কেন বাছা আজ একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লি।

হিঙ্গনা। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম কেন মা, বলি শুন, যদি কুমারের যথার্থ কুমারই হতো, তাহলে যারা চাকরের মত এসে প্রণাম কোরে, যোড় হাত কোরে কথা কয় তারা কি কখন নাম ধর্‌তে পারে?

মাতা। তারা কি বল্লে?

হিঙ্গনা। ঐ যে বল্লুম ত।

মাতা। নে মিছে আশা করিস্‌ নে,—আর কারও কাছে বলিস্‌নে;—সে আসুক আগে তাকে জিজ্ঞাসা কর।

হিঙ্গনা। মা আমি তোমারই কাছে বল্‌চি, আমি কি আর কাকেও বল্‌তে যাচ্চি। কুমার রাজপুত্রই হউক, আর গরিবই হউক, দুই সমান; আমিত রাজপুত্র ভেবে তাকে এখানে নিয়ে আসিনি।

মাতা। আবার ঐ কথা, দেখ্‌ একশোবার রাজপুত্র বলিস্‌নি। লোকে যদি একটু শুন্‌তে পায়, অমনি সাত কাণ হবে, আর সকলে তোকে ক্ষেপাবে।

হিঙ্গনা। না মা আমি কি পাগল—

মাতা। যা তবে আপনার কাজ কর্ম্ম করগে, মিথ্যা ভাবিস্‌নি, আর অরুণা এলে যেন অরুণাকে একথা বল্‌তে যাস্‌নে।

হিঙ্গনা। না।

মাতা। আর দেখ্‌ বিয়ের সম্পর্কে কোন কথা অরুণার কাছে বলিস্‌নে। তুই যা বল্‌বি ও তাই গিয়ে সকলের কাছে বলে বেড়ায়। এর মধ্যেও বলেছে যে হিঙ্গনা কুমারকেই বিয়ে কর্‌বে, উদয় এলে তার সঙ্গে কথা কবেনা।

হিঙ্গনা। আমি এমন কথা বলিনি, যে উদয় এলে তার সঙ্গে কথা কবনা, কেন মা কথা কব না কেন? সে ত আমার পর নয়, তবে মা উদয় কেমন এক রকম নিষ্ঠুর লোক, মনে মনে সব থাকে, অমন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না।

মাতা। তোর কপালে যা আছে তাই হবে।

হিঙ্গনা। তোমরা যা কর্‌বে আমার তাই কপাল।

মাতা। কুমার যদি বোণের ব্যাম হয়েছে বলে অম্‌নি অম্‌নি পালায়?

হিঙ্গনা। (শিহরিয়া) কি বল্লে মা, কু-ম-ার ছুত করে পালাবে? কেন?

মাতা দেখ্‌ছে উদয় শিগ্‌গির আস্‌বে— ।

হিঙ্গনা। না মা ও কথা বলো না, কুমার উদয়ের মত নয়।

মাতা। বেস্‌ সে তোকে কত গহনা কাপড় পাঠিয়া দিয়েছে, আরো নিয়ে আস্‌বে—শুন্‌চি শিগ্‌গির্‌ আস্‌বে, সে তোকে কত ভালবাসে, সে হলো মন্দ লোক!

হিঙ্গনা। বাবা যে কথা বলেন্‌, তুমিও সেই কথা বল, আমি উদয়কে বিয়ে কর্‌বো না।

মাতা। তুই সুখে থাক্‌বি, আমরা চোকে দেখ্‌বো বইত না।

হিঙ্গনা। আমি কাপড় গহনা চাইনে।

মাতা। না চাস্‌ত চিরকাল দুঃখে থাকিস্‌।

হিঙ্গনা। তাই থাক্‌বো।

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন, দুইদিন, তিন দিন গত হইল, কুমার আসিলেন না, চতুর্থ দিবসেরও সূর্য্য অস্তগত হইল, হিঙ্গনা একাকিনী পর্ব্বতদেশে বাইয়া ভাবিতেছেন "কৈ কুমার" "কৈ কুমার"; পার্ব্বতীয় সান্দ্র বায়ু শন্‌শন্‌ শব্দে বহিয়া যেন তাঁহারই মনের কথা বলিতেছে "কৈ কুমার" কৈ কুমার"। বিষাদ-বিনত, ম্লান বদনখানি এক্ষণে অব্যক্ত নয়ন বারিতে ধৌত হইতেছে, কাতর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস একবার দীর্ঘ নিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে—তিনি একাকিনী পর্ব্বতদেশে দাঁড়াইয়া কুমারের বাটীর দিকে চাহিয়া আছেন।

কুমার আজও আসিলেন না, কোন সংবাদ পাঠাইলেন না; তিনি কি অবলা জনকে ছলনা করিলেন? তিনি অবশেষে ইহাই ভাবিতেছেন,—ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় সে ভাব গ্রহণ করিতেছে না।"

এমন সময় দূরে এক অস্পষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তি লক্ষ্য হইল, তাঁহার হৃদয় আশা ও ঔৎসুক্যে উদ্বেলিত হইল। প্রতি মুহূর্ত্ত যুগ সদৃশ

বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই মূর্ত্তি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আশা পুনঃ পুনঃ যেন বলিতে লাগিল, "হিঙ্গনে" ঐ তোমার কুমার আসিতেছেন"

কুমারও দ্রুত পদে মুক্তকেশা বিগলিত-নয়না হিঙ্গনার নিকটবর্ত্তী হইয়া সস্নেহে তাঁহার অধরটী পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হিঙ্গনে! আমি এই তিন দিন আসিতে পারি নাই বলিয়া তুমি অবশ্য অত্যন্ত চিন্তিত আছ? আমার ভগিনী এখন অত্যন্ত পীড়িত, আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিব না, শীঘ্রই যাইব।" হিঙ্গনা বলিলেন আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর এরূপ কষ্ট সহিতে পারিনা, আমি কেন তোমাকে ভাল বাসিলাম, তা নাহলে এত দুঃখ হইত না।"

কুমার। হিঙ্গনে! আজ না, অন্য এক দিন লইয়া যাইব, একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে পর্ব্বত দেশ অতি উচ্চ।

হিঙ্গনা। তুমি বলিলে না, তোমার ভগিনীর কি অসুখ হয়েছে?

কুমার। সেদিন জ্বর হইবার পূর্ব্বে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়েন, তার পর জ্বর হয়, সেই জ্বর অবিশ্রান্ত ভোগ করিতেছে, আমি বলিতে পারি না, হিঙ্গনে! পরিণাম কি হবে?

হিঙ্গনা। ঘনশ্যাম দেবকে আরাধনা কর, তিনি অবশ্য আরোগ্য করিয়া দিবেন।

কুমার। ঘনশ্যামদেবের আরাধনা নিতাই করিতেছি, মাতাদেবীর ও পূজা পাঠাইয়া দিয়াছি, কৈ জ্বরের কিছুই হ্রাস দেখিতে পাচ্চি না।

হিঙ্গনা। আমার মা জ্বরের ভাল ঔষধ জানেন, যদি আবশ্যক হয়, চল, ঔষধ দিবেন।

কুমার। কি ঔষধ?

হিঙ্গনা। তা আমি জানি না, তিনি অনেক লোককে দিয়া থাকেন, তুমি বলিলে, অবশ্যই দেবেন।

কুমার। আজ থাক, যে বৈদ্য আমার ভগিনীকে দেখিতেছেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি বলেন? যদি দিতে বলেন, তাহ'লে কাল আসিব, না হয় লোক পাঠাইব।

হিঙ্গনা। আসিবে বল?

কুমার। তা আমি বলিতে পারিনে, যদি রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হয়, তাহলে আসিতে পারিব না।

হিঙ্গনা। তিনি কেমন থাকেন সংবাদ পাঠাইবে।

কুমার। তা পাঠাইতে পারি।

হিঙ্গনা। আমি তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবো, তা আজ তুমি শীঘ্র যাচ্চ, ভগিনী ভাল থাকুন, পরে বল্‌বো।

কুমার। (সস্নেহে) তবে আজ বিদায় হই।

হিঙ্গনা কাঁদিতে লাগিলেন, কুমার পুনরায় মুখচুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন।

কুমার চলিয়া গেলে, হিঙ্গনা আস্তে আস্তে পর্ব্বতদেশ হইয়া নামিয়া গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া দেখেন অরুণা তাঁহার জন্যে বসিয়া আছেন। তিনি অরুণাকে দেখিয়া মৃদুম্লানহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, অরুণা কেমন আছ, ক'দিন আইস নাই যে?

অরুণা। আমি যেমন থাকি না কেন, তোমার কুমার কেমন আছে?

হিঙ্গনা। কেন, অরুণা তুমি অমন কথা বল্লে, আমি কি তোমাকে ভাল বাসিনি?

অরুণা। আগে কুমার—তার-পর আমরা। তোমার কুমার নাকি পালিয়েছে?

হিঙ্গনা। না তাঁর ভগিনীর বড় অসুখ হয়েছে।

অরুণা। কি অসুখ?

হিঙ্গনা। জ্বর।

অরুণা। কি এমন জ্বর যে, সে আর আসে না।

হিঙ্গনা। ব্যাম শক্ত বলেই আস্‌তে পারে নি? কুমার আসেন নাই, তা তোমাকে কে বল্লে?

অরুণা। আমি শুন্‌তে পাই, তুই কুমার-কে পেয়ে সব ভুলে গিয়িচিস্, আমার-দের বাড়ী টাড়ী সব—ভুলে গিয়েচিস্।

হিঙ্গনা। তা যা বল, আমার মনেও যা বাহিরেও তা, আমি যে কুমারকে ভাল বাসি তা সে জানে, তা তুইও জানিস্, আর আমার মা বাপ সকলেই জানে।

অরুণা। সে যদি পালিয়ে যায় (হাসিয়া) তখনত উদয়কে বিয়ে কর্‌তে হবে?

হিঙ্গনা। (ছল ছল নয়নে) কেন ও কথা বলচ, কুমার পালাবে না।

অরুণা। তুই কি ঘাঁটী জানিস?

হিঙ্গনা। হাঁ—

অরুণা। উদয় শীঘ্রই আস্‌বে দুচার দিনের ভিতর আসবে শুন্‌ছি?

হিঙ্গনা। আসে ত—তুই নিস্—

অরুণা। (বিষাদে) সে তোকে চায়, আমাকে চায় না। তা, তুই যদি ছেড়ে দিস্ তাহলে হয়। তা কি পার্‌বি?

হিঙ্গনা। (ম্লান হাসি হাসিয়া) পার্‌বো।

ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

অদ্‌ভুত-স্বপ্ন।

(স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব।)

আহা! কি স্বপ্ন দেখিলাম, এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই, যদিও যাহা দেখিয়াছি সমস্ত স্মরণ নাই, তথাপি যাহা স্মরণ আছে তাহা মনে করি-য়াই আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। দেখিলাম একটী নির্জ্জন গৃহ মধ্যে একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী রমণী নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। যদি সে রমণীর রূপরাশি বর্ণনা করিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলে আমি তাহার রূপ বর্ণন করিতাম।

যদি মনুষ্য এমন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিত যে তদ্দ্বারা স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে,তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আমি পৃথিবীর সমস্ত লোককে উন্মত্ত করিতে পারিতাম। বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলে দৈত্যমণ্ডলীর যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে আজি আমি সমগ্র পৃথিবীর সেই দশা ঘটাইতে পারিতাম। তাহা যখন পারিলাম না তখন অলৌকিক রূপের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়া সেই রূপসাগরের অবমাননা করিব না। রমণী একাগ্র চিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছেন, আমি তন্ময় হইয়া যুবতীর রূপরাশি দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার উদ্‌ঘাটন শব্দ শ্রুতি গোচর হইল, সেই শব্দ অনুসারে দৃষ্টি সঞ্চালণ করিলে দেখিলাম ঐ দ্বার দিয়া একটী ভুবনমোহন যুবা পুরুষ ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কি বলিব আমি পুরুষ যদি কোন রমণী তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে না-জানি তাঁহার কি দশা ঘটিত। বোধ হয় সমস্ত নারী সমাজ ঐ যুবাকে দেখিয়া কুল মান ও লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পক্ষপাতিনী হইতেন। আমি জানি না ঐ যুবতীর রূপ অধিক কি, ঐ যুবকের রূপ অধিক। আমি পুরুষ সুতরাং আমি রমণী রূপের পক্ষপাতী হইব, তাহাতে আর কথা কি, ঐ সময়ে যদি একটী রমণী ঐ যুবাকে দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত রূপে কে শ্রেষ্ঠ? তাহা হইলে ঐ রমণীর সহিত আমার বিতণ্ডার শেষ হইত না। যুবা ধীরে ধীরে যুবতীর নিকটবর্ত্তী হইলেন কিন্তু রমণী পুস্তক পাঠে এত মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ বা যুবকের পদধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। যুবক অনেকক্ষণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন এখনও যুবতী তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন না, তখন তিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা যুবতীর বক্ষঃস্থল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং প্রণয়পূর্ণ বাক্যে কহিলেন হৃদয়েশ্বরি! সংজ্ঞাশূণ্য হইয়া কি পড়িতেছ আমি যে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি তাহা জানিতে পার নাই? যুবতী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া লজ্জানম্রবচনে কহিলেন হৃদয়েশ্বর অথবা সর্ব্বেশ্বর! পুস্তক পড়িয়া আমি সংজ্ঞাশূণ্য হই নাই! তোমাদের গুণের কথা পড়িতে পড়িতে আমার অন্তরাত্মা কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না। যুবক কহিলেন আমাদের দোষের বিষয় কি ঐ পুস্তকে লেখা আছে? যুবতী সহাস্যে কহিলেন একা তোমার নহে, তোমার জাতির; বাস্তবিক আমি তোমাদের গুণাবলীর বিষয় আলোচনা করিয়া এমত হতবুদ্ধি হইয়াছি যে, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। আমি জানিতাম তোমরা অতি সরল, তোমরা স্ত্রীজাতির নিকট বলিয়া থাক "অয়ি তোমাগত প্রাণ, তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী" কিন্তু সে সকল মৌখিক বাক্য যে কেবল আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে বলিয়া থাক তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। এখন জানিলাম তোমরা নিতান্ত নিষ্ঠুর—প্রকৃতি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাদের এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? যুবক একদৃষ্টে যুবতীর মুখপানে চাহিয়া অবাক হইয়া যুবতীর কথা শুনিতেছিলেন, কিঞ্চিৎপরে কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার এ জ্ঞান কোথা হইতে হইল, ঐ পুস্তকেকি এই সকল লেখা আছে? দেখি

ওখানি কি পুস্তক! রমণী কহিলেন কেবল এ পুস্তক নহে, অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় তোমাদের পুরুষ জাতির গুণের কথা লেখা আছে। এখানিতে তোমাদের অত্যাচারের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ছি! পুরুষজাতি এমন স্বার্থপর! নারীর উপর অত্যাচার করিতে কি তোমাদের লজ্জাও হয় না?

"কেবল পুস্তক পড়িয়া জানিয়াছ পুরুষ অত্যাচারী না পরীক্ষা দ্বারা তাহার প্রমাণ পাইয়াছ"?

"পরীক্ষা করিয়া জানিবার তত উপায় নাই, কারণ এই যে, আমরা সকল দিক দেখিয়া উঠি এমন শক্তি আমাদের নাই, বিশেষতঃ আমি তোমার মত উত্তম স্বামী পাইয়াছি বলিয়া আমি অধিক কষ্ট পাই নাই সুতরাং বুঝিতেও পারিনাই।

যখন তোমার পরীক্ষা সিদ্ধ কোন জ্ঞান নাই তখন তুমি কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা বিশ্বাস করিলে কেন? গ্রন্থকার যে ভ্রান্ত হয়েন নাই তাহা তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক পুরুষের লেখা, রমণীজাতি. বাস্তবিক অত্যাচার—পীড়িত হইতেছে কি না তাহা পুরুষ, অনুমান দ্বারা ভিন্ন জানিতে পারে না। অনুমান যে সত্যের মূল, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কতদূর যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা কি বিবেচনা কর নাই, তুমি কি জাননা ঐরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে সমধিক অমঙ্গল ঘটে, এক্ষণে বিবেচনা কর দেখি যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু পুরুষদিগকে বৃথা নিন্দা করিয়া থাক তাহা হইলে কি তোমার অন্যায় কার্য্য করা হয় নাই ও তাহাতে কি তোমার পাপ অর্শে নাই?

"কেন আমি কি না বুঝিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের লেখায় বিশ্বাস করিয়া পুরুষদিগকে দোষী বলিয়াছি? প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেত তুমি স্বীকার করিবে? পুরুষেরা যে স্ত্রী জাতির প্রতি অকারণ বা আত্মসুখের জন্য অত্যাচার করে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। বাল্যবিবাহ, স্ত্রী জাতির অধীনতা, স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দান পরাঙ্মুখতা ও বিধবা বিবাহ নিষেধই ইহার প্রচুর প্রমাণ। এই সকল কি অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে? তাহা যদি না হয় তবে জানি না আর কিরূপ প্রমাণের প্রয়োজন।

জীবিতেশ্বরি! তোমার ভ্রম হইয়াছে। এই সকল দ্বারাই কি পুরুষের অত্যাচার প্রমাণিত হইবে? কখন নহে। এস আমরা একটী একটী করিয়া ঐ সকলের বিচার করিয়া দেখি। তোমাকে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছি তখন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। এই জন্য একটী গল্প মনে পড়িল, তাহা বলিয়া যাই মনে রাখিও। কোন ব্যক্তি নিজ পুত্র ও কন্যার সুশিক্ষা বিধান জন্য বাটীতে মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন, পাঠ সমাধানান্তে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাপু! ভারত পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলে? পুত্র কহিলেন পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃ হত্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা কহিল দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল। পুত্র কন্যার উত্তর শুনিয়া তাহাদের পিতা কপালে করাঘাত করিয়া মনে মনে কহিলেন উপদেশ পাত্রঅনুসারে সঞ্চারিত

হয়। আজিকালি নব্যযুবকগণ ইয়ুরোপীয়-দিগের নিকট হইতে ঐরূপ বাছিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তোমাকে যখন আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, তখন তোমারও যে ঐরূপ শিক্ষা হইবে তাহাব আশ্চর্য্য কি? যাহাহউক এক্ষণে বল দেখি বাল্যবিবাহ দ্বারা তোমাদের প্রতি কি অত্যাচার করা হইয়াছে?"

যুবতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? সামান্য চিন্তা করিলেই কি উহা বুঝাযায় না? আমাদের যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা বাস্তবিক কি বিবাহ পদবাচ্য? আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখনকি আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কে আমার স্বামী হইবে? যদি ভাগ্যবশতঃ তুমি ভাল না হইয়া মন্দ হইতে তাহা হইলে কি আমার দুঃখের সীমা থাকিত? কত কুল-কামিণী অতি অধম স্বামীর যন্ত্রণায় নিয়ত দুঃখ পাইতেছে। যদি অধিক বয়সে যখন জ্ঞান সঞ্চার হয়, তখন যদি বিবাহ হইবার নিয়ম হইত তাহাহইলে কি আমরা নির্ব্বাচন করিয়া মনোমত স্বামী গ্রহণ করিতে পারিতাম না? এবং তাহা হইলে কি সকল রমণীর কষ্ট নিবারণ হইত না? মন্দ স্বামী হইতে রমণীগণ যে কষ্ট পায় সে কি বাল্যবিবাহের দোষ নহে। কেন পুরুষ অন্যায় করিয়া স্ত্রীজাতিকে ঐরূপ দুঃখ প্রদান করে?"

"আচ্ছা বল দেখি আমি যখন বিবাহ করিয়াছিলাম তখন কি আমি নিজে পছন্দ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, না পিতার আদেশানুসারে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি। আমার ভাগ্যে তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী না যুটিয়া অতি কুৎসিতা ও দোষসম্পন্না নারী যুটিতেও ত পারিত। তবে কি আমি বলিব পুরুষ জাতি নিতান্ত অত্যাচারিত? বাল্যবিবাহে যে দোষের কথা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। যদি ঐ নিয়ম অত্যাচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি অত্যাচার করিবারজন্য ঐ বিধান সৃষ্ট হইয়াছে। একথা কখনও বলিতে পার না যে উহা কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য কৃত হইয়াছে। কেননা নির্ব্বাচন করিবার শক্তি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সমান, যদি পুরুষ স্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারিত এবং স্ত্রী স্বামী নির্ব্বাচন করিতে না পাইত, তাহা হইলে অবশ্য পুরুষকে অত্যাচারী বলা যাইত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন কি প্রকারে পুরুষকে অত্যাচারী বলা যায়।

"অবশ্য আমি স্বীকার করি যে উহা দ্বারা পুরুষেরও সমভাবে ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঐ নিয়ম কর্ত্তা কে? ঐ নিয়ম কি একাকী পুরুষে করে নাই? যখন একাকী পুরুষ অনিষ্টকর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তখন পুরুষের দোষ নয় কি স্ত্রীর দোষ? তোমরা যদি আপন ক্ষতি আপনি কর তাহাতে আমার বা অন্যের দোষ হইতে পারে না।"

"আমি তোমাদিগের দোষ দিতেছি না, দোষ আমাদের স্কন্ধেই লইতেছি। যদি বাল্যবিবাহ প্রথা অনিষ্টকর হয়, তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, পুরুষ বড় নির্ব্বোধ, এমন নির্ব্বোধ যে আপনার পায়ে আপনি

কুড়ালি প্রহার করে। কিন্তু তুমি এমন কথা বলিতে পার না, যে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিবার মানসে বা আত্মসুখ সাধনোদ্দেশে বাল্যবিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ বুঝিয়া না থাকিতে পারে, কিন্তু উহার মনে যে কোনও কুঅভিসন্ধি নাই তাহাতে কিছু সন্দেহ থাকিতেছে না। বাল্যবিবাহ বাস্তবিক অনিষ্টকর কি না, তাহা আর এক সময়ে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে তাহা দেখার আবশ্যকতা নাই, কেননা এখন কেবল বিচার্য্য এই যে বাস্তবিক পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করিতেছে কি না? তাহা যে করিতেছে না, তাহা বোধ হয় এখন তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।"

"আচ্ছা, বাল্যবিবাহের কথা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিতেছি। কেননা ইহার সদুত্তর দানে আমি অসমর্থ। কিন্তু বল দেখি পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে বলপূর্ব্বক আপন অধীন করিয়া রাখিয়াছে কেন? যখন সমদর্শী পরমেশ্বর নর নারী উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিকে অবশ্যই সমান করিয়াছেন, তবে কেন নর নারীকে অধীন করিয়া কষ্ট প্রদান করে? কেন নর পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে। ইহা কি মানবের অত্যাচার নহে?"

"ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা সহজে তুমি কি আমি নিরূপণ করিতে পারি না। তিনি সকলকেই সমান করিয়াছেন কি অসমান করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অনেক বিতণ্ডা ও অনেক সূক্ষ্ম দর্শনের প্রয়োজন। সুতরাং সে কথা এক্ষণে থাকুক। কিন্তু বল দেখি তোমারা আমাদের অধীন, না আমরা তোমাদের অধীন? তুমি বলিতেছ তোমরা আমাদের অধীন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন প্রথমে অর্থাৎ পরিণয়ের পর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি আমার সাধনা করিয়াছিলে না আমি নিতান্ত অধীন ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় নিয়ত তোমায় অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি? চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মুখব্যাদান করিয়া অমৃত নিঃসন্দী বাক্য কথন জন্য তোমার কত সাধনা করিয়াছি, তাহা কি স্মরণ হয় না? এখন কি তাহা স্মরণ করিলে তোমার মনে দুঃখের উদয় হয় না? তখন তোমার কি মনে হইত? তুমি দাসী আমি প্রভু মনে হইত, না আমি দাস তুমি প্রভু মনে করিতে? পরে যখন তুমি আমার দুষ্কর আরাধনা ও নিয়ত তপশ্চর্য্যায় তুষ্ট হইয়া আমার প্রার্থনা সকল পূরণ করিতে লাগিলে, তখন কি আমি নিরতিশয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম না? ঐ কৃতজ্ঞতার- ও দাসত্বের যদি কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইত তাহা হইলে তুমি কিরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে, স্মরণ করিয়া দেখ দেখি! ঐ রাগের সমতা করিতে কত রাত্রি বিনা নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছে ও কতদিন অশ্রুজলে সমস্ত শয্যা আদ্র হইয়া গিয়াছে। এমন কত দিন হইয়াছে, যখন দেখিলাম এত আরাধনাতেও তোমার ক্রোধের শান্তি করিতে পারিলাম না, তোমার তুষ্টিলাভে কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন (দেহি পদপল্লব মুদরম্) চরণে মস্তকার্পণ করিয়াছি। সে সকল সময়ে তুমি কি ভাবিয়াছিলে? তখন কি

ভাব নাই যে আমি তোমার অনুগত দাস? ক্রমে যত বড় হইতে লাগিলে ও দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলে পুরুষ জাতি বিনা বেতনের গোলাম, তখন কি তোমার মেজাজ গরম হইয়া উঠে নাই? তখন হইতে কি লম্বা চৌড়া ফরমাইজ আরম্ভ কর নাই? আজি বানারসি কাপড় চাই, আজি হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার চাই, আজি ভ্রাতা বা ভগিনীর জন্য অর্থ চাই ইত্যাদি হুকুম দ্বারা কি আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিয়া থাক? অবশ্য কিছুতেই নয়। বল দেখি যখন তুমি এই সকল অনুজ্ঞা প্রচার কর, তখন কি তুমি মনে কর তুমি একজন অধীনা দাসী মাত্র? তাহা মনে করা দূরে থাকুক তুমি ইহা একবারও মনে কর না যে এত লম্বা লম্বা ফরমাইজ করিতেছি, ইহা অনুগত দাস বেচারি পালন করিতে সমর্থ হইবে কি না। বেতনভোগী বা ক্রীত দাসের প্রতি হুকুমেরও একরূপ সীমা আছে—কিন্তু পুরুষ দাস বেচারীর উপর নারীজাতীর হুকুম করিবার কিছুমাত্র সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা ঐ বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া ঐ দাসত্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য "চুরি করা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন।" প্রাণেশ্বরি এসকল কি স্ত্রীজাতির অধীনতা না প্রভুতা। তোমাদিগকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া আমরা কি জন্য পর্ব্বতে, অরণ্যে, রৌদ্রে, বাঁতে, জলে, স্থলে দিবা নিশি ভয়ানক কষ্ট করিয়া বেড়াই? কিসের জন্য আমরা প্রাণ, মান থাকিবে কি না, বিচার না করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকি? এবং কাহার পূজার জন্য আমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িয়া গড়াইয়া যায়? সকলই কি রমণীর প্রসন্ন আননে মধুর হাস্য দেখিবার জন্য নহে? দেখ প্রেয়সি যে ব্যক্তি রমণীর দাসত্ব স্বীকার করে নাই, সে কি নারী-দাসদিগের ন্যায় অহরহ ক্লেশ স্বীকার করে? কখনই না। নিয়তই সে সতেজে কার্য্য করিতে থাকে। সে জ্ঞানসাগর মন্থন করে, পৃথিবীর বন্ধু হয়, ঈশ্বরের উপাসক হয়। কিন্তু কিছুতেই তেজঃশূন্য হয় না। কিন্তু রমণী-দাসদিগের দুরবস্থা কি স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ না? তাহারা কেবল তোমাদের দাসত্ব করিয়া অব্যাহতি পায় না। আটটার সময় নাকে মুখে চারটি ভাত গুঁজিয়া কলম যন্ত্রে সজ্জীভূত হইয়া আফীস রঙ্গভূমে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাহেবদিগের হুকুম তামিল সুখ অনুভব করেন। প্রাণেশ্বরি! ইহাতেও যদি তুমি পুরুষদিগকে স্বাধীন ও স্ত্রীদিগকে পরাধীন বলিয়া ঈর্ষান্বিত হও তবে এইক্ষণেই বলিতেছি, তোমারা আমাদের পদ গ্রহণ কর ও আমাদিগকে তোমাদের পদ প্রদান কর। আমরা হৃষ্ট চিত্তে অবস্থা বিনিময় করিতে প্রস্তুত আছি।"

যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জানম্র স্বরে কহিলেন "এরূপ দাসত্ব তোমরা ইচ্ছা করিয়া কর—আমারা কথা কহি না, কহাইবার জন্য চেষ্টা কর কেন? চুপ করিয়া থাকিলেইত হয়। তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য্য নাই সেই জন্য প্রয়োজন"—ইহার পরে রমণী আর কিছু বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্মরণ হইতেছে না। বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

যুবা কিঞ্চিৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য্য যথেষ্ট আছে ও প্রয়োজন নাই মানিলাম, কিন্তু তবে

রমণী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে কেন? সে কথা যাউক—যে কারণেই হউক প্রয়োজন ত আমরা বল দ্বারা সাধন করিতে পারি। তাহা না করিয়া যখন তোমাদের আরাধনা করি ও তোমাদের সুখের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি তখন আমরা স্বাধীন ও তোমরা পরাধীন একথা বল কেন?”

“তুমি কি মনে করিতেছ সে কথা বলিবার কারণ নাই? তুমি আমাকে পিঞ্জর বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ কেন? অন্তঃপুর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আমাদিগকে যাইতে দেও না কেন? ইহাতে কি সুবর্ণ পিঞ্জরে সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে না? একটী, পোষা পাখীর সুখের জন্য তুমি যথেষ্ট চেষ্টা ও শ্রম কর বলিয়া কি পাখীকে স্বাধীন ও তোমাকে অধীন বলিতে হইবে?

ক্রমশঃ—

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

—o—

মহীরাবণবধ কাব্য।

“হায়! এতদিনে অন্তে বার বুঝিনুরে
আমি, সাগর শোভিনী লঙ্কে! তোর বীর
গৌরব, ঘুচিল বুঝিনু এত দিনের
পর বিপুল কর্ব্বুর কুলমান, কোথা
গলি ভাই! মম প্রাণসম মেঘনাদ
তুই, ছিল শাসিত দেবলোক, গন্ধর্ব্ব.
মানব তোর বাহুবলে, নর বানর
সংগ্রামে ভাই! ত্যজিলি দেহ কোন খেদে
তরুণ বয়স তোর, কেনরে সত্বর
এত গেলি চলি নিত্যধামে ত্যজি তনুঃ
সম্মুখ সমরে?’ শোক সম্মিলিত স্বরে
ভাসিলাহে লঙ্কাপতি তব পুত্রবর,
‘কিন্তু নাহি দোষি তোরে, ইন্দ্রজিত! নাহি
দোষি আমি ভাই বীরবাহু তোরে, নহ
দোষি কোন মতে ভাই! অতিকায় তুমি,
পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে সাধিলে বীরের
কাজসবে; কিন্তু দোষি আমি লঙ্কেশ্বরে
জলনিধিকূলে যবে আইল রাঘব
কপি সেনা লয়ে, যদি মোরে সেই কালে
স্মরিতেন পিতা, কভু না হইত সেতু
সাগর উপর, কভু নাহি উদ্দীপিত
নিদ্রা ত্যজি অনুচিত কালে, ভ্রাতৃ সবে
না হইত কবলিত কালান্তক গ্রাসে
তরুণ বয়সে। জানেন জনক মোর
বিচিত্র মায়াবী আমি, ভুলাইতে পারি
ত্রিভুবন ইন্দ্রজালে, মারিতাম সেই
দণ্ডে আমি অবহেলে কুহক কৌশল
মানব লক্ষ্মণে, ক্ষুদ্র নর রামে, ঝম্পী
সবে পলাইত সমর বাসনা ছাড়ি :—
কিন্তু কোন অপরাধে নারি কহিবারে,
সারণ! জনক মোরে না স্মরিলেন এ
হেন বিপদ সময় :—আইলাম আজি
আমি আপন ইচ্ছায়, কেহ নাহি দিল
মোরে সন্দেশ বারতা; কুস্বপ্ন দেখিনু
এক কালি নিশাযোগে উঠিয়াছে শ্যাম
পীত মেঘ একখানি তারাপথে দিক্‌
অন্ত ব্যাপী, বরষিছে অহরহঃ অগ্নি
ধারা মুষলধারে, করিছে আর্ত্তনাদ
হাহাকারে ক্ষিতিতলে রাক্ষস মণ্ডল।—

ক্রমশঃ—

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট।)

গোবিন্দরাম সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার সেই বাবলা বাঁধ দিয়া চলিলেন। ভীম সর্দ্দারও পুনর্ব্বার প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে দেওয়ানজী ভৃত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন "হ্যাঁরে, থানায় না দিয়া তুই ও বেটাকে এখানে আনলি কেন?"

ভীম। আজ্ঞা, থানা যে এখান হতে অনেক দূর, ততটা রাস্তা কি ঐ অতবড় জোয়ান মর্দ্দকে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যায়? এই আলোটা দেখতে পেয়ে ভাবলেম অবশ্য এখানে মানুষ আছে, কোন না কোন একটা উপায় হতে পারবে, তাই এখানে নিয়ে এলেম।

দেওয়ান ভীমের কথায় কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনে কি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আপনার লাঠি, ভীমকে দিয়া, তাহার করবাল খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তুই বরাবর কালীপুরে না গিয়া ভাল করিস্‌নি।"

ভীম। হুজুর, আমি মূর্খ মানুষ, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেছি, আমার কসুর মাপ করুন।

"আচ্ছা, চলে আয়" এই কথা বলিয়া গোবিন্দরাম পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে উর্ম্মিমালার ন্যায় কতই চিন্তা তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত করিতে লাগিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই ঘটিয়াগেল! চারি পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে কে জনিত যে এ প্রকার ঘটনা সকল সংঘটিত হইবে? চারি পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, এখন কি হইল? আবার কি ঘটিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমার সঙ্গিদিগের কি দশা হইয়াছে, তাহাও জানি না। মনুষের জ্ঞান অতীব সামান্য, অতীব সঙ্কীর্ণ। এই অসীম বিশ্বের অধিকাংশ ব্যাপারে সসীম মনুষ্য সম্পূর্ণ অন্ধ। তবে মনুষ্য জ্ঞানের অহঙ্কার করে কেন? মনুষ্য কি বুঝিতে পারে? দেখিতে পায় না বলিয়া চন্দ্রমার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অন্ধের যেমন ধৃষ্টতা; আমরা যাহা বুঝিতে পারি না, তাহা হইতে পারে না বলা, আমাদের সেইরূপ প্রগল্‌ভতা, নাস্তিকতা মূর্খতার চরম সীমা। লোকে বলে, যোগ বলে ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, জানি না সেকথা কতদূর সত্য। কিন্তু সন্ন্যাসীর কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ইনি একস্থানে বসিয়া নানা স্থানের ঘটনা অনায়াসে জানিতে পারিতেছেন। আহা, কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না! জানিনা কি হইতেছে! স্ত্রীলোকের পুরী, অবি-

ভাবক কেবল বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়—তিনি কি করিবেন? না জানি দস্যুগণ কতই যন্ত্রণা দিতেছে, কতই অবমাননা করিতেছে।”

“উঃ অসহ্য—ভীমে আর কত দূর আছে! এখন আমরা কোথা এসেছি?”

ভীম। আজ্ঞা, এই যে ডানকুনি গ্রাম বামে রেখে এলাম।

দেওয়ান। তবেত আমরা এসে পড়েছি অ্যাঁ!

ভীম। আজ্ঞা ঐ যে ওপারের রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

বহুদূর প্রসারী প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, প্রান্তরের পশ্চিম সীমায় কৃশাঙ্গী স্বরস্বতী নদী রজত-রেখার ন্যায় মৃদু মন্দ গতিতে নীরবে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর পশ্চিম পারে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষাবলি সংখ্যাতীত খদ্যোত মালা মণ্ডিত হইয়া রত্ন-তরুর ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং সেই তরুরাজির পশ্চাদ্ভাগে সুপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার ধারে কালীপুর গ্রাম এবং এই রাস্তাই ভীম সর্দ্দার গোবিন্দরামকে দেখাইয়া দিল। তাঁহারা যে পথ দিয়া আসিতে ছিলেন, সে পথ কালীপুরের রাস্তার সহিত একটি ইষ্টক নির্ম্মিত সেতুর দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। দেওয়ান ভৃত্যসহ নদী পার হইয়া গ্রামের প্রান্ত ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কেবল শ্মশান ভূমি ও দুই এক ঘর ইতর লোকের বসতি। বড়ই অপ্রীতি-জনক স্থান। এখানে আসিয়া দেওয়ানের চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কল্পনায় নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন—তিনি যেন স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন—বিলম্ব তাঁহার অসহ্য হইল—তিনি উন্মত্তের ন্যায় পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘোষেদের বাটী।

রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পৃথিবী নিস্তব্ধ, প্রাণী মাত্রেই নিশ্চল নিদ্রিত, কেচিৎ কোথায় একটা কুক্কুর ডাকিতেছে, কেচিৎ কোথায় একটা পেচক উড়িয়া যাইতেছে, এ প্রকার প্রগাঢ় নিশীথ সময়ে কে ও রমণী, একাকিনী ঐ দ্বিতল গৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন? কেন ও নীলোৎপল বিনিন্দিত নয়ন যুগল অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশে অর্পিত হইয়াছে? যুবতী কি কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন? না, কোন অসহ্য মনোবেদনায় এতকাল পর্য্যন্ত সুখশয্যা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন? গৃহ মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এক খানি পর্য্যাঙ্কোপরি আর একটি রমণী নিদ্রিতা রহিয়াছেন। নিদ্রিতা বামা বিধবা। গৃহের নিচে দিয়া একটা শৃগাল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই কতকগুলা কুক্কুর কঠোর চীৎকার করিয়া উঠিল। বিধবার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি জানালার দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "ঠাকুরঝি শোবে না, রাত্রি অনেক হয়েছে যে।"

বাতায়ন-স্থিতা রমণী দেওয়ান গোবিন্দ রামের সহধর্ম্মিণী, নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ যাই—।"

বিধবা পাশ-মোড়া দিয়া বলিলেন, এস না, সারা রাত জাগিলে অসুখ হবে যে।

বিনোদিনী। হ্যাঁ যাই—।

বিধবা। আর দেরি করচ কেন? ঠাকুরজামাই এলে এতক্ষণ আসতেন। আজ আর তিনি আসবেন না। তুমি শোবে এসো।

বিনোদিনী। "হ্যাঁ যাই—"

বিধবা। "সে কি, তুমি কাঁদছ না কি?" বিনোদিনীর হৃদয়ে বড়ই যন্ত্রণা হইতেছিল, নানা প্রকার দুর্ভাবনা তাঁহার চিত্তপটে কতই অমঙ্গলের ছবি চিত্রিত করিতেছিল। বহুদিনের পর আজি তাহার স্বামী আসিবেন। তিনি এতক্ষণ তাঁহার আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিধবার কথা শুনিয়া তিনি আর মনের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিধবা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বিনোদিনীর হস্ত ধরিয়া পর্য্যঙ্কে আনিয়া বসাইলেন, এবং আপনিও তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। সম্মুখস্থ দীপালোকে তাঁহাদের উভয়ের অনিন্দ্য বদন কমল, যাহার পর নাই মনোহর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই যুবতী, উভয়েই সুন্দরী। পার্শ্বাপার্শি উপবিষ্টা হইলে বোধ হইল যেন একডালে একটি অর্দ্ধ মুকুলিত ও আর একটি পূর্ণ বিকশিত গোলাপ ফুল বিরাজিত রহিয়াছে। কি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য, কি অপূর্ব্ব শোভা! জগতে যত প্রকার সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় রমণী-সৌন্দর্য্যের নিকট সকলেই পরাস্ত। বিধবা নিজ বসনাঞ্চলে বিনোদিনীর মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি ভাই তুমি কাঁদছ কেন? ঠাকুরজামাই এলেন না বলে কাঁদছ? তুমিত বড় নির্ব্বোধ মেয়ে—কেঁদে তাঁর অকল্যাণ কর কেন? নৌকা ডিঙ্গির পথ জোয়ার ভাঁটার সুবিধা অসুবিধা আছে—বোধ হয় নৌকা এসে পৌছায়নি তাই তিনি এলেন না। তা আজ না আসেন কাল সকালে আসবেন। তার জন্য অত ভাবনা কি—কান্না কেন?"

বিনোদিনী। "বৌ আমার বড় মন কেমন করছে। আমার মনে কেবলই কু গাইছে। তিনি ভাল আছেন ত?" (পুনর্ব্বার তাহার নয়নযুগল জলে ভাসিয়া গেল।)

বিধবা। বালাই, ভাল থাক্‌বেন নাত কি, অমন অমঙ্গুলে কথা মুখে আনতে আছে,—ঠাকুরঝি কে যেন সদর দরজায় ঘা দিচ্চে না, তাইত দরজা ভেঙ্গে ফেল্লে যে—

বিনোদিনী। বাবাত বাইরে শুয়ে আছেন, তিনি কি এতই ঘুমিয়ে পড়েছেন?

বিধবা। রাত্রিত কম হয় নি। আহা বুড়োমানুষ অনেক রাত জেগে, বসে থেকে থেকে হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। তা এক কর্ম্ম কর প্রদীপটা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এস, আমিই গিয়ে দরজা খুলে দিচ্চি।

বিনোদিনীর মুখকমল প্রফুল্ল হইল, তিনি প্রফুল্ল অন্তরে দক্ষিণ হস্তে প্রদীপটি লইয়া আগে গিয়া ঘরের দ্বার খুলিলেন। বিধবা বিনোদিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাইত ঠাকুর

জামাইয়ের আর দরজা খোলবার দেরি সচ্চে না—দরজাটা ভেঙ্গে গেল যে।"

বিধবার কথায় বিনোদিনী কিছু লজ্জিতা হইলেন, তিনি ভ্রাতৃ জায়াকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। রমণীদ্বয় সিঁড়ি হইতে নামিয়া ক্রমে বহির্বাটীতে গেলেন। তাঁহারা যেমন উঠানে পদার্পণ করিলেন অমনি সজোর অঘাতে বহির্বাটীর দ্বারের একখানি কপাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল এবং যমদূতের ন্যায় বিকটাকার দুই জন পুরুষ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাদের সর্ব্বশরীর তৈল কালিতে অভিষিক্ত উভয়েরই হস্তে এক একটী বৃহৎ জ্বলন্ত মশাল ও এক এক গাছি সুদীর্ঘ যষ্ঠি; বামাদ্বয় অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিনোদিনীর হস্তস্থিত প্রদীপটি স্খলিত হইল। তাঁহারা দুইজনে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিনোদিনী স্বভাবতঃ কোমল প্রকৃতি, একে রাত্রি জাগরণে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার দেহ ও মন জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তায় আবার এইরূপ ঘটনায় তিনি ভয়ে ও নৈরাশ্যে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইলেন। বিধবাও হতবুদ্ধি হইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া বর্হিবাটীর দিকে চাহিয়া কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যে দুই বিকটমূর্ত্তি বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদের একজন দস্যু-প্রধান রত্নাপাখী ও অপর ব্যক্তি তদীয় অনুচর। রত্নাপাখী, বাটিমধ্যে প্রবেশ করিয়া, এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়িল ও ঝোড়োকে ঘাটি আগ্লাইতে বলিয়া সেই রমণীদ্বয় প্রতি ধাবমান হইল কিন্তু উপরে যাইয়া দেখিল, তাঁহারা ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়াছেন। তখন সে বাহির হইতে দ্বারের শিকল বন্ধ করিয়া পুনরায় বর্হিবাটিতে আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে একখানি খাটিয়ার উপর দেওয়ানের শ্বশুর বৃদ্ধ হলধর ঘোষ নিদ্রা যাইতেছিলেন। রত্নাপাখীর বিকট চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলেও ডাকাইত পড়িয়াছে জানিয়া তিনি ভয়ে জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রত্নাপাখী মশাল হস্তে বৃদ্ধের সম্মুখীন হইয়া বলিল। "ওরে বুড়ো ঐ, তোর সেই জামাইয়ের চাকর বেটা কোথা?"

বৃদ্ধ। আঁ—জামাই—

রত্না। হাঁ জামাই, তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়েছি, এখন তার চাকর আর বাক্স কোথা বল?

বৃদ্ধ। আঁ্যা—বা'ক্স—বা-বা আ-মি-ত কি-ছু-ই জা-নি না—

রত্না। তবে রে ব্যাটা পাজি, জানিস্‌নে? (প্রহার করিতে করিতে) বল্ বলছি কোথা বল?

বৃদ্ধ। দোহাই বাবা, আমি কিছুই জানি না, ভগবান জানেন, আমি কিছুই জানি না। বাবা এই চাবি দিচ্চি আমার যা কিছু আছে তোমরা নাও আমায় প্রাণে মেরো না।

রত্না। (চাবি লইয়া) আরে বেটা, তোর কি আছে তা নেব, সে বাক্সটা কোথা এখন বল?

বৃদ্ধ। বাবা—তোমার পায়ে পড়ি আমায় আর মেরোনা। বাক্স মাক্স আমি কিছুই জানি না বাবা।

রত্না। "বল্‌বি নি"—এই বলিয়া সেই

জ্বলন্ত মশাল বৃদ্ধের মুখে গুঁজিয়া দিল ও পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুনরপি একখানি বৃহৎ কষ্ঠের দ্বারা তাহার হাত পা ছেঁচিতে লাগিল। যখন দেখিল তাহাতেও তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল না তখন সেই অসমর্থ অসহায় বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া একটা গোগৃহের ভিতর প্রক্ষেপ করিল, বৃদ্ধ মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। গোয়ালের গাভীটি সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সেই জ্বলন্ত মশাল ও বিধুন্তুদ ব্যাপার দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং বলপূর্ব্বক দড়ি ছিড়িয়া হম্বারব করিতে করিতে পলাইয়া গেল। রত্না বাহির হইতে কবাট রুদ্ধ করিয়া সেই জ্বলন্ত মশাল দ্বারা ঘরের চালে আগুন লাগাইয়া দিল। চালের খড় ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। রত্নাপাখী পুনরায় অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া লুট পাট আরম্ভ করিল। বিধবা বাতায়ন হইতে বৃদ্ধ শ্বশুরের নিদারুণ নিপীড়ন ও যন্ত্রণা দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে বিনোদিনীর চেতনা হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু উন্মাদিনীর ন্যায় কেবল একদিক পানে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। রত্না, নিচের ঘরে যাহা কিছু বহুমূল্য দ্রব্যাদি পাইল, সংগ্রহ করিয়া একখানি বস্ত্র দ্বারা আপনার কটিদেশে বন্ধন করিয়া উক্ত দ্বিতল গৃহের দ্বারে পদাঘাৎ করিতে লাগিল। বারংবার পদাঘাতে কপাট ভাঙ্গিয়া গেল তখন সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর কণ্ঠহার ছিড়িয়া লইল ও বলিল যদি বাঁচিতে চাস্ তো বাক্স বাহির করিয়া দে। কিন্তু সে কথার কোন উত্তর না পাইয়া রমণীদ্বয়কে প্রহার করিতে করিতে বহির্বাটীতে লইয়া আসিয়া বলিল "দেখ্ ঝোড়ো সে চাকর আর সেই বাক্সটা কোথা যদি না বলে তাহলে এ বেটীদেরও গোয়ালে পুরে পুড়িয়ে মার্।" এই কথা বলিয়া রত্না ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করতঃ চপলা ক্রীড়াবৎ যষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। গোগৃহের চাল তখন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেই গৃহমধ্যে হতভাগ্য বৃদ্ধ প্রাণভয়ে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কি লোমহর্ষ্য ব্যাপার!

বিনোদিনী পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ধন্য বিধবার সহিষ্ণুতা, ধন্য তাহার সাহস তিনি এ অবস্থাতেও বিনোদিনীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ও তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীর গাত্রে অবশিষ্ট যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, ঝোড়ো তাহা খুলিয়া লইল, শেষে কর্ণাভরণ শীঘ্র খুলিতে না পারিয়া সজোরে তাহা ছিঁড়িয়া লইল। আহা অভাগিনীর কপোল বহিয়া দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ বসনাঞ্চলে সেই রক্তধারা মুছিয়া দিতে লাগিলেন।

এমন সময় "হায় কি করিলি পিশাচ" বলিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল। কাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে এ গম্ভীর বাণী বিনির্গত হইল? বিধবা এই শব্দেই ফিরিয়া চাহিলেন ও দেখিলেন দস্যুর স্কন্ধ হইতে কোটিদেশ পর্য্যন্ত দ্বিধা হইয়া ভূতলে পতিত

হইল। এ কাহার কার্য্য! এ বিপদ কালে কে আসিয়া সহায়তা করিল। বিধবা আবার দেখিল রক্তাক্ত অসি হস্তে উন্মত্তের ন্যায় এক ব্যক্তি আসিয়া বিনাদিনীকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া অন্তপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্যক্তি দেওয়ান গোবিন্দ-রাম। বিধবা, গোবিন্দরামকে চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রত্নাপাখী আপনাকে সহায়হীন দেখিয়া পলায়ন করিল। পরক্ষণেই ভীম সর্দ্দার আসিয়া পৌঁছিল।

ভীম সর্দ্দার দেওয়ানের অনুজ্ঞামত সেই প্রজ্জলিত গোগৃহ হইতে বৃদ্ধ হলধর ঘোষকে বক্ষে করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোগৃহ জ্বলিতে লাগিল, অগ্নিশিখা সর্পজিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিয়া গগনস্পর্শ করিতে লাগিল এবং কঠিন বংশগ্রন্থি সকল ফাটিয়া ফাটিয়া ভয়ঙ্কর শব্দোৎপন্ন করিতে লাগিল—সে রাত্রে—সেই ঘোর বিপদের রাত্রে—তাহার কোনই প্রতিকার হইল না।

প্রকৃতি।

১

সরস বরষা, শ্যামসুন্দর প্রকৃতি শোভা মনোহর তর।
সঘন গগনে, ঘন গরজি গম্ভীরে ধীরে চলে নিরন্তর।
জল ভারে জলধর, গাঢ়তর নীলভর,
ভয়ঙ্কর মাধুরী বিজরি বজ্রহাস্য, দৃশ্য বিরাট সুন্দর!
আহা মরি! হেরি এ নীরদ কান্তি, উথলি উঠিল হৃদে ভাবের সাগর।

২

ঝড় ঝড় তড় তড় গড় গড় শব্দে, বৃষ্টি ঢালে জলধর।
স্বন্ স্বন্ স্বনিছে সমীর ভীমোল্লাসে, পূর্ণ করিয়া অম্বর।
নদ নদী সরোবরে, জল থৈ থৈ করে,
খাল বিল ক্ষেত্র সব ভাসিছে পাথারে, দৃশ্য ধবল ধূসর।
দেখ দেখ, ঘনশ্যাম পত্রভারে দম্নীত তরুলতা শোভা কি সুন্দর।

৩

সর্ব্বত্র সলিলসিক্ত পশুপক্ষী সকলে আকুল জলে জলে,
জলচর মকর কুম্ভীর শুশুকাদি ভাসে ডুবে নদীজলে,
নূতন বরষা ভাবে, ভেক মক্ মক্ রাবে,
গাহিছে গভীর খাদে, ডাহুক ডাহুকী পাখী ডাকে কুতুহলে।
মনসুখে গলায় গলায় নব-দম্পতি সম্প্রীতি ভয়ে বিঞ্চিছে বিরলে।

৪

সকলি বিচিত্র! চিত্ত প্রমত্ত হইল ভাবে হেরি এ মাধুরী!
প্রাণের জড়তা কোথা পালাল, কি হ'ল মোর বলিব কি করি?
সঞ্জীবনী সুধাপানে, বিদ্যুৎ ছুটিল প্রাণে,
উঠিয়া বসিনু এই, কিসের ঔদাস্য? বিশ্বে কারে শঙ্কা করি?
প্রকৃতি গো! সংসারের সঙ্কীর্ণতা, পারে কি ভুলাতে মোরে তোরে যদি স্মরি?

৫

তুই গো মা, এ মৃতের অমূর্ত্ত প্রবাহময়ী সুখ তরঙ্গিনী।
তুই গো মা, কল্পনার সাগর, সৌন্দর্য্য, ভাব, বৈচিত্রের খনি।
তোমার বিশাল ভাবে, চিত্ত ডুবে যায় যবে,
সংসারের রঙ্গলীলা, খেলাধুলা প্রায় বোধহয় মা, আপনি!
মনে মনে, মানবের প্রভুত্ব, মহত্ত্ব লঘুত্বায় ঘৃণা হয় গো জননী।

৬

তোমার অনন্তরাজ্যে কে পারে ভ্রমিতে মাতঃ কাহার শকতি?
কিছু যদি পারে কেহ সেহ সফলতা, সেহ দুর্লভ শকতি!
অসংখ্য মানবমাঝে, কয়জন হেন আছে,
পারিবে বা পারিয়াছে চিনিতে প্রকৃতরূপে তোমারে গো সতি?
"তুমি আমি" চিনিব কি? চিন্তাকরি চিনিছে কি না চিনিছে কবি কুলপতি!

৭

কত ব্যাস, বাল্মীক, হোমর, কালিদাস তব দ্বারেতে ভিখারী।
দেবতা তাহারা ভবে, তোমার বিশাল গ্রন্থ স্পর্শ মাত্র করি।
তব শ্রীচরণ ভাতি, যে জন পেয়েছে সতি,
সেইত মানব জাতি করেছে পবিত্র, গোত্র গেছে ধন্য করি!
পৃথিবীতে, সেইত মানবকুলে মাননীয়, পূজনীয়, পারের কাণ্ডারী।

৮

বুদ্ধ, ইসা, রুশো আদি সাম্যের প্রচার কর্ত্তা তোমারি কৃপাতে।
বাল্মীক, হোমর, ব্যাস, কালিদাস, "মহাকবি" তোমারি দয়াতে।
গ্যাললিও নিউটন, প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ,
শঙ্কর, ভাস্করাচার্য্য, জ্ঞানী চূড়ামণি তাও তব কটাক্ষেতে।
ভীমার্জ্জুন, সেকন্দার, সিরাজাদি, তব পদরেণু স্পর্শে বীরসংসারেতে।

৯

তোমার কৃপার কণা যে জন কিঞ্চিৎমাত্র পায়গো জননী
লোকাতীত অনুকূল উন্নত প্রশস্ত পথ, পায় সে আপনি।
সেই এই পৃথিবীতে, অসংখ্য মানব হতে,
জ্ঞান, বুদ্ধি, পরাক্রম, সাহস, সম্ভ্রমে, হ'য়ে থাকে চূড়ামণি।
সকলেই জীবিতে যদিও তারে নাগনে, না চিনে, কালে চিনিবে আপনি।

১০

সংসারে চতুর, ক্রূর, বঞ্চকগণের প্রভুত্ব ভীষণ।
সহসা তাদের কাছে তোমার সেবকজন না পায় আসন।
নানা সংগ্রামের পরে, পরীক্ষা অনলে পুড়ে,
অকালে জীবন লীলা সম্বরিয়া প্রায় পায় অনন্ত জীবন।
কেহ কেহ সে নীচ শৃগাল দিগে বধে সিংহবলে, সাধে উদ্দেশ্য আপন।

১১

চন্দ্রের আলোকে যথা কুক্কুর চীৎকার করি ছুটাছুটি করে।
গুণের সৌন্দর্য্য প্রভা হেরিয়া তদ্রূপ নীচ পরিতাপে মরে।
কত শত মহাত্মারে, অনাদরে অবিচারে,
পামরেরা বধিয়াছে, দিয়াছে যন্ত্রণা, এই মানব সংসারে।
ইতিহাসে তাহাদের এ কুখ্যাতি রহিবে রক্তেতে লিখা, কে মুছিতে পারে?

১২

কে মুছিতে পারে তব ক্ষণজন্মা পুত্রদের কীর্ত্তিপট লেখা?
কালের ললাটপটে অনল অক্ষরে যাহা, হইয়াছে লিখা।
যে যাহা ক'রেছে ভবে, অবশ্য বিচার হবে!
ন্যায়ান্যায় মানবের সূক্ষ্ম চালনীতে কালে যায় সব ছাঁকা।
তাহাদের বুদ্ধি, হৃদি, বিবেকাদি অন্ধ নহে, সত্যাসত্য যায় তায় দেখা।

১৩

যা কিছু ঘটিয়া থাকে সকলের সব তুমি প্রকৃতি ঈশ্বরী।
অনুকূল প্রতিকূল কাহার যে কিবা তাহা বুঝিতে না পারি।
তুমি যারে দয়াকর, সেই জন হয় বড়,
কিন্তু তারে ঘোরতর বিপদের পরীক্ষায় লও শুদ্ধ করি।
কদাচিৎ সচ্ছন্দে সফল কাম হ'য়ে থাকে কেহ, তাও দেখি শুভঙ্করী।

১৪

সকলি বিচিত্র! মাতঃ তোমার করণ কথা বুঝে সাধ্য কার?
তত্বমসী, সত্য তুমি! সর্ব্বত্র প্রকাশ, পৃথ্বী একাংশ তোমার।
আকাশ আসন পরে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যুড়ে,
বিশাল সুন্দর কায়া চন্দ্র সূর্য্য, তারকা ভূষিত চমৎকার!
ত্রিকাল ত্রিনেত্র, দশদিক দশবাহু, বিশ্বময়ি! তব মহিমা অপার।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মধুযামিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাহক হিঙ্গনার পিতৃভবনে একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে আসিয়া অরুণার কথা সকল উদয়গিরিকে বলিলে, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; এবং এ সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে কর্ম্মস্থল হইতে অবকাশ লইয়া বাটী যাত্রা করিলেন।

তিনি বাটী যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাহককে পুনরায় ডাকিয়া কুমারের রূপ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বাহকও পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিল যে তিনি দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ও তাঁহার বয়সও নবীন, এবং হিঙ্গনা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বাহকের কথায় তাঁহার পূর্ব্বাবধি ভয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় বলবৎ হইল। উদয়গিরি দেখিলেন যে তাঁহাকে রূপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তিনি এ যুদ্ধে, বাহক যেরূপ কহিতেছে, অপ্রস্তুত; তথাচ ভাবিলেন বেশভূষাদিতে তিনি অবশ্য ভালই দেখাইবেন, কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না যে তিনি বাহককে জিজ্ঞাসা করেন যে কুমার তাঁহার অপেক্ষাও সুশ্রী কি না; কেননা এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার আত্মাভিমানের খর্ব্বতা হইতে পারে। বাহক চলিয়া গেলে তিনি পুনঃ পুনঃ দর্পণে আপন মুখছবি দেখিতে লাগিলেন, দেখিয়া একবার বা সন্তুষ্ট একবার বা অসন্তুষ্ট, একবার বা আশ্বাসিত একবার বা হতাশ হইতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ ফল দূর রহিলে আশা মনুষ্য হৃদয় একেবারে পরিত্যাগ করেনা, উদয় সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আয়োজন কুমারের ন্যায় নহে। সুমধুর বংশি-ধ্বনি, স্বীয় দীনতা প্রকাশ, সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ, সরল দাক্ষিণ্য প্রভৃতি তাঁহাতে কিছুই নাই, তিনি আপন বেশ ভূষা, উত্তমোত্তম সামগ্রী ও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত একত্র করিয়া পুনঃ পুনঃ যতই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে ততই বিশ্বাস হইতে লাগিল যে তিনি অবশ্য জয়ী হইবেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বালিকা-হৃদয়-দুর্গ অতি কঠিন নহে, তবে শত্রু শুনিতেছি প্রবল। সম্মুখ সমরে তিনি পরাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু সমরের অবশ্যতা কি? কুমার একজন দুঃখীজন, অর্থ ও কৌশলে সুহৃদ-ভেদ ও সন্ধি স্থাপন হইতে পারে। হতবুদ্ধি উদয়! তিনিও অপরাপর ধনী জনের ন্যায় ভাবিলেন প্রণয় নিতান্ত অর্থ-সাধ্য, যদি সংসারে তাহাই হইত, তাহা হইলে নির্ম্মল দাম্পত্য প্রেম স্বর্ণ-অট্টালিকা অতুচ্চ প্রাসাদ সকল সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে স্বীয় স্বর্গীয় বিভা বিস্তার

করিত না। কমলিনী বৃহৎ হ্রদ ও প্রশস্ত জলাশয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সামান্য সরোবর অলঙ্কৃত করিত না।

উদয়গিরি বস্ত্র, অলঙ্কার; ও নানা প্রকার তৈজসাদি সংগ্রহ করিয়া বাটী যাত্রা করিলেন।

এদিকে মান্দালা প্রদেশে এ বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়ায় ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হয় নাই। তত্রস্থ লোক সকলেই হা-হা-করিতেছে। পথঘাটে দুই তিন জন একত্র হইলেই শস্য ভিন্ন অন্য কোন্ বিষয়ের কথা কহে না। যে শস্য জন্মাইয়াছে বৃষ্টি অভাবে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি হইলে অনেক রক্ষা হয়। সকলেই কাতর সকলেই ভাবী অন্ন কষ্ট-ভয়ে ব্যাকুল-চিত্ত। ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্য সকলকেই পূজার জন্য উপদেশ দিতেছেন, দেশের প্রধান লোক তাঁহারই মতের অনুগত হইতেছেন। এমন সময়ে কুমার যে চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে হিঙ্গনার পিতা ও মাতা পরম সুখী হইয়াছেন, বিশেষতঃ উদয়গিরির বাটী ফিরিয়া আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী।

কুমারের ভগিনীর পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। হিঙ্গনা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। কোন দিন বা কুমারের লোক আসিয়া যথাবিহিত সম্মান সহকারে তাঁহার ভগিনীর পীড়ার সংবাদ দিয়া যায়, কোন দিন বা কেহ আসে না, না আসিলে হিঙ্গনা সেইদিন ক্ষুণ্নমনে আস্তে আস্তে বাটী ফিরিয়া আসেন।

হিঙ্গনা কুমারের জন্য প্রতিদিন পর্ব্বতদেশে একাকিনী দণ্ডায়মানা হইয়া সজল নয়নে যোড় করে অস্তগামী সূর্য্যদেব ও ঘনশ্যামদেবের নিকট একান্ত হৃদয়ে কুমারের ভগিনীর পীড়া উপশমের জন্য প্রার্থনা করেন। অরুণা ইহা গোপনে দুই এক দিন দেখিয়া ছিলেন। নিষ্ঠুরা এক্ষণে বিবেচনা করিল হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়া পরিচয় দিবার ও শস্য হানি তাহারই কর্তৃক হইতেছে ইহা ব্যক্ত করিবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি এই ভাবিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার নিকট গিয়া গোপনে এ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব করিবেন এবং কাহার সহায়তা সাপেক্ষ করিয়া মনোভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারিবেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্যকে প্রথমে প্রতীত করিতে পারিলে তিনি এই অভিসন্ধিতে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন। তিনি এইরূপ স্থির সংকল্প হইয়া একদা সন্ধ্যা অতীত হইলে গোপনে ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্যের নিকট যাইলেন। আচার্য্যের বয়ক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর, তিনি দেখিতে কুশ্রী নহেন, তাঁহার বর্ণ গৌর, মুখের লাবণ্য আছে। তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র, চক্ষু দুটী বিশাল নহে, নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে, অবয়ব কিছু স্থূল। আচার্য্যগণ বিনা পরিশ্রমে নিত্য প্রচুর আহার পান বলিয়া প্রায়ই ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া থাকেন, ইনি বা অন্যরূপ হইবেন কেন? সন্ধ্যার পর অরুণা তাঁহার নিকট সভয়ে যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, তিনি হাস্য মুখে সুমিষ্ট বচনে তাঁহাকে নিকটে বসিতে বলিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন অল্পবয়স্কা অরুণা এরূপ সময়ে তাঁহার নিকট কিহেতু আসিয়াছেন,

হয়ত উত্তম স্বামীর জন্য দেবতার নিকট কামনা জানাইতে আসিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয় সেবক জনোচিত লোভ-দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ অরুণার নবীন দেহের প্রতি চাহিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণে! কি কামনা করিয়া আসিয়াছ?"

অরুণা। দেশে এ বৎসর শস্য হয় নাই, সকলেই হা—হা—করিতেছে, আপনি কি জানেন কি হেতু হইতেছে?

আচার্য্য। (সবিস্ময়ে) না, কি কারণ হচ্চে?

অরুণা। সে অতি গুপ্ত কথা—

আচার্য্য। বলনা।

অরুণা। আপনি শপথ করুন্ আমি যাহা বলিব তাহা কাহারও নিকট বলিবেন না, যদি বলেন, আমার নাম করিবেন না।

আচার্য্য। অরুণে! আমি তোমারই শপথ করে বল্‌চি তোমার নাম করিব না।

অরুণা। হি—হিঙ্গনা ডাইন; তা—রই হইতে এই বৃষ্টি হচ্চে না, সে—প্র—প্রতিদিন পর্ব্বতে উঠে মন্ত্র পড়ে।

আচার্য্য হিঙ্গনাকে জানেন। তাঁহার রূপের প্রশংসা তিনি প্রতিদিন মনে মনে শত শতবার ক'রে থাকেন। তিনি যে ডাইন হয়েছেন, একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অরুণে! তুমি আমাকে দেখাতে পার?"

অরুণা। হাঁ—আমি না দেখিয়া কি বল্‌চি।

আচার্য্য। আমি শুনিয়াছিলাম কুমার নামে একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী পুরুষ তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া তাঁহার বাটীতে কাজ কর্ম্ম করিতেছে, এক্ষণে সে কোথায়?

অরুণা। (হাসিয়া) সেইত হিঙ্গনাকে মন্ত্র শিখিয়ে এখন সরে দাঁড়িয়েছে।

আচার্য্য। কি বল্লে?

অরুণা। এখন ভগিনীর ব্যাম হয়েছে বলে পালিয়েছে। আমি শুনিছি ও মন্ত্র একবার শিখ্‌লে আর থাকৃতে পারে না; তাই সন্ধ্যাবেলা পর্ব্বতের উপর গিয়ে দেশের অমঙ্গল করে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে "কুমারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি যদি আসে," কিন্তু আমি ত কাহাকেও দেখিনি।

আচার্য্য। তাও ত হতে পারে?

অরুণা। তা—হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞ বিজ্ঞ করে আপনার মনে কি বলে?

আচার্য্য। তা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর না?

অরুণা। করেছিলুম' কিছু বলে না, হেঁসে পালিয়ে যায়।

আচার্য্য। আমি যদি ডাইন বলে হিঙ্গনাকে ধরিয়ে দি তা হলে তোমার দুঃখ হবে না?

অরুণা। দুঃখ—দুঃখ কেন? তা হলেইত ভাল হয়, কেন মন্দ সকলকার করবে?

আচার্য্য। তবে তোমার দুঃখ হবে না!

অরুণা। না—পোড়ারমুখীর জন্য আমার আবার দুঃখ হবে!

আচার্য্য ভাবিলেন যে হয়ত অরুণার কোন স্বার্থসাধনের ইচ্ছা আছে, না হইলে সুন্দরী হিঙ্গনাকে কেন এরূপ অপবাদ দিবে, বা সে যথার্থই ডাইন হইয়া থাকিবে; যাহা হউক, অরুণার যদি ইহাতে স্বার্থ-সাধন হয়, তাহা হইলে আমিই বা কেন নিজ স্বার্থ-ত্যাগ করি? যদি অপবাদ প্রকৃত অপবাদই, তা হলে হিঙ্গনাও কোন

না আমাকে বশে রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইবে, অন্ততঃ উপস্থিত বা অকারণ ত্যাগ করি কেন, তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, "অরুণে! যদি হিঙ্গনা প্রকৃত ডাইন হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি সকলকে বলিব, কিন্তু আমি যে এই কাজ কর্‌বো, তুমি আমাকে কি দিবে?"

অরুণা। কি দিব?

আচার্য্য। (হাসিয়া) আমি অন্য কিছু চাহি না।

অরুণা। তবে কি?

আচার্য্য। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে দিতে পার্‌বে।

অরুণা। কি জিনিস বলুন না?

আচার্য্য। জিনিস না।

অরুণা। বলুন না?

আচার্য্য। তোমার মত সুন্দরীর কাছে আর কি প্রার্থনা কর্‌ব?

অরুণা। (সভয়ে) বলুন না?

আচার্য্য। প্রত্যহ এই সময়ে আসিয়া তোমার ঐ সুন্দর মুখের একটী চুম্বন আমাকে দিতে হবে; না দিলে আমি এ কার্য্য কর্‌তে পার্‌ব না, আর আমি হিঙ্গনাকে বলে দিব।

অরুণা বিপদে পড়িলেন। প্রার্থনায় সম্মতি না দিলে দুই দিকেই বিপদ, অগত্যা ভাবিলেন গোপনে নিত্য একটী চুম্বন মাত্র চাহিতেছে, তাহাতে দোষ কি? অবশেষে নত বদন হইয়া কহিলেন "দিব।" আচার্য্য সম্মতি পাইয়া সম্মোহে একটী স্থানে শত চুম্বন স্থাপন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

আর্য্যোন্নতি সভার

নগর-কীর্ত্তন।

প্রতি বৎসর শীতকালে কলিকাতায় নানা প্রকার রংতামাসা, নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক ও বিবিধ ধরণের মহোৎসব হইয়া থাকে। পাঠক এবার এক নূতন ধরণের তামাসার কথা শুন। এ প্রকার অদ্ভুত আমোদজনক ব্যাপার বোধ হয় কেহ কখনও দেখ নাই। কার্ত্তিকী সংক্রান্তি-রাত্রি প্রভাত হইলে, পূর্ব্বদিক আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইলে; এবং কাক, চিল, চটক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ কোলাহল আরম্ভ করিলে একটী সুগম্ভীর ভোরঙ্গ রব শুনা গেল, পরক্ষণেই ঠনাস্ করিয়া পেটাঘড়ি রাজিয়া উঠিল, তৎপরেই ঝাঁঝরের ঝঞ্জন নিনাদ শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ঠ হইল। এমন সময়ে এরূপ বাদ্য শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল; কি হইতেছে দেখিবার জন্য মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। অমনি তাড়াতাড়ি একখানি র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাটির বাহিরে আসিয়া দাড়াইলাম। দেখিলাম ট্যাঁকশালের সম্মুখে ছিপে খাটান কতকগুলি রাঙ্গা নিশান ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। ভাবিলাম কাহাদের নগর-কীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তক সম্প্রদায় নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিলাম

গায়কগণ সকলেই যুবাপুরুষ, তাহাদের অনেকেরই দাড়ি ও চক্ষে নানা রকমের চস্মা। এ কি, এত অল্প বয়সে এদের চাল্‌শে ধরিল কেন? আবার তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও চমৎকার, কাহার সহিত কাহারও মিল নাই, কেহ মোগলের, কেহ পাঠানের, কেহ কাফ্রীর, কেহ ফিরীঙ্গীর কেহ যীহুদীর, কেহ বা পাঞ্জাবীর বেশধারণ করিয়াছে, কেহ ধূতি, কেহ সাড়ী, কেহ ইজের, কেহ পেন্টালুন যাহার যাহা মনে হইয়াছে সে সেই প্রকার পরিচ্ছদ পরিয়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছে। বস্তুতঃ বাউলের দলের পোষাক ও এ প্রকার বিচিত্র ও কৌতুকাবহ নহে।

দেখা দিল এক দল যুবক সুন্দর।
সুবেশ সুকেশ ধারী প্রফুল্ল অন্তর।
চশমা নয়নে কার, কার মুখে দাড়ী।
কার ফিরাঙ্গীর সাজ, কেহ পরে সাড়ী,
সবাই বাঙ্গালী কিন্তু বিভিন্ন পোষাক
দেখে শুনে যত লোক হইল অবাক।

কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু বালক ডিউক্ অভ্ এডিন্‌বরার অধীনস্থ সেলারদের ন্যায় পোষাক পরিয়া এক এক গাছি লাঠী বুকের উপর উচ্চ করিয়া ধরিয়া পর পর দুই ছত্রে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তনকারীদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতে ছিল। তাহাদের টুপীর সামনে রৌপ্যাক্ষরে "আর্য্য ফৌজ" লেখা ছিল। এই সম্প্রদায়ের অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া একজন দর্শক জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মহাশয় আপনাদের কিসের দল?" আর পোষাক পরিচ্ছদ এপ্রকার কেন? দলভুক্ত এক ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "ঐ নিশানে কি লেখা আছে দেখ, আমাদের "মটো" পড়িলেই সব বুঝিতে পারিবে।" তিনটি সবুজবর্ণের নিশানে স্বর্ণাক্ষরে তিনটি কথা লিখা ছিল। একটি "স্বাধীনতা" আর একটি "সমাজ বিপ্লব" ও অপরটি "নাস্তিকতা"। দলের লোক যে নিশানটি দেখাইয়াছিল সেটি স্বাধীনতা শব্দাঙ্কিত হাব্‌সীর ন্যায় পোষাকধারী খুব কাল মুস্ক একজন জোয়ান পুরুষ সেই পতাকা ধারণ করিয়াছিল। প্রশ্নকারী লেখাটি পাঠ করিয়া বলিল, মহাশয় স্বাধীনতার সহিত পোষাক বৈষম্যের কি সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে পারিলাম না। দলস্থ ব্যক্তি উত্তর করিলেন আপনি বোধহয় তবে স্বাধীনতা শব্দের অর্থ বুঝেন না। আমার যাহা ইচ্ছা হইবে আমি অবাধে ও নির্ভয়ে যদি তাহা করিতে পারি তবেই আমি স্বাধীন হইলাম, স্বাধীনতার এই প্রকৃত অর্থ। সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেইরূপ পোষাক পরিধান করিয়াছি। আমরা লোককে বুঝাইতে চাই যে স্বাধীন ভাবে আমরা সকল কার্য্য করিব—আমরা লোক নিন্দার ভয় করি না, অবমান ও প্রহারের ভয় রাখিনা ও বাগদ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত আছি। যে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, বা করে সেই স্বাধীন এবং যে স্বাধীন সেই সুখী। সুখী হইতে হইলে অগ্রে স্বাধীন হওয়া চাই। পরাধীনের সুখ কখন সম্ভবে না। সেই ব্যক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস হইল না, মনে মনে বলিলাম তবে পশু সমাজে গিয়া বাস কর, তোমাদের স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচারিতা বা পাশব-স্বাধীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংকীর্ত্তকগণ মহোল্লাসে ও মহোৎসাহে নৃত্য ও গান করিতে করিতে ক্রমে জগন্নাথের

ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘাড় ছাটা সিঁথিকাটা সাহেবি ধরণের দাড়ি কামান প্রজাপত্তির ন্যায় পোষাকধারী এক যুবা—যিনি "সমাজ বিপ্লব" পতাকা বহন করিতে ছিলেন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "বল জয় বঙ্গবামার জয়, জয় স্ত্রী স্বাধীনতার জয়" অমনি দলস্থ সকলে যুগপৎ তারস্বরে বলিয়া উঠিল "জয় বঙ্গবামার জয়, জয় স্ত্রী স্বাধীনতার জয়।" প্রাতঃস্নানকারিণী ভদ্র গৃহস্থ কুলকামিনীগণ সেই চিৎকার শব্দে চমকিয়া উঠিল ও ঘাটের উপর একদল পুরুষ দেখিয়া ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কেহ স্নান সমাপ্ত না হইলেও উঠিয়া একপার্শ্ব দিয়া প্রস্থান করিল। অতঃপর সমাজ-বিপ্লব-পতাকাধারী গঙ্গাবাসী এক পাণ্ডার একটা বাক্সের উপর উঠিয়া পতাকাটি উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিল এবং কীর্ত্তনকারীগণ এই গীতটি গান করিতে লাগিল—

সতী হ'তে বঙ্গবামা কেন এত বাসনা?
পতিসেবা দাস্যবৃত্তি জীবনে বিড়ম্বনা।
স্বামী ধরে কেন থাক?
কেন স্বামী বলে ডাক?
তুমি দাসী,তিনি স্বামী এ যে বড় লাঞ্ছনা!
কেহ কার নহে স্বামী
তুল্য মূল্য তুমি আমি
নর-নারী ভেদ জ্ঞান, কুটিলের কল্পনা।
অতএব বামাগণ
হয়ে সবে এক মন
আমাদের সঙ্গে চল, হবে সবে স্বাধীনা।

গীত সমাপ্ত হইলে সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "জয় স্বাধীনতার জয়" "জয় স্বাধীন প্রেমের জয়" আমরা পূর্ব্বে যে অজাতশ্মশ্রু আর্য্য-ফৌজের উল্লেখ করিয়াছি, সেই তরুণ সৈনিকগণ পুনর্ব্বার ছড়ি কাঁধে করিয়া সারি দিয়া দাড়াইল এবং হাবসী বেশধারী বীরপুরুষ তাহাদের সাম্নে আসিয়া স্বাধীনতা পতাকা উচ্চ করিয়া বলিল :—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?"

সৈনিকগণ খালাসীদিগের কাছিটানা সুরে বলিয়া উঠিল—

"আজু বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা"

পতাকাধারী।—

"দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

সৈনিকগণ।—

"আজু বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা"

পতাকাধারী।—

"কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।"

সৈনিকগণ।—

"আজু বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা।"

পতাকাধারী।—

"দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।"

সৈনিকগণ।—

"আজু বলা হেল্লেসা, হেল্লেসা, হেল্লেসা।"

পতাকাধারী।—

হাঁ বঙ্গমহিলাগণ হাঁ, ইহা সত্য কথা, এক দিনের স্বাধীনতায়ও স্বর্গ সুখ পাওয়া যায়। আহা স্বাধীনতা কি সুখের সমগ্রী! কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা সে সুখে বঞ্চিত, সেই স্বাধীনতারূপ অমৃত তোমরা একদিনের তরেও আস্বাদন করিতে পারিলে না। হাঁ বঙ্গবামাগণ হাঁ, স্বাধীনতায় যে কি সুখ তাহা তোমরা একদিনের জন্য

ও জানিলে না। কেন তোমরা চিরদিন পরাধীনা হইয়া থাক? কেন তোমরা পুরুষের অধীনতা স্বীকার কর? কেন তোমরা পতির দাসী হইয়া থাক? কিসের জন্য? অন্নবস্ত্রের জন্য? কেন তোমরা কি উপার্জ্জনে অক্ষম? কেন, তোমাদের কি হাত, পা, নাক, চোক নাই? তোমরা কি খাটিয়া খাইতে পার না? যথার্থইকি তোমাদের শরীরে বল শক্তি নাই? কে বলে তোমরা অবলা? একথা যে বলে সে তোমাদের পরম শত্রু, সে মূর্খ। তোমরা এখন লেখা পড়া শিখিয়াছ, যদি আমাদের দর্শনশাস্ত্র দেখ, আমাদের আর্য্য সভার সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, যদি পড়, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে তোমরা কখনই পুরুষ হইতে হীন বল নহ। তোমাদের ভর্ত্তৃগণ, সেই স্বার্থপর বাঙ্গালিগণ তোমাদিগকে চিরদিন দাসী করিয়া রাখিবে বলিয়াই তোমাদিগকে হীনাবস্থায় ও হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। আর কতদিন তোমরা সেই স্বামীর কঠিন শাসনে থাকিবে? কেন তোমরা চিরদিন দাস্যবৃত্তি করিবে? তোমাদের হৃদয়ে কি একটু তেজ নাই? মনে কি একটু অহঙ্কার নাই? আইস স্বাধীন হইবার চেষ্টা কর দুই পদ অগ্রসর হও, আমাদের সহিত যোগ দাও, আমরা তোমাদের পরাধীনতা বিমোচন করিব। তোমাদের সকল দুঃখ ও সকল যন্ত্রণার শেষ করিব তোমরা স্বর্গসুখ লাভ করিবে।

ক্রমশঃ

শোকোচ্ছ্বাস।

১

হৃদয়ের দূরে—অতি দূরে
ছিল শোক ঘুমাইয়া,
কে দিল রে জাগাইয়া?—কাল!
ঘুমন্ত শোকেরে কাল কেন জাগাইল?
হৃদয়ের মর্ম্মে কাল বজ্র নিক্ষেপিল—
প্রাণ আঘাত পাইল,
শোক তাই রে জাগিল।
মর্ম্মাহত হৃদয়ের দাঁড়ায়ে একটি ধারে
মর্ম্মাহত প্রাণে
কাঁদিয়া উঠিল শোক ঝর ঝর অশ্রুধারে
চেয়ে শূন্য পানে।
হাহাকার—কোলাহল
পূরিয়াছে শূন্যতল,
অসংখ্য চোখের জল
ধায় প্রস্রবনে;
অনন্ত বিষাদ রেখা
ফুটে ফুটে দেয় দেখা
নয়নের অশ্রু মাখা
অসংখ্য বদনে।
শূন্যতার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করি'—
কি এক বিলাপ-রব ফুকরি' ফুকরি,'
বহু কণ্ঠে উথলিয়া
গড়াইয়া গড়াইয়া
মিশি'ছে বাতাসে,
শুনিয়া কাঁদিল শোক লুটিয়া হতাশে।

২

কি বলে বিলাপ রব?-"হা কেশব!-হা কেশব!
প্রকৃতির প্রিয়তম প্রাণের কুমার
উজ্জ্বল আলোকে ঢালি' গভীর আঁধার
লুকা'লে কোথায়?
জননী প্রকৃতি-ক্রোলে
বসিয়া ভাবের ভোলে,
প্রাণের কপাট খুলে,
আনন্দে দু'হাত তুলে,
'হরি নাম' মহালোকে
আলোকি' ধরায়,
আপনি লুকা'লে ঘোর আঁধার ছায়ায়!
আধার আধার দিয়া
কোথা গেলে পাসরিয়া
আঁধার-আচ্ছন্ন প্রাণ পাতকি নিকরে?
কে ঢালিবে 'হরি নাম' শ্রবণ ভিতরে?

৩

পৃথিবীর পাপী হ'তে, আরো কোন খানে
হেরিলে কি মহাপাপী,
হ'য়ে তাই পরিতাপী
ছাড়িলে এ পাপ ধরা, মুকুলিত প্রাণে?
এসব পাপীরে ফেলে, সে সবে তারিতে গেলে,
কে তারে এখানে?
তোমারে হারা'য়ে আজ
কি ভিক্ষু, কি মহারাজ,
হাহাকারে কাঁদে, প্রাণ মিলাইয়া প্রাণে,
বহু প্রাণ এক আজ তোমার ধেয়ানে।

৪

"হা কেশব! হা কেশব!"
এই হাহাকার রব
ঘরে ঘরে ওঠে;
বুকের ভিতর দিয়া
কিএক যাতনা গিয়া
প্রাণে বড় ফোটে!
"হা কেশব! হা কেশব!"
এ রবে স্তম্ভিত সব
একটী কেশবে যেন সকলই ছিল—
একটি কেশব গিয়া
সবি ফুরাইল।
কি হিন্দু, কি মুসলমান,
কি য়ীহুদি, খৃষ্টীয়ান্,
কি বা ব্রাহ্ম, কি বা বৌদ্ধ—
যে যেখানে ছিল—
যে জানিত—কে কেশব, সেই হারাইল।
হারাইয়া কেশবেরে, হারাইল আপনারে
পাপিনয়ী ধরা,
পাপ যাইবার মুখে, আবার চাপিল বুকে
পাতকের ভরা।
কে শুনা'বে 'হরিনাম?'—ধরণী কাতরা!

৫

পাতকের অন্ধকারে পুণ্যের তপন সম
উদিত হইয়া জীব-হৃদয়-আকাশে
কালরূপ মেঘ গ্রাসে সহসা গ্রাসিত হ'লে
মাটীতে মিশিল দেহ, জীবন বাতাসে।
কে বলে মাটীর তুমি? জীবন বাতাস তব?
নহ তুমি ইহলোকে সামান্য মানব;
পৃথিবীর বহু কোটি মানব মণ্ডলী-মাঝে
নাহি মিলে তব সম একটি কেশব।
আধ্যাত্মিক ভাবে ভরা, পরমেশে প্রাণে ধরা
'হরি নামে' পাপ ধরা নিষ্পাপ করিতে
ক' জন হেথায় আসে সহস্র কোটিতে?
হেন জনে হারাইয়া, পৃথিবী, পৃথিবীবাসী
কি না হারাইল?
এই বড় মনস্তাপ, বাড়িল কলির দাপ,
ধর্ম্ম ফুরাইল।

শ্রীরাজ কৃষ্ণ রায়

৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

(অদ্ভুত স্বপ্ন।)

যুবতী নিবিষ্টচিত্তে "বঙ্গবামা" পাঠ করিতেছে।

অদ্ভুত স্বপ্ন।

স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তোমাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখি বলিলে। ইহা কি পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলে না নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিলে? তোমারা কি ইচ্ছামত গ্রামস্থ প্রতিবেশী দিগের বাটিতে গমন করিয়া থাক না? না দূরস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাও না? তোমরা কি নিমন্ত্রন রক্ষা বা কোন প্রকার আত্মীয়তা রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন গ্রামে পদব্রজে আত্মীয় ভবনে গমন কর না? না তীর্থ-দর্শন ও গঙ্গাস্নান করিবার জন্য দূরতম স্থানে যাইতে পাও না? কলিকাতা বা তদ্রূপ সমৃদ্ধ নগরীতে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা একগৃহ হইতে অন্যগৃহে যাইবার সুবিধা হয় না বলিয়া সেই সেই স্থানের স্ত্রীজাতিরা নিজ অন্তঃপুরে অধিক আবদ্ধা। অনভিজ্ঞ গ্রন্থকারগণ তাহা দেখিয়া সর্ব্বত্র ঐ বিধি কল্পনা করিয়াছেন। তোমরা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ঐ বিষয় পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতেছ ইহাই আশ্চর্য্য! ইহাকেই "কাকে কান লইয়া গেল শুনিয়া নিজের কানে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ দৌড়ান বলে না?"

"সত্য বটে আমরা অন্য লোকের অন্তঃপুরে যাইতে পারি, কিন্তু আমরা তোমাদের মত যেখানে সেখানে যাইতে পারি না কেন? তোমরা ত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও! তবে আমরা যাইতে পাই না কেন? আমাকে বাজারে যাইতে দিয়া থাক? কোন প্রকাশ্য স্থানে একাকী যাইতে দেও?"

"যে কথা বলিতে হয়। তাহা বিবেচনা করিয়া বলিতে হয়। তুমি বলিলে আমরা যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারি কিন্তু একথা কি সত্য? আমরা কি অন্যের অন্তঃপুরে যাইতে পারি? আমরা যেমন স্ত্রী মহলে যাইতে পারি না, তোমরাও সেইরূপ পুরুষ মহলে যাইতে পার না। ইহাতে উভয়ের প্রতি ভিন্ন নিয়ম হইল কি প্রকারে? হাট বাজার সর্ব্বত্রই পুরুষদিগের গমাস্থান এইজন্য সে সকল স্থানে গেলে পুরুষদিগের স্থানে যাইতে হয় বলিয়া তোমাদের গমন নিষেধ। সেইরূপ যে সকল স্থানে স্ত্রীজাতি অবস্থান বা গমনাগমন করে তথায় পুরুষদিগের গমন নিষেধ।

আমি যদি স্ত্রীসমাজে নিয়ত গমন করি. তুমি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর? আমার প্রতি কি তোমার সন্দেহ হয় না? তাহা যদি হয়, তবে পুরুষ সমাজে গেলে তোমার কি দোষ আসিবে না? এ নিয়মে ত পক্ষপাতত্ব কিছু দেখা যায়

না। নিয়ম সমতা যে স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি বর্ত্তিতেছে। যদি এমন বিধান হইত যে পুরুষ স্ত্রী সমাজে ইচ্ছা মতে ভ্রমণ করে অথচ স্ত্রী পুরুষ সমাজে যাইতে পায় না তাহা হইলে অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব হইত।"

"ইহাতে কি সমতা বিধান হইল? তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্র কত প্রশস্ত আর আমাদের বিচরণ ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পৃথিবীর পোনের আনা তোমাদের অধিকৃত। ও এক আনা আমাদের অধীকৃত। ইহাকেই কি সমতা বলে? যৎকিঞ্চিৎ স্থানে আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া সমস্ত স্থান আপনাদিগের অধিকারে রাখাকে কি পক্ষপাতিত্ব বলে না! সমতা বলে—ইহাই আশ্চর্য্য।"

"আমার বোধ হয় একথা সকল দিকে দেখিয়া বিবেচনা করিয়া বলা হয় নাই। কেননা এক দিকে যেমন এই বৈষম্য রহিয়াছে অন্য দিকে ইহার বিপরীত বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই বৈষম্য হইতেই এই বৈষম্যের উৎপত্তি।

সে বৈষম্য কি বুঝিয়াছ কি? আমাদের যত কার্য্য আছে তাহার পোনেরআনা কার্য্য পুরুষে করে এক আনা মাত্র স্ত্রীজাতি সম্পন্ন করে। যাহা কিছু বলের কার্য্য, যাহা কিছু সাহসের কার্য্য, যাহা কিছু চিন্তার কার্য্য তৎসমস্তই পুরুষে সম্পন্ন করে। যে সকল কার্য্যে বিপদ সম্ভব, যাহাতে প্রাণ হানি হইতে পারে তৎসমস্তই পুরুষে সম্পন্ন করে। স্ত্রীজাতি কেবল বসিয়া বসিয়া ভোজন করে বলিলেই হয়। এই কার্য্যে বা শ্রম বৈষম্য হইতেই অবস্থান স্থান বৈষম্য জন্মিয়াছে। পুরুষদিগকে অধিকতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের অধিক স্থানের প্রয়োজন। শস্য বপনের জন্য মাঠ, বৃক্ষাদি রোপন জন্য উদ্যান, ক্রয় বিক্রয় জন্য বিপণি, যুদ্ধ জন্য সমরক্ষেত্র বানিজ্য জন্য নদী, পর্ব্বত, অরণ্য সমুদ্র, দাসত্ব জন্য গৃহ বা রাজকীয় স্থান সকলই পুরুষের প্রয়োজন। ঐ সকল স্থানে স্ত্রীদিগের যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে যাইতে না পাইলে ক্ষতি কি? তোমাকে জিজ্ঞাসা করি? যখন তোমার ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন, প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে না তখন তোমার মাঠে যাইবার প্রয়োজন কি? পুরুষ অসহ্য রৌদ্র বাতে ভ্রমণও করে ও পরিশ্রম করিয়া জীবনোপায় সংগ্রহ করিতেছে আর তুমি কেবল মাত্র উহা সিদ্ধ দিতেছ। তাহাতে কি তোমার ঈর্ষা হইয়াছে? তুমি কি মাঠে যাইতে চাও? মাঠে যাইতে পাও না বলিয়া তোমার কষ্ট হইতেছে?"

"কিসের কষ্ট?"

"দিবারাত্র রৌদ্রে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে পাইতেছ না বলিয়া কষ্ট? না নিয়ত পরিশ্রমে শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে না বলিয়া কষ্ট? কর দিতে না পারা ভূস্বামী দিগের হইতে এবং দেনা দিতে না পারায় উত্তমর্ণদিগের হইতে যে যন্ত্রনা সকল পাইতে হয় তাহা পাইতেছ না বলিয়া দুঃখিত অথবা শস্য জন্মিল না, কি প্রকারে সংসার চলিবে সেই চিন্তায় শরীর ও মনের দারুণ দুরাবস্থা হইয়াছে?"

"প্রিয়তমে! কৃষকের কথা ছাড়িয়া দেও তোমার এ অবস্থায় কৃষক ও কৃষকপত্নীর অবস্থা তুমি বুঝিতে পারিবে না। তুমি আমার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া

বৈষম্য স্থির কর। আমি যেখানে যাই তুমি সেখানে যাইতে পাও না। আমি কোথায় যাই? আফিসে যাই, তুমি ত তথায় যাইতে পাও না। কিন্তু মনে করে দেখ এই পৌষ মাসেও বেলা ৮ ঘটিকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া আফিসে যাই, তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলম লইয়া যুঝি ও প্রভুর মন যোগাইয়া কাটাইতে হয় এবং সময়ে সময়ে প্রভুর বাক্যবাণ সহ্য করিতে হয়। নিয়ত চিন্তিত, পাছে প্রভু রুষ্ট হইয়া বিদায় করেন বা বেতন কমাইয়া দেন। তাহা হইলে কিরূপে তোমাদের প্রতিপালন করিব। দিনে যাহা আহার করি তাহা মনুষ্যের খাদ্য নহে। যদি দয়া হয় ত তবেই রাত্রে কিঞ্চিৎ আহার যোটে। কেননা তোমারা ত আর আফিসের চাকর নও, যে তাড়িত হইবার ভয় আছে। যদি তোমাদের শরীর ও মন ভাল থাকে তবে ইচ্ছা অনুসারে যত্ন করিয়া খাদ্য প্রস্তুত কর। যতটুকু সময় বাটিতে থাকি ততক্ষণই সংসারিক কার্য্যে ও চিন্তায় ব্যয়িত হয়। কেবল মাত্র তোমাদের প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র সুখ। নচেৎ আমাদের জীবনে আর কি সুখ আছে? এক্ষণে তোমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি ইচ্ছামত স্নান ভোজন ও বিশ্রাম করিতেছ, কাহারও অধীনতা স্বীকার কর নাই, এবং চিন্তার নিকট দিয়াও যাইতে হয় না। যাহা কিছু আবশ্যক আমাকে বলিয়াই নিশ্চিন্ত। তোমার যত চিন্তা ও প্রয়োজন তাহা আমাকেই করিতে হয়। সুতরাং আফিসে যাওয়ার প্রয়োজন কি? তজ্জন্য দুঃখই বা কি? তুমি কিসের জন্য আফিসে যাইতে চাও? আমাদের দুঃখ দেখিবার জন্য না আমাদের দুঃখ দেখিয়া হাঁসিবার জন্য? বোধ হয় তোমাকে আর বলিতে হইবে না, তুমি অবশ্য বুঝিয়াছ, যে তোমাদের স্থান বৈষম্য আমাদের কার্য্য বৈষম্যের তুলনায় কিছুই নহে। কামিনী কহিল, সত্য বটে তোমরা অধিক পরিশ্রম কর ও আমরা অল্পকরি। কিন্তু সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী স্বাধীন পক্ষী হইতে সুখী অধিক, না দুঃখী অধিক? সুবর্ণ শৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নহে। আমরা যখন তোমাদের অনভিমত কার্য্য করিতে পারি না তখন আমাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? পরাধীনের সুখ সুখবাচ্য নহে, কিন্তু স্বাধীনের দুঃখ সুখ বলিয়া গণ্য।

যুবক কহিলেন তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য—আমাদের যত সুখ আছে, স্বাধীনতার সহিত তুলনায় কোনও সুখই নহে কিন্তু দেখিতে হইবে আমাদের তাহা পাইবার উপায় আছে কি না? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে মানবজাতি স্বাধীন নহে। এইজন্য অপর জীবের তুলনা তাহার সহিত হইতে পারে না। তোমরা পুরুষের অধীন, কিন্তু পুরুষেরা যে কত অবস্থায় অধীন তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষের অধীনত্ব স্ত্রীজাতির অধীনত্ব অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এইজন্য আমরা বলি তোমাদের প্রণয়াধীনত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক সুখকর। তবে যে তোমরা পুরুষদিগের ন্যায় স্বাধীন হইবার ইচ্ছা কর তাহা তোমাদের দুঃখ জন্য নহে, কেননা পৃথিবীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার অবস্থায় কষ্টকর ও পরের অবস্থাকে সুখকর মনে করে। অতি দরিদ্র হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই আপন অবস্থায় অসুখী। সেইজন্য স্ত্রীজা-

তিও আপনার অবস্থায় দুঃখী। পুরুষের অধীন বলিয়া তাহারা দুঃখী নহে। তাহারা স্বাধীন হইলে তাহাদের দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি ভিন্ন অল্প হইবে না। তোমরা সুবর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ বটে কিন্তু পিঞ্জরের মধ্যে তোমরাস্বাধীন। তথায় তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার। পুরুষ পিঞ্জর বদ্ধ নহে সত্য, এবং বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত বটে কিন্তু তাহার হস্ত পদ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কোনও দিকে তাহার নড়িবার যো নাই। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ মনোমুগ্ধকর পদার্থ দর্শন করিয়া তৎলাভে ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় গ্রহণ করিতে পারিতেছ না। অধিকন্তু শারীরিক ও মানসিক বিবিধ কষ্ট পাইয়া জর্জ্জরিত হইতে তোমাদের এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা নাই।—আমি—

যুবতী যখন এই সকল কথা শুনিতে-ছিলেন তখন তাহার মুখভঙ্গী একরূপ হাস্য-মিশ্রিত ব্যঙ্গভাব প্রকাশ হইতেছিল। যুবকের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, এবড় মজার কথা! "ছাগল বলে আমি প্রাণে মলাম, গৃহি বলে আমি আলুনি খেলাম" আমরা বলি আমরা অধীন থাকিয়া পুরুষ-দিগের অত্যাচারে জ্বালাতন হইতেছি, তোমরা বল স্ত্রীজাতি সুখে আছে, পুরুষের কষ্টের সীমা নাই। তবে কেন স্ত্রীদিগকে তোমাদের ন্যায় দুঃখ দিয়া আপনাদের দুঃখ দূর কর না? কেন তোমরা এরূপ কষ্ট ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করিতেছ? ও আমাদের অনভিমতে সুখ প্রদান করি-তেছ?"

যুবক গম্ভীর স্বরে কহিলেন প্রিয়তমে! অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে কি বাস্তবিক তোমার ইচ্ছা হইয়াছে? তুমি কি মনে করিয়াছ, যে তাহা হইলে সুখী হইবে? তাহা যদি ভাবিয়া থাক তবে আমি বলিতেছি এই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি স্বাধীন হও, আমি অধীন হই।

যুবতী হাস্যগদ্গদস্বরে কহিলেন প্রাণবল্লভ! সত্যই কি আমাদিগকে স্বাধীন করিলে, তবে এখন আমরা বাহিরে যাই। যুবক তথাস্তু বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং যুবতী বহির্দ্বার উন্মোচন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

সঙ্গীতে রমণী হৃদয়।

পুরুষ কর্ত্তৃক কতদূর চিত্রিত হইয়াছে।

বিচ্ছেদ।

সাংখ্য লিখিয়াছেন "এবং হি শাস্ত্র বিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত যদি দুঃখং নাম জাতি নস্যাৎ"। অভাবেরই অন্য এক নাম দুঃখ, এই দুঃখ মনুষ্যের উন্নতির আদি কা-রণ। প্রিয়জন অভাবই বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদে যে কেবল প্রণয়ের সত্যাসত্য, স্থায়িত্ব ও

গাম্ভীর্য্য, নিরূপিত হয় এমন নহে, ইহাতে মনের বল, বুদ্ধির প্রাখর্য্য. হৃদয়ের কোমলতা, স্বভাবের সরলতা, প্রণয়ের স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি শতরূপে প্রকাশ করে; এবং প্রণয়ী সর্ব্বদা প্রিয়জনের নিকট অধিকতর প্রিয় হইতে চেষ্টা করেন। এই প্রিয় হইবার ইচ্ছা অনেক নিষ্ঠুর হৃদয়কে কোমল করিয়াছে, মূর্খকে বিদ্বান করিয়াছে, স্বার্থপর জনকে নিঃস্বার্থ করিয়াছে, ভীরুকে সাহসী করিয়াছে, চেষ্টা শূন্যকে সচেষ্ট করিয়াছে। প্রণয় মনুষ্যের নূতন শক্তি, এবং অনেক স্থলে দেহের পরিবর্ত্তক। পণ্ডিতেরা প্রণয়কে মোহ বলেন; বস্তুতঃ উহা মোহ, কিন্তু বিধি-বাঞ্ছিত মোহ—সমাজের মঙ্গল সাধনের হেতু, দাম্পত্য সুখের আদি কারণ ও পরে ঐশ্বরিক প্রেমের সোপান স্বরূপ। উহার নির্ম্মল ভাব যেরূপ সুখকর উহার বিকৃত অবস্থা সেইরূপ অসুখকর;—একদিকে শান্তি, আশা, সত্য, ধর্ম্ম, মঙ্গলেচ্ছা, শিশুমুখের স্বর্গীয় শোভা, মাঙ্গলিক উৎসব, স্নেহপূর্ণ অভিবাদন, যথাযোগ্য সম্মান; অপর দিকে অধর্ম্ম, কাপট্য, নিষ্ঠুরতা ক্ষণ-ইন্দ্রিয়সুখ, পশ্চাতে দীর্ঘ অনুতাপ, অর্থনাশ, অসম্মান, ইত্যাদি। সহস্র সহস্র অবিজ্ঞজনে ছায়াতে সত্য ভ্রম করিয়া এই রূপে আজীবন অসুখী হইয়াছেন। অনেক পবিত্র হৃদয় সুরভি যৌবন সময়ে কপট প্রণয়ে সত্য বিশ্বাস করিয়া চিরদিনের জন্য স্বভাব কলুষিত করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই মোহের অপলাপেই শিক্ষা, নচেৎ শিক্ষার আর অন্য উপায় নাই।

বিচ্ছেদ, প্রেম ও মিলনের মধ্যবর্ত্তী দুঃখময় সময়। যিনি স্থির চিত্তে এই দুঃখময় সময় অতিবাহিত করিতে সক্ষম, তিনিই পশ্চাতে মিলনের সুখলাভ করিতে পারেন। দুঃখ হইয়াছে বলিয়া একান্ত অভিভূত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন বা লোকালয়ের সুখ পরিত্যাগ করা স্বার্থপর জনের কার্য্য। ইহা কথিত আছে যে নির্ম্মল প্রণয়ের পথ নিরবচ্ছিন্ন সুখে যায় না। বিচ্ছেদ হইবে, দুঃখ হইবে ইহাই ধর্ম্ম। দুঃখ অন্তে প্রিয়জন সহিত সম্মিলন সুখলাভ হইবে, ইহাই নৈসর্গিক ব্যবস্থা; সুতরাং সহিষ্ণু হইয়া শুভ সময় অপেক্ষা করিয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বসন্তঋতু না দুর্ভার হিমানী অন্তে আইসে ও শুষ্কতরুগণকে মুঞ্জরিত করে? মূঢ় জনেরাই ইহা বুঝিতে অক্ষম বা বুঝিতে পারিয়াও সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে চিরদুঃখী করে।

বিদায়।

বিদায়, প্রেম সূর্য্য অস্তমিত হইবার পূর্ব্বকাল, বা মিলনসুখের প্রদোষ সময়। দুঃখনিশা হৃদয় আকাশের পূর্ব্বদিক হইতে ধীরে ধীরে চাহিতেছে; পশ্চিম আকাশে প্রণয় রবির অস্ত যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, নয়ন-রূপ-জলদ-পটে সেই অস্তগামী রবিকিরণ নানা বর্ণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। হৃদয় উপস্থিত দুঃখে ক্লিষ্ট ও উপস্থিত স্নেহ বিতরণে যত্নবান্; লজ্জা আন্তরিক প্রেমউচ্ছ্বাস সকল ঢাকিতে সচেষ্টিত, সরলতা সেই চেষ্টা বিফল করিয়া প্রণয়ীর সুখসম্পাদনে ব্যস্ত। আশা ভবিষ্যৎ মিলনের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে, হতাশ পশ্চাৎ হইতে স্বীয় ভীষণমূর্ত্তি এক একবার দেখাইয়া প্রণয়ীর চিত্তে ভীতি সঞ্চারণ করিতেছে। অবলা এক একবার ভাবিতেছেন যদি না ফিরিয়া

আইসেন, বা অন্য জন তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, এই ভাবনায় তিনি কাতরে প্রিয়তম হস্ত আপন মস্তকে রাখিয়া শপথ করাইতেছেন ও এক একবার আকাশের প্রতি চাহিয়া অলক্ষ্য বিধাতার নিকট হৃদয়ের সহিত মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন ;—এক একবার তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন, বিদায়কালে সেই প্রণয়সুধা ক্ষীণ হইতেছে কি না—বা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না—যদি হয় তাহইলে তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন ? আশ্রিত লতা কি অন্য কোন পাদপ গ্রহণ করিতে পারে ? ভূমিতে পড়িয়া পরিশুষ্ক হইবে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, পরক্ষণেই চিন্তা করিতেছেন বিধাতা মঙ্গলময়, তিনি নিধি দান করিয়া কেনই বা কাড়িয়া লইবেন ? যিনি বিদায়-কালে স্নেহের এতদূর ঐকান্তিকতা প্রকাশ করিতেছেন, যিনি তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, যিনি তাঁহাকে হৃদয় ধরিয়া, হৃদয়ের বস্তু বলিয়া সোহাগে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন তিনি কি কিছুদিন বিচ্ছেদে সমস্তই ভুলিয়া যাইবেন ? যদিও ভুলিয়া যান পুনরায় আসিলে পুনরায় চাহিলে কি "আমার বলিয়া আমাকে" আর সম্বোধন করিবেন না ? যদি এ সমস্তই হয়, যদি দুর্ভাগ্য তাহাই করে, যদি বিধি আমার হৃদয়ের বৈধব্য দশা পশ্চাৎ লিখিয়া থাকেন, যদি তাহাই ঘটে, তা হইলে এ প্রাণ আর রাখিব না, যদি রাখিতে হয় এ প্রেমসুধা সেই দুর্ভাগ্যকে সেই "নিষ্ঠুর বিধিকে" শুধাইতে বলিব।

পুরুষহৃদয় রমনীহৃদয়ের এই অতুল ঐকান্তিকতা স্পর্শ করিতে পারে না। উহা রমণীরই ধর্ম্ম ও সমাজ সুখরূপ মণিময় অট্টালিকার ভিত্তিস্বরূপ উহা অন্যরূপ হইলে সমাজবন্ধন শ্লথ হয়, দাম্পত্য সুখের বিশৃঙ্খলতা ঘটে, সকল সুখের সম্বন্ধ অস্থির হইয়া উঠে। আমরা রমণীপ্রেম নিত্য ভাবিয়া সংসার সুখে প্রবৃত্ত হই। এ বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস নয়, কেননা অনেক কুল-লক্ষ্মী অযোগ্য স্বামীতেও সন্তুষ্ট হইয়া আছেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল গৃহে পর্য্যঙ্কোপরি স্পন্দহীনা পড়িয়া আছেন। এখনও তাঁহার চেতনা হয় নাই এবং বিধবা বধূ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিতেছেন। দেওয়ান দরদালানে বসিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের ক্ষত স্থান সকল সলিলাসক্ত ছিন্নবস্ত্র পরম্পরায় বাঁধিয়া দিতেছেন। ভীম সর্দ্দার সিঁড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া হস্তে কলিকা ধরিয়া তামাকু খাইতেছে। সকলেই নীরব, কেহ কোন কথা কহিতেছে না। বহির্বাটীতে গোয়াল ঘর এখনও জ্বলিতেছে এখনও পটাস্ পটাস্ শব্দ হইতেছে এবং গাভীটি হম্বা রব করতঃ বাটীর চতুর্দ্দিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। কিয়ৎকাল এই ভাবে গত হইলে, বিনোদিনী গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন "বৌ"।

বিধবা। "কেন দিদি, এই যে আমি।"

বিনোদিনী। "বৌ, আমার বড় যাতনা হচ্ছে, আমার প্রাণের ভিতর কেমন ছট্‌ফট্ করছে; তুমি আমার বুকে হাত বুলাইয়া দেও।"

বিনোদিনীর এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিল।

দেওয়ান। "আপনি উঠিলেন কেন?"

হলধর। "আঃ! এই বৃদ্ধ বয়সে আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল। মা! বিনোদ! বিনোদ! আঃ! তুইও কি আমায় ছেড়ে চল্লি।"

দেওয়ান। "কি করেন? আপনি অস্থির হচ্ছেন কেন? মূর্চ্ছাপগমে হৃদয়ের ঐ প্রকার যাতনা হয়ে থাকে। আপনি স্থির হউন।"

এই বলিয়া গোবিন্দ রাম গৃহ মধ্যে বিনোদিনীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিধবা। "ঠাকুর ঝি! চেয়ে দেখ, কে এসেছে দেখ।"

বিনোদিনী একবার মাত্র গোবিন্দরামের মুখ পানে চাহিয়া লজ্জায় নয়ন নিমীলিত করিলেন। তখন দেওয়ানের হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা বোধ হয় বিবাহিতব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু এক্ষণকার স্বাধীন প্রেমের পক্ষপাতী যুবকগণ তাহা কখনই বুঝিবেন না। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের চিরবৃদ্ধিশীল স্বর্গীয় নির্ম্মল প্রণয়ে তাঁহারা চিরদিন বঞ্চিত থাকিবেন। "যদি পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখ কিছুতে থাকে তাহা

কেবল দাম্পত্য প্রণয়ে। বিনোদিনীকে তদবস্থ দেখিয়া গোবিন্দরামের দাম্পত্য স্নেহ উছলিয়া উঠিল। তিনি বিধবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন " দেখুন ওকে এখন কদাচ উঠিতে দিবেন না। এখন উঠিলে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইবার সম্ভাবনা। ঘরে দুগ্ধ থাকেত একটু খাইতে দিন।" এই কথা বলিয়া তিনি বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ এখন উঠিয়া বসিয়াছেন।

বৃদ্ধ বলিলেন "বাবা! আজি তুমি যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিলে, আজি তোমা হইতেই আমরা কয়জন প্রাণ পাইলাম।"

দেওয়ান উত্তর করিল "না মহাশয়! বরং আমার জন্যই আপনাদের এই বিপদ ঘটিল"। এই কথা বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত সেই ভয়ঙ্করী শর্ব্বরীর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্বশুরকে বলিতে লাগিলেন। যখন তিনি আপনার বিপদের কথা বলিতেছেন দস্যু কর্ত্তৃক কি রূপে আহত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন-সেই কথা বলিতে ছিলেন সেই সময়ে বহির্বাটীর দিকে কাহার আর্ত্তনাদ শুনা গেল। সকলে চকিত ও চমকিত হইলেন। গোবিন্দ রাম তরবারি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। হলধর ঘোষ তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন " কি কর বাপু! স্থির হও। তোমার যাওয়া হইবে না।"

"আপনি থাকুন, আমি যাচ্চি" এই কথা বলিয়া প্রভুর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ভীম সর্দ্দার নিমেষের মধ্যে বহির্বাটীতে উপস্থিত হইল। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না, দেখিল গোয়ালের চাল ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বহ্নির প্রবলতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া খুজিল সেখানেও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিল এক ব্যক্তি ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিল। সে ব্যক্তি তাহার প্রভুর ভগ্নীপতি হরজীবন কুমার। অমনি স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেল। দেওয়ান ভগ্নীপতির তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া যৎপরনাস্তি দুঃখিত হইলেন। এবং তাঁহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে হরজীবনের চৈতন্য হইল। দেওয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেওয়ান ভগ্নীপতির পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র দেখিয়া, গৃহমধ্য হইতে বস্ত্র আনিয়া তাঁহাকে পরিতে দিলেন, কুমারজি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ানও তদীয় শ্বশুর মহাশয়ের সহিত একত্র বসিলেন। ভীমসর্দ্দার তামাক সাজিয়া দিল।

দেওয়ান। কুমারজি! ব্যাপার কি?

কুমার। ভাই তখন যদি তোমার সঙ্গে আস্তেম তাহলে এমন বিপদে পড়তে হত না। বাপরে! বাপরে! আমার জীবনে আমি এমন বিপদে কখনও পড়ি নাই!' তোমাদের বালির ঘাটে নামাইয়া দিয়া আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম; গঙ্গা একটানা। নৌকা এগোয় না। মাজিরা প্রাণপণে বয়ে বয়ে সবে মাত্র কোন্নগর ছাড়িয়াছে এমন সময়ে কোথা হতে দুইদিক দিয়া দুই খানা সড়পী আমাদের নৌকায় আসিয়া চাপিয়া পড়িল। একজন লোক আমাদের নৌকায় উঠিল ও মাজিকে জলে ফেলিয়া দিল, দাঁড়িরা তাহা দেখিয়া

জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। দুই তিন জন লোক আমাদের দ্রব্যাদি লুটপাট করিতে লাগিল। আমি বেগতিক দেখিয়া নৌকা হইতে লাফ দিয়া পড়িলাম। স্রোতে আমাকে বহুদূর টানিয়া লইয়া গেলে অতি কষ্টে সন্তরণ করিয়া কিনারায় আসিলাম। জল হইতে উঠিয়া এদিক ও দিক দেখিলাম কিন্তু আমাদের নৌকা দেখিতে পাইলাম না। অত্যন্ত শীতবোধ হইতে লাগিল। উপরে উঠিয়া দেখিলাম যে স্থানটি জঙ্গলময়, পথঘাট বা লোকের বসতি নাই। নিরুপায় ভাবিয়া চড়ার উপর দিয়া চলিলাম। বহুদূর যাইয়া একজন জেলেকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলাম ভাই! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি যদি আমায় রক্ষা কর। আমার কাতরতা দেখিয়া সেব্যক্তির দয়া হইল। আমি অনুরোধ করায় সে আমায় কালিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। পথে আশ্রয় পাইবার জন্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে পথে জনপ্রাণি নাই। একাকী সেই দুর্গম পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। অতিকষ্টে এ পর্য্যন্ত আসিলাম কিন্তু এখানে আসিয়াও ভয়ঙ্কর কাণ্ড, দেখিলাম কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! গৃহ পুড়িতেছে, অগ্নিশিখা গগনস্পর্শ করিতেছে, ইহা দেখিয়াইত প্রাণ উড়িয়া গেল। তৎপরে বাটীর দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম একটা বিকটাকার রাক্ষস একটা মানুষ ধরিয়া খাইতেছে। সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণে আর কিছু রহিল না। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম।"

দেওয়ান। ও হো! ভীমে, দেখ ত-রে সেই ডাকাইতটার দেহ পড়ে আছে কি না?

ভীম সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেল এবং আসিয়া বলিল "আজ্ঞা, না। দেখিতে পাইলাম না।" এই কথা শুনিয়া গোবিন্দরামের বদন কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইল। তিনি বলিলেন, 'যাহা ভেবেছি তাই। লাস্‌টা বেটারা সরিয়াছে।" পরে আপনার বিপদের কথা হরজীবনকে বলিতে লাগিলেন।

রাত্রি ক্রমে প্রভাত হইল, ক্রমে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল, কাক, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল প্রভৃতি গ্রাম্য বিহঙ্গমগণের কোলাহলে চতুর্দ্দিক আকুলিত হইল। দেওয়ান, হরজীবন, কুমার ও ভীমসর্দ্দার বহির্বাটীতে গেলেন, বৃদ্ধ হলধর ঘোষ ও একগাছি লাঠি ধরিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা বহির্বাটীর চণ্ডিমণ্ডপে যাইয়া বসিলেন। হলধর ঘোষ যদিও তাদৃশ সম্পত্তিশালী নহেন তথাপি তিনি সেই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ট লোক ছিলেন। পল্লিগ্রামবাসীরা স্বভাবতঃ যেরূপ স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর হইয়া থাকেন ইনি সে ধাতুর লোক নহেন। তাঁহার বদান্যতা ও পরোপকারীতা গুণে গ্রামের সকল লোকেই তাঁহাকে ভাল বলিত। তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া সকলেই কাতর হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিল এবং আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া আপন আপন কার্য্যে প্রতিগমন করিল। অপরাপর

সকলে চলিয়া গেলে একটী প্রাচীন ব্যক্তি দেওয়ানকে বলিলেন ' বাবুজি ! কি আমায় চিনিতে পারেন ?"

দেওয়ান। " আজ্ঞা আপনাকে পূর্ব্বে এই স্থানেই দেখিয়া ছিলাম বোধ হচ্চে।,,

এই ব্যক্তি বৃদ্ধ হলধর ঘোষের সমবয়স্ক বন্ধু নাম জগমোহন বসু। ইনি প্রায় প্রতিদিনই প্রাতে হলধর ঘোষের বাটীতে আসিতেন ও তাঁহার সহিত পাসা খেলিতেন।"

হলধর। "জগমোহন দাদা ! জামাই বাবু হতেই আমরা এ যাত্রা রক্ষা পেলেম।

দেওয়ান। " বরং আমার জন্যই আপনাদের এ বিপদে পড়িতে হলো। আপনাদের দেশ যে এপ্রকার ভয়ানক স্থান তা আমি জানিতাম না। "

জগমোহন। "ভয়ের কথা বরাবরই শুনা-যায় ; বিশেষ ঐ পাখীর বাগানের সামনেটা বড় কদর্য্য স্থান।,,

দেওয়ান। "পাখীর বাগানেই ডাকাতদের বাসা নাকি ?"

জগমোহন। "এইরূপত শুনা যায়"

দেওয়ান। " কলিকতার নিকটেএ এমন কদর্য্য স্থান ? এ সকল দুষ্টলোকের দমন হয় না কেন ?"

জগমোহন। " সে বাবু অনেক কথা" শুনাযায় জমিদার রাঘব সেন ডাকাইত পোষে। তার দলকে গেরেফ্‌তার করা সহজ কাজ নয়। "

দেয়ান। " বটে ? কিন্তু এ সকল অত্যাচার এরূপ অরাজকতা নিবারণের চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য হইয়াছে। ,'

হলধর। কিন্তু করে কে।

দেওয়ান। " সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। তিন চারি গ্রামের লোক একমত হইয়া প্রাণপনে চেষ্টা করিলে কি এ সকল অত্যাচারের প্রতিকার হয় না। একতার অসাধ্য কিছুই নাই। "

জগমোহন। " জামাই বাবুর কি এখন দুই একদিন এখানে থাকা হবে। "

দেওয়ান। " আজ্ঞা না ! অদ্যই আমাকে যেতে হবে আজ না পৌছিতে পারলে বাটীর সকলে বড় উৎকণ্ঠিত হবেন। "

দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইল। তাঁহারা সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন জগমোহন বসু আপন বাটী অভিমুখে গমন করিলেন, দেওয়ান সস্ত্রীক বাটী যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন।

মধুযামিনী।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(একাদশ পরিচ্ছেদ।)

সেদিন সন্ধ্যাকালে অরুণা আচার্যাকে চুম্বন দান করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু গুহিতার আকাঙ্ক্ষা যে কোনমতে পরিতৃপ্ত হইল না একথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রণয়ের কিয়দংশ প্রাপ্তে কেহই সন্তুষ্ট হয় না, সুতরাং আচার্য্য অন্য রূপ কেন হইবেন? পর দিন সন্ধ্যা কালে অরুণা শঙ্কিত ভাবে আচার্য্যের নিকট দণ্ডায়মান হইলে, তিনি অতি স্নেহ ভরে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া আপনার প্রাপ্য যথোচিত মতে লইয়া, তাঁহার সহিত হিঙ্গনাকে দেখিতে পর্ব্বতদেশে চলিলেন। পথে অরুণাকে পুনঃ পুনঃ সস্পৃহ নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিলেন; পরে পর্ব্বত মূলে উপস্থিত হইয়া মুক্তকেশা হিঙ্গনাকে একাকিনী দণ্ডায়মানা দেখিয়া, অরুণার প্রতি তাহার আসক্তির অনেক হ্রাস হইল। হিঙ্গনার সম্মুখে তিনি তাহাঁকে কদর্য্যই দেখিতে লাগিলেন। এতাবৎকালে তিনি যেন নক্ষত্রালোকেই সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন এক্ষণে পূর্ণ-চন্দ্রের বিমল দিধীতি দর্শনে তিনি তৃষিত চকোরের ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে তাহাঁর কৌমুদীর লাবণ্য শত শত বার মনে মনে প্রশংসা করিয়া গোপনে সেই স্থানে অরুণার সহিত কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন্ তিনি কিরূপে, তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা দূরে থাক, এরূপ মিষ্ঠুর অপবাদ দিবেন। কিন্তু এ পৃথিবীতে স্বার্থ অতি প্রিয়তম বস্তু উহার পরিহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য! তিনি অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কৈ হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়াত বোধ হয়না।" অরুণা সাহসে নির্ভর করিয়া কহিলেন "প্রভু! ঐ দেখুন হিঙ্গনা এমন সময়ে একাকিনী পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া আপন মনে কি বলিতেছে"? "আবার দেখুন গলদেশে অঞ্চল দিয়া যোড় হস্তে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিতেছে।" আচার্য্য তাঁহার কথায় কিছু মাত্র বিশ্বাস না করিয়া কহিলেন "অরুণে! হয়ত হিঙ্গনা কুমারের জন্য দেবতাদিগের নিকট কামনা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।" অরুণা দেখিলেম অগত্যা, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল, তিনি তখন অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহ্যিক রাগ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "প্রভু! যদি তাই আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে আমি চলিলাম, আমার আর কি প্রয়োজন আছে?" আচার্য্য ভাবিলেন হিঙ্গনার পক্ষ হইলে তিনি অরুণা হারাইবেন, তখন তিনি কি করেন

তাহারই কথার অনুমোদন করিয়া কহিলেন "অরুণে! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই হইতে পারে, আমারও সেই মত বিশ্বাস, তবে যদি বল আমি হিঙ্গনাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি বলেন, তুমি ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে যাইয়া অপেক্ষা কর, আমি হিঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার নিকটে শীঘ্র যাইতেছি"। অরুণ সেই মত করিলেন আচার্য্য এক্ষণে হিঙ্গনাকে আপন আয়ত্তে আনিবার জন্য পর্ব্বতদেশে উঠিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা আপন দুঃখে অভিভূত ছিলেন তিনি আচার্য্যকে লক্ষ্য করেন নাই; পরে আচার্য্য যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই সন্ধ্যাকালে নির্জ্জন প্রদেশে একাকিনী কি করিতেছ"? তখন হিঙ্গনা চমকিত ও ভীত হইয়া কহিলেন "কেন প্রভু! কেন আপনি আমাকে একথা জিজ্ঞাসা কর্‌চেন?" আচার্য্য ঈষৎ হাস্য মুখে কহিলেন "হিঙ্গনে! প্রয়োজন আছে"। বালিকা কি বুঝিলেন তিনি বলিলেন "আমি প্রতি দিন প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে এখানে আসি, আজও আসিয়াছি—"। আচার্য্য কহিলেন "তাহা নয়, হিঙ্গনে! তুমি জানিতেছনা কিরূপ বিপদ তোমার নিকটবর্ত্তী,—যদি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা কর, আমাকে সত্য বল, কেন তুমি এমন সময়ে একাকিনী এস্থানে দণ্ডায়মান আছ"। হিঙ্গনা সরলভাবে কহিলেন "আমি কুমারের জন্য এখানে আসিয়াছি, তিনি যদি আসেন সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ বাটী ফিরিয়া যাইব, কিন্তু প্রভু! আপনি বলিলেন না কি বিপদ উপস্থিত, আপনি কি কুমারের বিষয় কিছু শুনিয়াছেন, তাঁহার পীড়া কি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে কুমার কি আর আসিতে পারিবেন না, বলুন আপনার পায়ে ধর্‌ছি শীঘ্র বলুন।" আচার্য্য কহিলেন "তানয় হিঙ্গনে! আমি কুমারের কথা কিছুই জানিনা-তবে এই মাত্র শুনিতেছি, সে ব্যক্তি নাকি তোমাকে ডাইনের মন্ত্র শিখায়েছে, তুমি প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে এখানে এসে সেই মন্ত্র পড়ে সকলের অমঙ্গল কর" হিঙ্গনা সবিস্ময়ে কহিলেন "না প্রভু! আমি ডাইন নহি"। আপনাকে এরূপ কথা কে বলিল।' আচার্য্য উত্তর দিলেন "সে কথা আমি বলিব না, তুমি সত্য ডাইন কি না, আমি তাই দেখিতে আসিয়াছি, হিঙ্গনা কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "প্রভু! আমি ডাইন নহি"। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি গলবস্ত্র হইয়া, আকাশের প্রতি চাহিয়া মনে মনে কি বলিতেছিলে?" হিঙ্গনা বলিলেন "আমি তা বলিব না, কুমার আমাকে কোন মন্ত্র শিখান নাই, আপনি বলুন একথা আপনাকে কে বলিল?" আচার্য্য কহিলেন "তুমি যখন আমাকে বলিলে না তুমি মনে মনে কি বলিতেছ, তখন আমি অন্য জনের নাম তোমাকে কেন বলিব?" হিঙ্গনা উত্তর দিলেন "আপনি নাই বলুন"—।

হিঙ্গনা এইরূপ বলিয়া দুঃখে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়েন, এমন সময়ে রূপমুগ্ধ ইন্দ্রিয়সেবক আচার্য্য হিঙ্গনার কর ধরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার মুখের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া কহিলেন, "হিঙ্গনে শত্রু হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার এখন উপায় আছে, যদি আমার কথা শুন ত আমি পরামর্শ দি"। হিঙ্গনা আচার্য্যের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া কহিলেন "বলুন, আমি শীঘ্র বাটী

যাইব"। আচার্য্য কহিলেন, "হিঙ্গনে অত ব্যস্ত হইলে চলিবে না তুমি কাল দুই প্রহরের সময়ে আমার কাছে যাইবে যাইলে আমি—আমি-সমস্ত বলিব—"। হিঙ্গনা কোন উত্তর না দিয়া শীঘ্র চলিয়া গেলেন।

হিঙ্গনা চলিয়া গেলে আচার্য্য ভগ্নাশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ হিঙ্গনার দিকে চাহিয়া রহিলেন। হিঙ্গনার দর্শনপথের বাহির হইলে তিনি অল্পেঅল্পে পর্ব্বতহইতে নামিতে লাগিলেন ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন যদি হিঙ্গনা কাল দুপ্রহরে না আইসেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে ডাইন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে তাহাকে অবশ্যই শরণাগত হইতে হইবে।

তিনি এই রূপ মনে করিতে করিতে আপন আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। অরুণা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন; তিনি আচার্য্যকেদেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,'প্রভু! হিঙ্গনা কি বলিল'? আচার্য্য দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "কিছু হইল-না। হিঙ্গনা কিছু উত্তর দিল না আমি তাকে জব্দ করিব"। অরুণাপ্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "দেখুন আমি যা বলিয়াছিলাম তা সত্য কিনা, যদি বলিবার কিছু থাকিত তা অবশ্য বলিত।" আচার্য্য কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন "দেখিব আরও এক দিন দেখিব যদি কোন উত্তর না দেয় তাহলে উহাকে ডাইনবলিয়া প্রচার করিয়া দিব;" তৎপরে ঈষৎ হাস্য করিয়া সতৃষ্ণনয়নে অরুণার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কৈ অরুণে! " কৈ আমার! অরুণা নত বদন হইলেন, আচার্য্য সেই নতবদন খানি ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অরুণা অদ্য কোনমত বাধা দিলেন না, সুতরাং আচার্য্য ক্রমশঃ অধিক সাহসী হইতে লাগিলেন।

অরুণা কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অরুণার মনে ভয় হইল হিঙ্গনা কিছু২ জানিতে পারিয়াছেন কি না তিনি বাটীতে অধিক বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র হিঙ্গনার নিকট যাইলেন। হিঙ্গনা ক্ষুব্ধচিত্তে একাকিনী বসিয়া আপন অবস্থা ভাবিতেছেন, অরুণাকে দেখিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অরুণার আরও ভয় হইল, তিনি আস্তেআস্তে হিঙ্গনার নিকট বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন' কুমার কি আসিয়াছে।'

হিঙ্গনা। না-

অরুণা। কোন খপর দেয় নাই কি।

হিঙ্গনা। না।

অরুণা। তুই আজ এমন করে আছিস্ কেন। কি ভাব্‌ছিস্।

হিঙ্গনা। যা নিত্য ভেবে থাকি তাই ভাবছি।

অরুণা। মুখে আর হাসি নেই, কোন কথা-নেই, কেমন একরকম দেখ্‌চি।

হিঙ্গনা। আরও কতরকম দেখ্‌তে পাবে-

অরুণা। তোর কথা আমি বুঝতে পার্‌চিনি কি হয়েছে ভেঙ্গে বল দিখিন্।

হিঙ্গনা। নিত্য নিত্য এক কথা আর কি বলবো, উদয় আজ আস্‌বে তুই যা চুলটুল ভাল করে বেঁধে আয় গে।

অরুণ। আজ আস্‌বে সত্তি।

হিঙ্গনা। তুই যা না, আমি যা বল্‌চি তা কর্‌গে, আমি তোর বিয়ের জোগাড় করে দেবো এখন।

অরুণা। আমি কুশ্রীবলে কি আমায় ঠাট্টা কর্‌চিস্, তুই আপনি ত দেখ্‌তে ভাল সেই ভালই ভাল।

হিঙ্গনা। (ঈষৎ হাসিয়া) আমিত তাকে নিচ্চি নি।

অরুণ। সে তোর মুখের কথা।

হিঙ্গনা। মুখের কথা কি সত্য কথা, সে এলে টের পাবি।—

অরুণ। তা'ত পাবই তুইতাই কি ভাবচিস্।

হিঙ্গণ। আমি আপনার ভাবনায় আছি।

হিঙ্গনা একথা বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহের কার্য্য করিতে গেলেন। অরুণা হৃদয়ের কোন কথাই পেলেম না, তিনি ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

প্রবাসে।

একদা চট্টগ্রাম হইতে রঙ্গমতী যাইবার সময় পথে একটী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাইয়া সঙ্গীকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল ঐ পর্ব্বতের নাম "জামাই মারী' পাহাড়। এই নাম শুনিয়া মনে পরম কৌতূহলের উদ্রেক হইল; সঙ্গীকে এরূপ নাম করণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম একদা অতিপূর্ব্বকালে চাক্মাজাতীয় (চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ) একজন প্রধান ব্যক্তির এক পরমরূপ লাবণ্যবতী কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অনেক গুলি বরের সমাগম হয়। কন্যার পিতা প্রার্থীদিগের বল ও সাহস পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে লম্ফদিয়া ভূতলে পতিত হইতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে ভুমিতলে পতিত হইবে তিনি তাহাকেই তাঁহার কন্যারত্ন প্রদান করিবেন। ঐ সুন্দরী কন্যারত্নের পাণীপীড়নলোভে ঐ স্থানে অনেক যুবক প্রাণ হারাইয়াছে। অবশেষে একজন যুবক নাকি সফলপ্রযত্ন হইয়া ঐ কন্যাকে লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক এই প্রবাদ হইতেই যে ঐ পাহাড়ের নাম "জামাইমারী পাহাড়", হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এবৎসর শীতকালে রঙ্গমতী হইতে দেবগিরি পর্ব্বতে যাইবার সময় একদিন সন্ধ্যাকালে কর্ণফুলী নদীতটে নৌকা লাগাইয়া বিশ্রাম করিতে ছিলাম। জগৎ নিস্তব্ধ; কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন; একটীও পশু পক্ষীর সাড়াশব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। এমন সময়ে অকস্মাৎ এক অদৃশ্যপূর্ব্ব আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়ন পথে সমুদিত হইল; আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি না আমার মতিভ্রম হইল—প্রথমতঃ এই সন্দেহ মনে উপস্থিত হইল। কতকগুলি স্বর্ণ স্তম্ভ কিপ্রকারে হটাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এইস্থানে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলাম কিন্তু এরূপ সুন্দর স্বর্ণস্তম্ভ কখনও দেখি নাই। এ বিষয় লইয়া মনে মনে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছি, এখন সময় পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বগগন তদীয় উজ্জল আলোকে আলোকিত করিয়া বৃক্ষাদির অন্তরাল হইতে নির্ম্মল আকাশে উদিত হইল এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণস্তম্ভগুলিও লীন হইল। এক্ষণে আমি ঐ স্বর্ণস্তম্ভগুলির কারণ বুঝিতে পারিলাম। চন্দ্র কিরণ কুঝটিকাবৃত বৃক্ষশাখাদির অভ্যন্তর ভাগ দিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া স্বর্ণস্তম্ভের আকারধারণ করিয়াছিল।

খিয়ংথা জাতি।

চট্টগ্রামপর্ব্বতবাসী খিয়ংথাদিগের পরিচ্ছদ পরিপাটী অতি সামান্য। পুরুষেরা ধোয়াক নামে এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করে। ঐ বস্ত্র কাটনা কাটা সূত্র নির্ম্মিত ও অতি কোমল। তদ্বারা উহারা কটিদেশের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করে ও সামান্যতঃ কটিদেশ হইতে জঙ্ঘা বা জানুর নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত রাখে। সম্ভ্রান্তদিগের ধোয়াকের নিম্ন ভাগ প্রায় ভূমিতে লুটাইয়া যায় ও প্রায়ই রেশম বা উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহারা রাঙ্ক্রি নামে এক প্রকার আংরাখা ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ আংরাখা দেখিতে ইংরাজদের হাতাওয়ালা ছোট ছোট জ্যাকেটের মত ও উহার গলায় বন্ধক বা ঘুণ্ট দেওয়া থাকে। পুরুষ মাত্রেই 'গাঁউখাঁউ' নামক উষ্ণীষ ব্যবহার করে। গাঁউখাঁউয়ের কাপড় হিন্দুস্থানীদিগের পাগড়ির ন্যায় মস্তকের চতুর্দ্দিকে জড়ান বটে, কিন্তু উহার গঠন অন্য প্রকার। খিয়ংথাদিগের মধ্যে পাদুকা ব্যবহারের রীতি নাই। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই উষ্ণীষ ব্যবহার করে না, তবে উৎসবাদি উপলক্ষে এক প্রকার উজ্জ্বল বর্ণের রুমাল বা বস্ত্র খণ্ড কেশপাশের চতুর্দ্দিকে শিথিল করিয়া বাঁধিয়া দেয়। তাহারা এক প্রকার কাঁচুলি পরিধান করে, তদ্বারা কেবল বক্ষঃস্থলটী আবৃত থাকে। এতদ্ভিন্ন টাবুইম বা টামুইন নামে তুলা বা উর্ণা নির্ম্মিত এক প্রকার আংরাখা ব্যবহার করে, উহা গলা হইতে ঝুলাইয়া দিতে হয় কিন্তু উহার কোন বন্ধন বন্ধনী নাই। নীচের চারি কিনারা কোমরের চারিদিকে টানিয়া ও গুটাইয়া আনে ও নিতম্বের উপর জড় করিয়া রাখে। চলিয়া যাইবার সময়ে ডাহিন পা ও উরুর কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা প্রায়ই তাহাদিগের হস্ত পদাদিতে নানা প্রকার উল্কি পরিয়া থাকে। হাতের ও পায়ের উল্কিতে প্রায়ই সর্পাকৃতি ও অপরাপর ভয়ানক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, স্কন্ধ বা গ্রীবাদেশে পরমেশ্বরের নাম লিখিত হয়। উহাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে উহাদের উল্কি পরার প্রথা ও উহাদের স্ত্রীগণের এরূপ পরিচ্ছদ প্রথা বহুকাল পূর্ব্বে আরাকান প্রদেশের অন্তর্ভূত সন্দোয়ে নিবাসী লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের নিকট হইতেই ইহারা শিক্ষা করিয়াছে। তাহাদের কোন এক রাজ্ঞী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের জাতিতে স্ত্রীগণের প্রতি পুরুষদিগের প্রণয়ের হ্রাস হইয়া যাইতেছে। তাহারা এককালে স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিয়া এরূপ নানা কুঅভ্যাসে রত হইতেছে যে তাহা অপেক্ষা মন্দ আর হইতে পারে না। রাণী এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে রাজা এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলেন যাহাতে পুরুষেরা ঐরূপ কদর্য্য বেশ

বিন্যাস, ও স্ত্রীরা ঐরূপ মোহিনী ভাবে বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইল।

এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে পুরুষেরা বিশ্রী ও স্ত্রীরা সমধিক শ্রীসম্পন্না হইলে কাজে কাজেই পুরুষেরা কখন না কখন রমণীদের শরণাগত হইবে।

এই প্রবাদ কতদুর সত্য তাহা আমরা জানি না। কিন্তু নারীগণের এরূপ পরিচ্ছদ যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্লুটার্ক স্বপ্রণীত জীবনচরিতে নিউমা ও লাইকার্গসের তুলনা করিতে এক স্থলে স্পার্টার রমণীগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "কুমারীরা" যে অঙ্গরক্ষ পরিধান করিতেন তাহার পার্শ দিয়া যে সেলাই পড়িত তাহা নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত যাইত না; সুতরাং ঐ আংরাখার পার্শের নীচ ভাগ যোড়া না হইয়া খোলাই থাকিত, চলিবার সময় ঐ স্থানের কাপড় সরিয়া সরিয়া উরু দেখিতে পাওয়া যাইত।"

বিলংথাদিগের স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই অত্যন্ত পুষ্পভক্ত। স্ত্রীলোকেরা ইহাই তাহাদের দেবতাদিগকে ও পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে ভক্তির উপহার স্বরূপ প্রদান করে। যুবতিরা অরণ্যসুলভ শ্বেত পীত বিবিধ কুসুমকলিকা দ্বারা কবরীর অলঙ্কার করে। যুবকেরা প্রিয়তমাগণের সন্তোষলাভার্থ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পর্ব্বতে ও অত্যুচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক অনন্যসুলভ কুসুমরাজি আহরণ করে। পুরুষেরা প্রায়ই কুসুমস্তবকে বা সুগন্ধি কিশলয়ে উষ্ণীষাগ্র শোভিত করে, কখনবা উহা কর্ণে ধারণ করে। ইহারা কর্ণের নিম্নভাগে ছিদ্র করে, ঐ ছিদ্র এত বৃহৎ যে কখন কখন উহা চুরটদানের কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহাদের কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই কাণে রূপার বা সোণার মাকড়ি ও হাতে বাজু পরিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা রৌপ্য নির্ম্মিত একপ্রকার স্থূলতর পাশা কাণে পরিয়া থাকে। ঐ পাশার পার্শ্বদিকে খোল বা ছিদ্র থাকাতে উহা দ্বারা কর্ণে পুষ্প ধারণ করিতে পারে। ইহারা প্রবালের মালা পরিতে বড় ভাল বাসে।

উহাদের চুম্বন প্রণালী অতি চমৎকার। উহারা ওষ্ঠাধর দ্বারা কপোল সংস্পর্শ না করিয়া মুখ ও নাসিকা দ্বারা বলবৎ রূপে আঘ্রাণ গ্রহণ করে। উহাদের ভাষায় "চুম্বন শব্দের প্রয়োগ নাই; উহার পরিবর্ত্তে "আঘ্রাণ কর" বা "ঘ্রাণ লও" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গ্রামের সকল বৃদ্ধ ও যুবা একমত হইয়া এক জনকে প্রধান স্বরূপ গণ্য করিয়া বিশেষ কার্য্যাদি উপলক্ষে তাহার মতামত গ্রহণ করে। তিনিই গ্রামের মাতব্বর বা মুরব্বি। বালকদের মধ্যেও ঐ রূপ একজন সরদার বালক থাকে ও তাহার পরামর্শানুসারে অপর বালকেরা চলে। ঐ সরদারকে উহারা গোঁ কহে। এইরূপ সরদারি প্রথা প্রায় সকল পার্ব্বত্য প্রদেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি এস্থলে তাহাদের দেশীয় প্রথার উদাহরণ স্বরূপ একটী পুলিস কর্ম্মচারীর কথিত রিপোর্ট বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি। এই বৃত্তান্তটী একজন সরদার বালকের কথা। সে কহিতেছিল যে "আমি পূর্ব্বে এক গ্রামের অবিবাহিত বালকদিগের সরদার (গোঁ) ছিলাম। আমার বয়স তখন ১৭ বৎসর। যাহারা অবিবাহিত ও মাতৃ

ক্রোড় হইতে অপসারিত, তাহারা রাত্রি কালে খিয়ঙে গিয়া শয়ন করিত। এক রাত্রি উজীম, রিফা ও চন্দ্র আমার নিকট আসিয়া তাহাদিগের প্রিয়তমাগণের নিকটে যাইবার নিমিত্ত বিদায় লইল। ঐ যুবতিদিগের নাম আছুবিন, ক্লুম্পি ও আত্নংশিয়েই। তাহাদের নাম আমার বিলক্ষণ মনে আছে। তাহাদের এখন বিবাহ হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যে দুজনের সন্তান হইয়াছে। বালক বালিকার পিতা মাতারা জানিতে পারিলে গোল মাল হইয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এজন্য তাহারা গোপনে গোপনে উহাদের নিকট যাইত এই নিমিত্ত ঐরূপ করিয়াছিল। পরদিন একটী বালিকা আমাকে আসিয়া কহিল যে পিনক্লু (আমাদের দলের একটী বালক) গৃহের বাহিরে শয়ন করিবার অনুমতি না পাইলেও সে আমার ভগিনীর সহিত ঐ রাত্রি যাপন করিয়াছিল। এটী সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ হওয়াতে তাহাকে শাস্তি দেওয়াই স্থির হইল। পর দিন আমরা সকলে একত্র হইয়া বোয়াঙ্গা জুমের ঘর বাঁধিয়া দিবার নিমিত্ত গেলাম। সন্ধ্যা কালে ফিরিয়া আসিলে ঐ গ্রামের নদী তীরে বিলক্ষণ করিয়া আগুণ করিলাম ও পিনক্লুকে ডাকিতে পাঠাইলাম। পিনক্লু ভয় প্রযুক্ত আসিল না, জ্বর হইয়াছে বলিয়া পিতার আলয়ে রহিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে এ কেবল ওজর মাত্র, বস্তুতঃ উহার জ্বর হয় নাই। এজন্য আমি উহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত তিন জন বালক পাঠাইলাম। তাহারা গিয়া তাহাকে আনিল। তাহার জননী ঐ বালকদিগকে অনেক গালি দিয়াছিল বটে কিন্তু গৌর আদেশ বলিয়া কেহই তাহাদের প্রহারাদি করিতে সাহস করে নাই। ঐ বালক সমুখে আসিলে পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি বিনা অনুমতিতে খিয়ং ছাড়িয়া অন্যত্র শয়ন করিয়াছিলে কেন? সে প্রথমতঃ এ বিষয় এক কালেই অস্বীকার করিল। পরে যখন আমি ঐ বালিকাকে আনাইলাম তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসিল যে "তখন ত অন্ধকার ছিল, তুমি কি করিয়া জানিলে যে আমি।" বালিকা কহিল "প্রত্যুষে যাইবার নিমিত্ত দ্বার খুলিলে তখন তোমার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়া ছিল।" ইহা শুনিয়া সে এককালে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া আমার চরণে নিপতিত হইল, ও আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু আমি সুশাসন ও সুনীতি রক্ষার নিমিত্ত তাহার তিন টাকা জরিমানা করিলাম। কর্ণেল ডাল্টন ছোট নাগপুর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন তাহার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে ওয়ারুন জাতীয়দের অনূঢ়দিগের রাত্রিতে শয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামে এক একটী করিয়া প্রশস্ত গৃহ থাকে। ঐ অনূঢ়াগারের এক স্থলে নৃত্য ক্রীড়াদি করিবার নিমিত্ত এক একটী স্থান থাকে। ছোট ছোট বালকদের উপর বড় বড় বালকদের আধিপত্যের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহাদের ধর্ম্ম নীতি আমাদিগের চক্ষে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কামিনীগণ প্রণয়ী উপযাচকের প্রার্থনা সফল করিলে তাহাদের মতে তাহাতে বড় দোষ হয় না। ফলতঃ বিবাহের পূর্ব্বে এক এক একটী যুবতীর দুই তিনটি পর্য্যন্ত প্রণয়ী থাকে। যদিও খিয়ংথারা অপরাপর পার্ব্বতীয় জাতিদের অপেক্ষা অবৈধ সঙ্গমের প্রতিকূল, তথাপি ইহাদের মধ্যে এরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহের পর সতীত্ব রক্ষা করা পরম ধর্ম্ম। বিবাহের পর কেহ অসতী হইয়াছে এরূপ প্রায় শোনা যায় না। এরূপ না হওয়া সম্ভবপরও বটে, কারণ ইহাদের বিবাহ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। লাভালাভ দেখিয়া বা সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া সম্পাদিত হয় না। কোন কোন যুবতি যাহার সহিত প্রথম প্রণয় করিয়াছিল তাহাকেই পতিত্বে বরণ করে কিন্তু ঐ প্রণয়ী প্রায়ই অন্যাসক্ত হইয়া শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করে। যুবতিরা প্রায়ই ১৬ বৎসর ও যুবকেরা প্রায় ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহ করে। যুবতিরা যদি কাহারও প্রেমে আসক্ত হয়, তবে তাহাকে অগ্রে তাহা জানাইতে কুণ্ঠিত হয় না বা অপমানজনক বিবেচনা করে না। এক জন পুলিস কনষ্টেবাল এক দিন আমার নিকট আসিয়া বিদায় চাহিলে আমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল যে অমুক গ্রামের একটী যুবতি আমাকে প্রণয়োপহার স্বরূপ দুইবার পুষ্প ও বাণিতণ্ডুল পাঠাইয়াছে, যদি আমি না যাই তবে আমাকে সে অমানুষ বিবেচনা করিবে। আমার এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

খিয়ংথারা পান সুপারি খাইয়া থাকে প্রণয় প্রসঙ্গ উত্থাপনের নিমিত্ত পান প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। যদি একটি পান সাজিয়া উহা পুষ্পের সহিত কাহারও নিকট পাঠান যায়, তবে তাহাকে বলা হইল যে আমি তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছি। যদি পানে অনেক মসলা দিয়া ঐ পানের এক কোণ এক রূপ করিয়া উল্টাইয়া দেওয়া হয় তবে তদ্দারা বলা হইল যে আমার নিকট আইস, তোমার নিমিত্ত আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। যদি ঐ পানের অভ্যন্তরে পিষ্ট হরিদ্রা সংলগ্ন করা হয় তবে তাহার অর্থ এই যে আমি আসিতে পারিতেছি না। যদি হরিদ্রার পরিবর্ত্তে কয়লা দেওয়া যায় তবে উহার অর্থ এই যে "তুমি যাও, আর তোমাকে চাই না।" তাহাদের ভাষায় প্রেম সঙ্গীতকে "কাপ্য" বলে। মাঠে শস্য কাটিবার সময় ইহারা মহা আনন্দ সহকারে ঐ সকল সঙ্গীত গান করে। বালক বালিকারা ও যুবক যুবতিরা একত্র কাজ করিতে করিতে কোন যুবক একটি গান ধরে। গান প্রায় নিম্নলিখিত ভাবে হইয়া থাকে—

পাহাড় লম্বমান এই সারি সারি রে,
যুবতি, ভুল না ঐ ফুল।
পাহাড় লম্বমান ও সোণার নারি রে
ও তোর মুখ যে 'ক্রামুফুল'।
তোল ফুল ক্ষতি নাই, কানের দুল করলো
ও ফুল দেখতে বড় ভালো।
যেখানেতে থাকে ঐ ফুল
সেখানেতে আলো।
কিন্তু শুকাইলে অন্তর শুকায়
মন করে আকুল।

যুবকের গান সমাপ্ত হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে "হৈয়া" "হৈয়া" করিয়া কৃষকেরা চীৎকার করিয়া উঠে ও সেই চীৎকার শুনিয়া ক্রমে পর পরবর্ত্তী সমুদায় কৃষকদল ঐরূপ শব্দ করিয়া উঠে। ঐরূপ চীৎকারের সময় বালিকা ও যুবতিরা চুপ করিয়া থাকে। চীৎকার ক্রমশঃ থামিয়া গেলে পর বালিকাগণের মধ্যে জিজ্ঞাসা হয় "হারে পিচিন্দে, উত্তর গাবি?" তাহাতে হয় ত সে বলে "না ভাই আমি গাইতে পারিব না আমি আজি মান্দা আছি। আমার গলা উঠে না, ও যেন কোইল ডেকেছে" এইরূপ কিয়ৎ

কাল হাস্য পরিহাসের পর কোন যুবতি স্বর ধরে ও ঐ গানের উত্তর দেয়। যথা—

পার্ব্বতীয়া ভমরা রে
ও তুই শুকনো বাঁশে রোস
ঐ পাহাড় পানে;
তুই রসের খবর জানবি কি ?
ফুলের মধু কোথায় পাবি
থাক্ থাক্ পাহাড় কোণে রে। ইত্যাদি।

যুবতির গান সমাপ্ত হইলে যুবাদলের মধ্য হইতে এক জন এইরূপের একটি স্বর ধরিয়াসঙ্গীত করে;

দুর হইতে নিরখি কিনসার জল।
সুন্দর নিরমল ভাবে টলমল।
কিন্তু কি হবে প্রাণ দেখে তোরে রে।
অন্য লোকে ধোবে গা
তার গা হবে শীতল।

এই সময় সকলের "হৈয়া" রব।

দুর হতে নিরখি তোরে যুবতি
ও তোর বরণ পাকা আম।
তোরে দেখলে, আমার হবে কি ?
তুই পুরাবি পরের কাম।

উচ্চৈঃস্বরে "হৈয়া" রব।

পুরুষদের ঐরূপ আর একটী গানের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

সখী দলের একটীপাখী ডালে, বসি বিরলে।
সঙ্গিনী বিরহে আহা পুড়চে যেন অনলে॥

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্যারিমোহন সেন।

মধুযামিনী।

দ্বাদশপরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনার কথা মত, উদয়গিরি রাত্রি একপ্রহর গতে বাটী আসিলেন। উদয়গিরিকে দেখিতে পল্লীর আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই আসিল, কেননা সকলেই শুনিয়াছিল যে উদয় অনেকদিন বিদেশে চাকরি করিয়া অনেক অর্থ সংস্থান করিয়া হিঙ্গনাকে বিবাহ করিবার জন্য বাটী আসিয়াছেন। উদয় ধনবান হইয়া আসিয়াছেন, এই জন্য সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছে, সকলেই তাঁহাকে মিষ্ট বচনে তুষিতেছে। উদয়ও সকলকে সুধীরভাবে সুমিষ্ট বচনে উত্তর দিয়া তুষিতেছেন। সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে "এত দিনের পরে হিঙ্গনার যোগ্য পাত্র আসিয়াছেন।"

পল্লীস্থ লোক সকল চলিয়া গেলে উদয়গিরি ঔৎসুক্যের সহিত হিঙ্গনার পিতাকে কুমারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, হিঙ্গনার পিতা অতি লজ্জিত ভাবে কহিলেন, "আমি যে কুমারকে বাটীতে রাখিয়াছিলাম সে কেবল হিঙ্গনার অত্যন্ত অনুরোধে। আমার মনে মনে অভিলাষ ছিল তুমি ফিরিয়া আসিলেই উহাকে তাড়াইয়া দিব। এক্ষণে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, সে আপনা হইতেই চলিয়া গিয়াছে, তোমার আর ভাবনা নাই, সে আপনিই মনে বুঝিয়াছিল

ভগিনীর পীড়া হইয়াছে বলিয়া ফিরিয়া গিয়াছে আর আসিবেনা।" তিনি যে কুমারের নিকট হইতে বারটী মুদ্রা লইয়াছিলেন সে কথা উদয়কে কিছু বলিলেন না। উদয় তাঁহার কথা শুনিয়া কিছু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না হিঙ্গনার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার কোন কথা হয় সেপর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ উদ্বেগ রহিল।

হিঙ্গনা পরদিন মধ্যাহ্নকালে আচার্য্যের আদেশমত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। আচার্য্য তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতে "হিঙ্গনা ডাইন হইয়াছে, তাহারই জন্য দেশের অমঙ্গল হইতেছে" তিনি এই কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন।

পরদিবস প্রভাতে ঐ কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল; উদয়গিরি ও হিঙ্গনার পিতা মাতা উহা শুনিয়া বিস্মিত ও একান্ত কাতর হইয়া হিঙ্গনাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা কি বলিবেন? তিনি পূর্ব্ব দিন সায়ংকালে আচার্য্যের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহাই সবিস্তারে কহিলেন ও আচার্য্য যে তাহাকে দুই প্রহরের সময়ে একাকিনী তাহার নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন।

হিঙ্গনার পিতা মাতা হিঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কিহেতু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পর্ব্বতদেশে যান। হিঙ্গনা সরল হৃদয়ে উত্তর করিলেন তিনি কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশায় গিয়া থাকেন, তাঁহার আর অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, তিনি ডাইন নহেন ও কুমার তাঁহাকে কোন মন্ত্র শিখান নাই। উদয়গিরি হিঙ্গনার এই কথা শুনিয়া, হতাশ নাই হউন, নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কি করিবেন? স্নেহ বলপূর্ব্বক লইবার নহে অর্থেও উপার্জ্জিত হয় না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন হিঙ্গনা আপন হৃদয় কুমারকে দিয়াছেন, যদি কুমার সত্যই পলাইয়া থাকে, হিঙ্গনার পিতা মাতা তাঁহার সহিত হিঙ্গনার বিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্নেহ শূন্য হৃদয় মাত্র পাইবেন, ইহাতে তিনি কি সুখী হইবেন? এমন সময়ে স্বার্থ আসিয়া যেন তাঁহার কর্ণে বলিল "তাহাতে কি ক্ষতি আছে" এরূপ অসামান্য রমণীকুসুমত তোমারই হইবে, সকলেত তোমাকে সুখী বলিয়া জ্ঞান করিবে, পক্ষান্তরে হিঙ্গনা ত এখন কলিকা মাত্র, কোরকে কি স্নেহ রূপ মধু পরিশুষ্ক হয়?" উদয় এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া হিঙ্গনাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পিতা মাতার সহিত আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। আচার্য্য হিঙ্গনাকে একাকিনী আসিতে বলিয়াছিলেন, যখন বলিয়াছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে যে অভিসন্ধি ছিল তাহা পাঠকগণের বিদিত আছে, এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে উদয় গিরি ও হিঙ্গনার পিতা, মাতাকে দেখিয়া তিনি কোন মতে সন্তুষ্ট হইলেন না, অথচ তাঁহাদিগকে বলিতে পারিলেন না যে তিনি গোপনে হিঙ্গনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন কেননা বাসনাগত পাপেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে দুর্ব্বল করিল, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তিনি অন্য কোন জন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একথা বলিতেছেন, এবং তিনি ও স্বয়ং যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে যে হিঙ্গনা "ডাইন"। আচার্য্যের এরূপ নিষ্ঠুর বাক্যে তাঁহারা সকলেই বাক্‌শূন্য হইয়া শুনি-

লেন। পরে হিঙ্গনার মাতা গলবস্ত্র হইয়া কহিলেন "প্রভু! ইহা অপবাদমাত্র, হিঙ্গনা কখনই ডাইন নহে; যদি অন্য কেহ আপনাকে এরূপ বলিয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, সে জনের হয়ত ভ্রম হইয়া থাকিবে, নতুবা হিঙ্গনা সম্পর্কে তাহার কোন দুরভিসন্ধি আছে।" আচার্য্য কি কহিবেন? তিনি মনে জানিতেছেন হিঙ্গনা ডাইন নহেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন? অল্পবয়স্কা অরুণা তাঁহাকে সতীত্ব উপহার দিয়াছেন, তিনি কিরূপে অরুণার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত আশা করিতে পারেন? তিনি কহিলেন "আমি যাহা কহিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এক্ষণে তোমাদিগের যাহা ইচ্ছাহয় কর, কিন্তু দেশের লোক সকল হিঙ্গনাকে কোন মতে ছাড়িবে না"। "হিঙ্গনা ডাইন, দেশের লোক সকল তাঁহাকে ডাইন বলিয়া অশেষ শাস্তি দিবে, হিঙ্গনার কুসুম কোমল দেহে কি সেই সমস্ত শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে?" তাহার পিতা মাতা এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন উদয় গিরিও ছল ছল নয়নে নত বদন হইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিবার উপক্রম হইল, আচার্য্য অরুণার আগমনে পাছে নিরাশ হয়েন, এই ভাবিয়া তাঁহাদিকে তাড়াইয়া দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল, অরুণা নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আচার্য্যের নিকট আসিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল"? আচার্য্যও ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "অরুণে! আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইয়াছিলাম এক্ষণে আমার হৃদয়ে আইস, তোমার সুচারু বদনখানি একবার চুম্বন করি"। অরুণা তথায় দণ্ডায়মানা থাকিয়া কহিলেন, "প্রভু! উদয়গিরিও হিঙ্গনার পিতা মাতা আপনার নিকট ছিলেন, আপনিত আমার নাম করেন নাই, হিঙ্গনাকেত ডাইন বলিয়াছেন, বলুন নতুবা আমি আর আপনার কাছে যাইব না।" আচার্য্য কহিলেন "অরুণে! তোমার আদেশ আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে পালন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার হৃদয়ে আইস"। অরুণা অল্পেং তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলেন, প্রমত্ত আচার্য্য অনতি বিলম্বে তাঁহাকে স্বীয় বাহু পাশে বদ্ধ করিলেন।

এদিকে উদয়গিরিও হিঙ্গনার পিতা মাতা বাটী আসিয়া শোকে একান্ত কাতর হইলেন। দুই এক দিন পরে দেশের লোক সকল হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। ডাইনের কঠোর * শাস্তি সমস্ত তাঁহাকে দিবে, তিনি কি সে সমস্ত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন? তখন তাঁহারা সকলে

---

* Considering the seclusion of the Gonds from civilised life, their gross ignorance, and the solitary jungles in which they live, it is perhaps not to be wondered at that the people invariably impute their misfortunes to witchcraft. If a man's bullock dies, he puts it down to witchcraft; if his crops fail, it is because the land has been bewitched by some one who is at enmity with the owner. &c......

On the accused person being arrested a fisherman's net is wound round his head to prevent his escaping or

পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে উদয় হিরনাকে লইয়া পর দিন প্রভাতে পলাইয়া যান, নতুবা অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহারা তৎপরে এক মত হইয়া হিরনাকে ডাকিয়া প্রভাতে উদয়ের সহিত পলাইয়া যাইতে কহিলেন। হিরনা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছল ছল নয়নে কহিলেন, যদি মরিতে হয় তিনি মরিবেন, কিন্তু কুমারকে না দেখিয়া তিনি গ্রামের এক পা বাহিরে যাইবেন না। তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা মাতা কপালে করাঘাত করিলেন, উদয়ের আশা কলিকায় এককালে তুহীনপাত হইল। হিরনা আর কিছু না বলিয়া অনাহারে কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন। সকলেই তাঁহাকে নানামতে বুঝাইতে লাগিলেন, তিনি কোন কথায় উত্তর দিলেন না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে পলাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন না। ক্রমে বেলা হইল, তিনি গাভীগণ না লইয়া একাকিনী গুপ্ত ভাবে সেই পর্ব্বত দেশে যাইয়া কুমারের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহার মনে যেন ইহাই হইতে লাগিল যে কুমার আসিলেই তাঁহার সমস্ত দুঃখ, আশঙ্কা দূর হইবে। তিনি "কৈ কুমার, কৈ কুমার" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিলেন, ও একদৃষ্টিতে বিগলিত নয়নে সূর্য্যদেব ও বনশ্যাম দেবের নিকট কুমারের সহিত একবার মাত্র সাক্ষাতের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হায়! তাঁহার উত্তপ্ত কাতর হৃদয়ে একবার সুবৃষ্টি হইল না, কেন হইল না? দৈব-ইচ্ছা, মনুষ্য কি বুঝিতে পারে? পরিণামেই প্রকাশ হইবে।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

bewitching his guards and he is at once subjected to the preparatory test. Two leaves of the pipal tree—one representing him and the other his accusers—are thrown upon his outstretched hands; if the leaf in his name fall uppermost he is supposed to be a suspicious character; if the leaf fall with the lower part upwards, it is possible that he may be innocent, and the popular feeling is in his favour. The following day the final test is applied; he is sewn into a sack, and in the presence of the heads of the village, his accusers, and his friends, is carried into water waist-deep, and let down to the bottom; if the unhappy man cannot struggle up or manage to get into a standing posture with his head above water, he is said, after a short pause, to be innocent, and the assembled elders quickly direct him to be taken out; if he manages, however, in his struggles for life to raise himself above water, he is adjudged guilty, and brought out to be dealt with for witchcraft. He is then beaten by the crowd, his head is shaved, and his front teeth are knocked out with a stone to prevent him from muttering incantations. Women suspected of sorcery have to undergo the same ordaal. Gazetteer of the Central Provinces of India 1870.

সঙ্গীতে রমণী-হৃদয়।

পুরুষ কর্ত্তৃক কতদূর চিত্রিত হইয়াছে।

প্রেম রূপ মহা নাটকে অভিমান দৃশ্য তৃতীয় অঙ্কে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অঙ্ক অতি বিচিত্র। ইহাতে ক্ষোভ, রোষ, ঈর্ষা, শ্লেষাচ্ছা, ক্ষণ-স্থায়ী বিচ্ছেদের দুঃখ ও মিলনের পরম সুখ যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রণয়ের চলিত অভিধানে অভিমান শব্দের "অভি" উপসর্গের লোপ হইয়া "মান" শব্দ মাত্র সাধারণে খ্যাত আছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শব্দ অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখের নিদান স্বরূপ। ইহার অবসানে অসীম সুখ, ইহার স্থায়িত্বে অসীম দুঃখ বা কবি কথায়

"উপায় না দেখি আর,
চারি দিকে অন্ধকার;
প্রাণ বুঝি যায় এবার।"

অভিমান, ক্ষোভ ও ঈর্ষা জনিত রোষ। প্রণয়ী-হৃদয়ে ক্ষোভের কারণ অনন্ত। যে কোন হেতু ভালবাসার ত্রুটি হইলে, ক্ষোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঈর্ষা ক্ষোভের অন্যতম বা গুরুতর কারণ। এইরূপ নিদান হইতে যে অভিমানের উৎপত্তি হয়, তাহার স্থায়িত্ব অধিক; কেন না, প্রকৃত ভালবাসার অংশ মাত্র দিতে বা লইতে কেহই ইচ্ছুক নহে। উহা সমস্তই আমার হউক বা অন্যের হউক এই প্রণয়ীর ইচ্ছা। সুতরাং এরূপ ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব থাকিলে, জীবনের সমস্ত সুখ-আশা এক কালে পরিশুষ্ক হয় ও তন্নিবন্ধন যে ক্ষোভ ও রোষের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রতিদ্বন্দ্বীর বা প্রতিদ্বন্দ্বীত্বের ধ্বংস হইলে এক কালে যায় না, যথা—

"যাওরে যাওরে যে ভালবাসে তোমারে,
তথায় ক* গমন রাখিবে রবে আদরে।"

কোন হৃদয়বান্ কবি অভিমানকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া অতি সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়াছেন;—

"সুখ সরোবর ছিল,
কি হেতু বল শুকাল,
হাস্য হংস কোথা গেল,
এই যে খেলিতেছিল।"

সহসা—যেন কোন কুহক প্রভাবে—নয়ন-আনন্দকর প্রেমরূপ সরোবর কি হেতু পরিশুষ্ক হইল, এবং সেই বিমল সরোবরে হংস রূপ বিধুমুখের হাস্য যাহা এই মাত্র খেলিতেছিল, তাহাই বা কেন অন্তর্হিত হইল?

কবির এই প্রশ্নের উত্তর "অভিমান।"

পূর্ব্বোক্ত সুমিষ্ট গীতে যে সকল অভিমানের লক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে এমত নহে, উহাতে প্রণয়ের প্রকৃতিও সুপ্রকাশ। প্রেম সতত ক্ষণ-ভঙ্গুর। প্রাণে অতি অল্প আঘাত লাগিলেই প্রেম তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু উহা যেমন শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় আবার যোড়া লাগিতেও বিলম্ব হয় না। প্রেমিকের নৈপুণ্য ও সাধনা গুণের তারতম্যে অভিমানের অল্প বা সমধিক অবসান হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে কোন কারণে প্রণয়ের ত্রুটী হইলে হৃদয়ে ক্ষোভের আবি-

ভাব হয়। সেই ক্ষোভ হইতে রোষের উৎপত্তি হয়, এবং সেই অন্তরস্থ রোষের বাহ্য প্রকাশের নাম অভিমান। বাহ্য জগতে যেরূপ প্রকৃতির শান্ত মধুময় মূর্ত্তি চিরদিনই দেখা যায় না, দেখিলে নূতনত্ব থাকে না; অন্তর্জগতেও সেইরূপ; এই জন্য অভিমানের এত আবশ্যক। ঘোর মেঘ, প্রবল বাত্যা, বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা, বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ প্রকৃতির শান্ত হাস্যময় ছবির পরিবর্ত্তন করিয়া যেরূপ নূতন ছবির নূতন মাধুরী প্রকাশ করে, অভিমানের নত আরক্ত বদন মণ্ডল, নয়নের ছল ছল দৃশ্য, ক্ষণ ক্ষণ রোষ প্রকাশ প্রভৃতিতে চিরপরিচিতেও নবীনত্ব সম্পাদন করে। এই সময়ে যে ক্ষোভের কারণ প্রকাশ পায় তাহা ঈর্ষা।

"সরল অন্তরে বল কারে তুমি ভালবাস,
শুধাইলে প্রাণনাথ মুচুকে মুচুকে হাস,
কার কছে রেখে মন, আমারে কর যতন,
বল দেখি প্রাণ ধন, অন্তরে কাহারে তোষ"

এই ঈর্ষাই, এই সন্দেহই সমস্ত ক্ষোভ ও সমস্ত অনর্থের মূল। প্রণয় প্রতি দিন দশ বার যাচাই হয়। আমার জানিয়া ও "আমারই" শুনিতে হৃদয় ব্যাকুল হয়। "তোমারই" একবার বলিলে প্রত্যয় হয় না। উহা যত বার শুনা যায় ততবারই শুনিতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বোক্ত গীতে নায়কের অপরাধ মন্দ মন্দ হাস্য। ইহা অন্য কোন কারণে হইতে পারে; কিন্তু প্রণয়ীর মন সতত সন্দিগ্ধ, তাঁহার ইচ্ছা যে অন্তর মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বিধাতা কাহাকেও অন্তর দেখিতে দেন নাই; এই জন্যই— সর্ব্বদা সন্দেহ, এই জন্যই এইরূপ প্রশ্ন

"সরল অন্তরে বল কারে তুমি ভালবাস"

বা

"অন্তরে কাহারে তোষ?"

পুনরায়

"জেনেছি জেনেছি নাথ তুমি সরল যেমন।
আগে মন মজাইয়ে শেষে কর জ্বালাতন॥
জানিলে এমন রীত, কে তোমারে দিত মন,
পায়ে ধরি বিনয় করি ফিরে দাও আমার মন।"

হৃদয়ে ক্ষোভ ও রোষের সঞ্চার হইলে বুদ্ধি সর্ব্বদা স্থির রহে না, এই জন্য অভিমান কালে অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বাহির হইয়া পড়ে তাহাতে অনুতাপ হয়।

"দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান।
অস্থির হতেছে প্রাণ সই তারে ডেকে আন্
অভিমানে হয়ে হত, কুবাক্য বলেছি কত,
ঐ দেখ প্রাণনাথ, মানের উপর করে মান।"

রমণী-হৃদয় সোহাগে লালিত, সোহাগে পরিবর্দ্ধিত, সোহাগ না পাইলে কতক্ষণ সজীব থাকে? অভিমানের অবসানে আবার সেই সোহাগের জন্য কাতর হইতে হয়।

শ্লেষবাক্য!

"তোমায় থাক্‌তে বলবো না নাথ দাঁড়াও যেওনা
চোখের দেখা দেখবো হে নাথ ধরে রাখ্‌বো না
যেজন তোমারে প্রাণ, করিয়াছে সমর্পণ,
দেখ যেন আমার মতন তারে মজাও না।"

পুনরায়

"যায় যাবে যাক্ যদি যাইতে পারেলো সই,
সেধনা সেধনা মানা করো না উহারে লো সই,
যার নাহি রসবোধ, মিছে তাঁরে অনুরোধ,
আপনি না মজিলে কি, কে মজাতে পারে
লো সই॥"

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

স্বপ্নোত্থান।

"সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই"

১

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে স্বপন
সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়াছে হায়!
আকুলিয়া চিত আকুলি' জীবন॥
সুখের সময় গিয়াছে কোথায়!

২

প্রভাত গগণে সুনীল সুন্দর
দিবাকর ছবি কিবা মনোহর!
—কিন্তু, বল, হায়! কতক্ষণ তার
এ দৃশ্য জগতে দেখয়ে নর!

৩

কতক্ষণ, বল, শশধর-ভাতি
উদিয়া চকোরে করে পুলকিত—
কাল মেঘ আসি' ভয়ঙ্কর অতি
ঝটিত তাহার করে আবরিত!

৪

কতক্ষণ, বল, ভাগীরথী স্রোত
থাকয়ে নিথর, নিষ্পন্দ, নিচল—
দুষ্ট সমীরণ করি' আন্দোলিত
তোলে তায় কত শত ঊর্ম্মিদল!

৫

কত দিন, বল, দুঃখের ধরায়
সুখের বসন্ত বিরাজিত রয়!
কতদিন বল, কোকিলের হায়
সুকণ্ঠ লহরী শ্রবণ জুড়ায়!

৬

থাকে না থাকে না কিছু চিরদিন—
কিবা ভালবাসা, সুখের নিলয়,
কিবা সুখভোগ, কিবা মানধন,
—কালের গতিতে সকলি লয়!

৭

জ্বলন্ত অনল হইলে নির্ব্বাণ
কেবলি অসার অঙ্গার প্রায়,
সুখ ভালবাসা করি' পলায়ন
কেবল স্মরণ রাখিয়া যায়!

৮

আজি যে কুসুম বিস্তারি' সৌরভ
চারিদিক হায় করে আমোদিত,
কালি সে কোথায়?—কোথায় সৌরভ?
শুকাইয়া পড়ি, হয় রে মুদিত!

৯

আজি যার মনে প্রেম আলাপনে
সুখের তরঙ্গ উথলিয়া দাও,
কালি সে কোথায়?—সময় পীড়নে
আর কি তাহারে দেখিতে পাও?

১০

ভাব দেখি মনে সেদিন যখন
কেটেছ সময় সুখের সম্ভাষে,
সুখের উচ্ছ্বাস, প্রণয়-পবন,
তুলিয়াছিল যে হৃদয় সরসে,

১১

কোথা সেই সুখই— মধুরে মধুর
সোনার সোহাগা কোথায় এখন?
—গিয়াছে, গিয়াছে, হইয়াছে দূর
আঁধারে প্রদীপ—আগুণে পবন!

১২

কোথা তুমি হায় প্রফুল্ল নলিনী!—
কোথা দিনমণি, আশায় পাগল,—
কোথা নিশাকর!—কোথা কুমুদিনী!—
নাই এ জগতে সুখ নিরমল।

১৩

করাল বিচ্ছেদ— অমৃতে গরল—
গ্রাসিয়াছে হায় সুখ সুধাকরে!—
সুকুসুমে কীট!—প্রণয়ে সরল
নিরদয় বিধি দেছে বিচ্ছেদেরে।

১৪

পুরিল না আশা, সুখের পিপাসা,
রহিল, রহিল অতৃপ্ত হায়!
ভেঙ্গে গেল মন!—তবু ভালবাসা
ভাঙ্গামনে কেন জাগরিত রয়!

১৫

ভাঙা মনে কেন বিদগ্ধ হৃদয়ে
তবু তারি আশে দাওরে স্থান ?
জাগ্রত নয়নে দগ্ধ হইয়ে
দেখ কেন আর সে সুখ স্বপন ?

১৬

ভেঙেছে ভেঙেছে ভেঙেছে স্বপন
সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়াছে হায় !
আকুলিয়া চিত, আকুলি জীবন
সুখের সময় গিয়াছে কোথায় !

শ্রীপা—

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেউলপোতা।

আড়িয়াদহের দক্ষিণ পল্লী দক্ষিণেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে এই পল্লী মধ্যে বাণরাজার এক প্রকাণ্ড দেবালয় ছিল। আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, সে সময়ে সেই দেবালয়ের কোনই চিহ্ন ছিল না, কেবল ৬০।৭০ বিঘা পরিমিত ভূম্যোপরি ইষ্টক ও এক প্রকার পাটল বর্ণ মৃত্তিকার পর্ব্বত প্রমাণ একটি স্তূপমাত্র বিদ্যমান ছিল। এই প্রকাণ্ড স্তূপ নানা প্রকার তৃণলতা ও মহাদ্রুমে আকীর্ণ থাকায় ইহাকে একটি জঙ্গলময় পর্ব্বত বলিয়া বোধ হইত। এখানে মনুষ্যের সমাগম ছিল না, রজনীর কথা দূরে থাকুক দিবসেও এই দেউলপোতার নিকট দিয়া একাকী যাইতে কাহারও সাহস হইত না। এই স্থানে ভূত প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের আবাস ভূমি বলিয়া সকলের সংস্কার ছিল। ঘোর নিশীথ সময়ে এই স্থানে সুমধুর রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত-সঙ্গীতধ্বনি সর্ব্বদাই শুনা যাইত এবং অত্যুচ্চ অশ্বথ শাখায় বিলম্বিতচরণে উপবিষ্টা শুভ্র বাসনা প্রেতিনী জ্যোৎস্নায় চুল শুকাইতেছে, ইহাও কখন কখন দেখা যাইত। সন্ধ্যার সহিত গোধূলী চলিয়া-গেলে, পঞ্চমীর চন্দ্রমার সহিত সদালাপ করিয়া সেঁজো তারা বিদায় লইলে, পথ ঘাট জন-শূন্য ও পৃথিবী নিস্তব্ধ হইলে, সেই ঘোর বিভীষিকা সঙ্কুল স্তূপোপরি এক দীর্ঘাকার মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত, গলদেশে গুচ্ছবদ্ধ শুভ্র যজ্ঞোপবীত, এবং কটিদেশে পরিহিত শুভ্র বসনোপরি এক খানি রঞ্জিত গাত্রমার্জ্জনী ত্রিকোণাকারে আবদ্ধ ছিল। সেই মূর্ত্তি স্তূপের অতি উচ্চ স্থান হইতে অবনত হইয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া স্তূপজাত কণ্টাকাকীর্ণ জঙ্গল ভেদ করতঃ ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া এক বাপী-কূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জলাশয় কূপের ন্যায় গভীর অথচ প্রশস্ত এবং নানা প্রকার পঙ্কজ-লতায় অলঙ্কৃতা। তড়াগের সুবিশাল কৃষ্ণাভ বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী একটি যুবতী দ্বারা যথেচ্ছা সঞ্চালিত হইতে ছিল। রমণী কৃষ্ণবর্ণা ও আলুলায়িত-কেশা, তাহার ঘন কুঞ্চিত

কুন্তল-দা'ম লম্বমান হইয়া স্থূল নিতম্ব স্পর্শ করিয়াছিল এবং বসনাঞ্চল দক্ষিণ স্কন্ধদিয়া কটিদেশ বেষ্টন করায় তাহার উন্নত বক্ষস্থল এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডল ও অঙ্গের গঠন অতীব মনোহর; ফলতঃ এই চার্ব্বাঙ্গীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ সুগঠিত যে সেরূপ সুঠাম গঠন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বামা এক হস্তে হাইল ও অপর হস্তে জালের দড়ি ধরিয়া মহোল্লাসে এই গীতটি গান করিতেছিল।

চাকা চাকা মেঘ উঠেছে।
চাঁদ উঠেছে আকাশে॥
চাঁদের আলো জ্বলছে জলে।
ঢেউ উঠেছে বাতাসে॥
চলে আয় সাম সোল
চেলা চেতল রাঘবোল
দেখে যাবে হেলারহাসি
পলাশ কেন তরাসে।

আগন্তুক তীরস্থ জঙ্গল হইতে একখানি ভেলা টানিয়া বাহির করিল এবং তাহা জলে ভাসাইয়া আপনি তদুপরি আরোহণ করিয়া সেই রমণীর প্রতি ধাবমান হইল।

আগন্তুককে দেখিবা মাত্র গায়িকা নীরব হইল এবং তরণী ভিন্ন দিকে চালাইয়া দিল। আগন্তুকও সেইদিকে ধাবমান হইল এবং রমণীর নিকটবর্ত্তী হইলে, রমণী গতি পরিবর্ত্তন করিল কিন্তু তাহার বহিত্র একটী লতায় সংলগ্ন হওয়াতে আর যাইতে পারিল না। আগন্তুক দ্রুত বেগে যাইয়া নৌকা ধরিল।

রমণী নিরুপায় হইয়া বলিয়া উঠিল ডেক্‌রা বামুন আবার এসেছিস্'

আগন্তুক। দেখি-কি মাছ ধরেছিস্?

রমণী।—তোকে দেখাব কেন!

আগন্তুক। তুই এমনি করে রোজ২ মাছ ধরিস্, আজ তোকে ধরিয়ে দিব।

রমণী। তুইত আমাকে ধরিয়ে দিবি। কিন্তু তুই কাল কোথা গিয়েছিলি বল্ দেখি?

আগন্তুক। (একগাছি কণ্ঠহার দেখাইয়া) দেখেছিস্।

রমণী। কার সর্ব্বনাশ করে এসে ছিসু?

আগন্তুক। নিবি?

রমণী। ডেক্‌রা বামুন, তুই আমায় সোনার লোভ দেখাচ্ছিস্? গহনা গাঁটির লোভ থাক্‌লে, কজ্জলকে আর এমনকরে মাছ ধরে খেত হত না।

আগন্তুক। নিবিনি? তবে তুই কি চাস্?

রমণী। আমি কিছুই চাইনা, কেবল তোর ও কালামুখ আমায় আর দেখতে না হয় এই চাই।

আগন্তুক। পোড়রমুখি! এই কি তোর ভাল বাসা?

রমণী উত্তর না দিয়া গান ধরিল।

প্রেম পীরিতি ভালবাসা ছেচ্‌ড়া করে খাব সই।
সবাই দেখি ছেচ্‌ড়া ওলো, ভালবাসার মানুষ কৈ!

যে বুঝে না মনের বেদন,
ছি ছি, তার সনে কি মনের মিলন।
মনের মতন পুরুষ রতন পাই যদি তার দাসী হই।

আগন্তুক।—কেন কজ্জলা আমি কি তোকে ভাল বাসি না?

রমণী।—মুখে আগুণ, "তোর ভালবাসার" অমন ভালবাসা আমি চাই না। ভালবাসার কাজ তুই করলি কৈ?

আগন্তুক।—কেন কি করতে হবে বল্ না।

রমণী।—মর, আমি তোকে বলে দেব যে

তুই আমায় এমনি করে ভাল বাস, তবে তুই আমায় ভাল বাস্‌বি? এ কথা বল্‌তে তোর একটু লজ্জা হল না! কেমন করে ভাল বাসে, তাও কি আবার শিখিয়ে দিতে হয়?

আগন্তুক। এখন তোর ও হেঁয়ালির কথা রাখ। কি চাস্‌, তাই বল?

রমণী।—ওরে বামনা, কত বার করে বলতে হবে। আসল কথাই তুই ভুলে যাস্‌ যে,—

আগন্তুক।—নারে ভুলিনি সব মনে আছে, (কজ্জলার গণ্ডে হস্তার্পণ।)

কজ্জলা। দুর দুর, দুর হ, বামনা, দুর হ।

আগন্তুক। আমর ছুঁড়ি, দুর দুর করিস্‌ কেন? তুই যা বলবি তাই করব।

রমণী। তুই আমায় নিকে করতে পারবি? পৈতে ফেলতে পারবি?

আগন্তুক। এই বইত নয়? ওরে প্রেমের কাছে জাতি ভেদ কতক্ষণ রয়।

রমণী। বাম্‌না, তোর কথায় আমি ভুলিনে। তোর ভালবাসা আমি কাজে দেখতে চাই।

আগন্তুক। আচ্ছা তাই হবে। এখন এই হার ছড়াটা পর্‌।

রমণী। আমর! পরের হার আমি পরতে গেলেম কেন?

আগন্তুক। আমি কি তোর পর?

রমণী। তুই আমার কে?

আগন্তুক। এখন নেক্‌রা রাখ। নিবি কি না বল?

রমণী।—না আমি কখনই নেব না। যার জিনিস্‌ তাকে যদি ফিরে দিয়ে আস্‌তে পারিস্‌, তবে জানব যে, তুই আমায় ভাল বাসিস্‌।

আগন্তুক। এত আমার জিনিস্‌, আমি তোর গলায় পরিয়ে দিব।

এই কথা বলিয়া আগন্তুক যেন রমণীর কণ্ঠে হার পরাইতে গেল রমণী অমনি ধাক্কা মারিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দিল এবং দ্রুত নৌকা বাহিয়া তীরে যাইয়া নামিল।

কজ্জলা ডুলের মেয়ে, অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সে বিধবা হয়, তাহার পিতা মাতা কেহই ছিল না। যদিও নীচ জাতির প্রথানুসারে তাহার পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণে কোন ও বাধা ছিল না তথাপি সে এপর্য্যন্ত তাহা করে নাই। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে মনের মত পুরুষ না পাইলে সে বিবাহ করিবে না। কজ্জলা যদি ও এপর্য্যন্ত নিকে করে নাই, যদিও সে আজন্ম দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত,তথাপি তাহার চরিত্রের প্রতি কেহ কখন কোন রূপ দোষারোপ করিতে পারে নাই। সে কি দিনমানে, কি রাত্রি কালে সর্ব্বদাই দেউল পোতায়, নির্ভয়ে যাতায়াত করিত বলিয়া সকলেই তাহাকে উপদেবতাশ্রিত বলিয়া জানিত। কজ্জলা যে ব্যক্তিকে জলে ফেলিয়া দিল, পাঠক তাহাকে আর একবার আর একস্থানে আর এক বেশে দেখিয়াছেন এবং বোধ হয় চিনিতে ও পারিয়াছেন, সে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু রত্নাপাখী। রতন সন্তরণ করিয়া তীরে উঠিল এবং আর্দ্র বস্ত্রে ও বিরক্ত চিত্তে দেউল পোতা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

প্রবাসে।

আরাকানে একদা আমার মস্তক কণ্ডু উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসী কোন বন্ধুকে মাথা দেখিতে বলায় তিনি নিম্নলিখিত উকুনের গল্পটী বলিয়া ছিলেন। কোন সময়ে আরাকান পতির ভয়ানক মস্তক কণ্ডু উপস্থিত হইলে, অনেক ঘর্ষণেও তাহার প্রতিকার হইল না ; প্রত্যুত তাহাতে আরও উহা বর্দ্ধিত হইল। উকুন কাহারে বলে, আরাকানের লোকে এপর্য্যন্ত তাহা জানিত না। সুতরাং রাজা মহিষীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার দন্তঘর্ষণী লইয়া দেখ ত আমার মাথায় কি হইয়াছে। আমার বোধ হয়, যেন শৃগাল উহাতে বাসা করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহিষী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন এবং বিশেষ সন্ধান পূর্ব্বক মৎকুন জাতীয় কীট বিশেষ আবিষ্কৃত করিলেন। ঐ কীট পূর্ব্বে কখন আরাকানে দেখা যায় নাই। সুতরাং সমুদায় সমবেত সভাসদ ও মহিষীর সহচরীরা দর্শন করিয়াও তাহা কি নির্ণয় করিতে পারিল না। জ্যোতির্ব্বিদ্ ও মায়াবিদ্দিগকে আহ্বান করিলে, তাহারা কহিল, এদেশে ইহার জন্ম হয় নাই। কেননা গ্রহগণ ইহার বিষয় কিছুই অবগত নহে। রাজা শুনিয়া অতিশয় উন্মনা হইলেন এবং পুনরায় ব্যাকুল হইয়া, মস্তক ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদায় রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কোন ব্যক্তি এই নবাগত জন্তুর নাম ও জন্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিবে তাহাকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

অনন্তর সেই কীটকে সোণার বাক্সে বদ্ধ করিয়া সকলে দেখিতে পাইবে এই আশয়ে প্রাসাদের সিঁড়ীতে রাখিয়া দিলেন। ঐ সময়ে রাজার ঘোষণা দেশে২ প্রচার হইয়া পড়িলে, এক রাক্ষস তাহা শুনিতে পাইল। বিধাতা পৃথিবীতে চারিদিকে যে প্রাচীর বদ্ধ করিয়াছেন এবং যাহা শেষ দিনে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, ঐ রাক্ষস তাহার অপরদিকে বাস করিত। সে মায়াবলে জানিতে পারিল, আবুল খাঁ নামে একজন বাঙ্গালা দেশীয় বণিকের মস্তক হইতে ঐ কীট আরাকানে প্রবেশ করিয়াছে। আবুল খাঁ কাপড়ের ব্যবসায় উপলক্ষে আরাকান নগরে আগমন করে এবং তৎকাল পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর গৃহে বাস করিতেছিল। রাক্ষস সুন্দর পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং সমুদায় বৃত্তান্ত রাজার গোচর করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ আবুল খাঁকে ধরিয়া আনিলেন, এবং ঘটনা সত্য জানিয়া সাপের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত রাক্ষসের বিবাহ দিলেন। ঐ কন্যা দেখিতে অতিশয় কুৎসিত। এদিকে কিছু দিন রাজসভায় বাস করিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিবার জন্য রাক্ষসের অতিশয় ইচ্ছা হইল। পাছে লোভ সংবরণ করিতে না পারে এই ভয়ে সে একাকী এক স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর রাজকুমারীর আগ্রহে সে শ্বশুরের নিকট গমন ও প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে গ্রহাচার্য্যগণ শুভদিন

ও শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলে সে স্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিল। রাজ্ঞী জামাতার সম্মান জন্য কতিপয় শরীর রক্ষক সঙ্গে দিলেন। ঐসময়ে রাক্ষসের অতিশয় ক্ষুধা হওয়াতে, সে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই পথি মধ্যে অবস্থিতি করিল এবং স্ত্রীকে কহিয়া তিন জন রক্ষীর সহিত শিকার করিতে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতে না করিতেই তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। অনেকদিনের পর নরমাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার অতিশয় তৃপ্তি বোধ হইল। অনন্তর সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সমভিব্যাহারী তিন জনই আরাকানে ফিরিয়া গিয়াছে। সে প্রতিদিনই এই প্রকার ব্যবহার করিতে লাগিল তাহাতে পৃথিবী ও আপনার সীমার মধ্যবর্ত্তী অরণ্যের নিকটে আসিতে না আসিতেই সমুদায় রক্ষী নিঃশেষ হইয়া গেল। এই সকল দেখিয়া স্বামীর প্রতি রাজকুমারীর অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিল। তাহাতে শেষ দিন রাক্ষস শিকারে গমন করিলে, তিনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, এই ভয়ানক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল এবং তখনই পলাইয়া আসিয়া আপনার প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত হইলেন। ঐ সময়ে রাক্ষস ও ভুক্তাবশিষ্ট মাংস লইয়া দ্রুতগতি ফিরিয়া আসিল। রাজকুমারী তাহার পদ শব্দ শুনিয়াই, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যদি আমি সতী হই এবং জন্মাবধি কোন কুকর্ম্ম না করিয়া থাকি, তাহা হইলে, পিতার গৃহ হইতে এই যে প্রদীপ আনিয়াছি, এই মুহূর্ত্তেই ইহা উন্মুক্ত হউক এবং রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা করুক। বলিতে বলিতে প্রদীপ উন্মুক্ত হইল এবং রাক্ষস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে তাঁহাকে লুক্কায়িত করিল। তদ্দর্শনে রাক্ষস নিতান্ত রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রদীপে মুগুরের আঘাত করিল এবং তাহা কাটিয়া ফেলিল কিন্তু কিছুই হইল না। তাহাতে সে নিকটবর্ত্তী নদী মধ্যে উহা ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে আপনার দেশে চলিয়া গেল। এদিকে প্রদীপটী ভাসিতে ভাসিতে তীরে লাগিয়া গেলে এক রাজকুমার দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লইয়া আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন। রাত্রি হইলেই রাজকুমারী তাহা হইতে বাহির হয়েন; গৃহ পরিষ্কার করেন, রাজকুমারের জন্য রন্ধন করেন, পান করেন, আপনি কিছু ভক্ষণ করেন; পরে রাজকুমারের পোসাকে একটু পানের পিকের দাগ দিয়া, পুনরায় দীপে প্রবেশ করেন এবং লুকাইয়া থাকেন। রাজকুমার প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া এই সকল দেখিতে পাইয়া প্রথম দিন অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। অনন্তর উপরি উপরি তিন দিন এই প্রকার ঘটিলে, তিনি জাগিয়া থাকিতে মানস করিলেন। এবং রাত্রি আসিলে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলে একটি ছুচ বিঁধিয়া রাখিলেন। তাহার যন্ত্রণায় ঘুম আসিল না। ঐ সময়ে রাজকুমারী বাহির হইয়া আপনার কাজে ব্যস্ত হইলে অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বিবাহ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন,,। এদিকে রাক্ষস মনদুঃখে উহাদের কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে মস্তকে উকুনের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিল।

পৌত্তলিকতা।

পাবনা কি সীতানাথ, সৎস্বরূপ হেরিতে ?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়া, জগদম্বা পূজিতে ?

হেমচন্দ্র।

আমরা দেখিতেছি শক্তিবিনা কোন কার্য্যই হইতে পারেনা। অতএব এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড-এই অনন্ত জীব ও জড় জগৎ—এই জ্ঞান ও চৈতন্যের অসীম রঙ্গভূমি অবশ্যই কোন এক শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে শক্তি কি ? তাহা আমরা জানিনা- আমাদের এই সসীম সংকীর্ণ সত্ত্বায় তাহা জানিবার ও উপায় নাই। সেই সৃষ্টি কারিণী, বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি কি প্রকার তাহা জানিবার, কাহার ও ক্ষমতা নাই; এইজন্য তিনি অচিন্ত্য-অব্যক্ত-রূপা বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। যদি ও আমরা জানি যেইহজীবনে কখনই তাঁহাকে জানিতে পারিবনা। তথাপি তাঁহার স্বরূপ জানিবার বাসনা মানব স্বভাবের যেন এক অপরিহার্য্য অংশ হইয়া রহিয়াছে। বেদান্তের সৃষ্টি, ন্যায়ের সৃষ্টি, পাতঞ্জলের সৃষ্টি কেবল সেই অপরিজ্ঞেয় শক্তিতত্ত্ব জানিবার জন্য, সেই অপরিজ্ঞেয় তত্ত্ব জানিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যের, ও মিলের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। যোগের সৃষ্টি সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য; ইয়োরপ, আমেরিকায় ভূতের আরাধনা, যে হইতেছে তাহাও সেই তত্ত্ব জানিবার জন্যই এবং কেবল সেই তত্ত্ব জানিবার জন্যই আলকট, ও ব্লাভ্যাটস্কি এত কষ্ট, এত পরিশ্রম ও এরূপ অসাধারণ কঠোর সাধনা করিতেছেন। অতএব আদ্যাশক্তির প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা মানব স্বভাবের অপরিহার্য্য গতি—কাহার সাধ্য সে গতি প্রতিরোধ করে ? ঈশ্বর কিরূপ যদিও আমরা জানিনা, তথাচ ঈশ্বর ভাবনা মানব স্বভাবের অপরিহার্য্য যে আজন্ম কখন ও পিতাকে দেখে নাই তাহার কি পিতৃভাবনা হয় না ? সে অবশ্যই মনে মনে পিতার স্নেহময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লয়। রূপ কল্পিত হইলেই প্রেম ও ভক্তি স্বতঃই হৃদয়ে সমুদিত হইয়া থাকে। যে খানে মূর্ত্তি নাই সে খানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই। প্রেম ও ভক্তি স্থাপনের আধার চাই। রূপ কল্পনা না করিলে সাধকের সাধনাই হয় না, ভক্তের ভক্তি জন্মে না। গর্ভে সন্তান সঞ্জাত না হইলে জননীর স্তন্য কখনই জন্মে না। অতএব রূপ-কল্পনা না করিলে ঈশ্বরোপাসনা হইতেই পারে না। নিরাকার উপাসনা অসম্ভব, নিরাকার উপাসনা কথার কথা মাত্র নিরাকার উপাসনা মনে আঁখিঠার মাত্র। পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সাধনা প্রণালী নাই। পৌত্তলিকতা ছাড়া ধর্ম্ম নাই অপৌত্তলিক আরাধনা হইতেইপারে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম সকল ধর্ম্মই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। সকল ধর্ম্মেরই মূল ভিত্তি এক, এবং সকল ধর্ম্মই, স্রোত পরম্পরার ন্যায় এক অভিন্ন অনন্ত সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। অতএব যে হিন্দু

সেই মুসলমান, যে মুসলমান সেই খৃষ্টান এবং যে খ্রীষ্টিয়ান সেই ব্রাহ্ম। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান সকলেই সমান পৌত্তলিক। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম ও এক, অতএব সকলেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত। তবে ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব কেন? যাহারা, প্রতিমা পূজক বলিয়া হিন্দুদিগের নিন্দা করে, নিন্দা করিবার পূর্ব্বে, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাহারা নিজে পৌত্তলিক কি-না?

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

একপাত নূতন আরব্য উপন্যাস।

পূর্ব্বে বোগদাদ নগরে এক অতুল ধন সম্পত্তিশালী বণিক ছিল। বণিকের তিনটি মাত্র কন্যা। বণিক পত্নী ছোট কন্যাটিকে প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করিল। বণিক স্ত্রী-বিয়োগে অত্যন্ত কষ্ট পাইল। কি করে, আল্লার ইচ্ছা, উপযুক্ত দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া কন্যা তিনটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন না।

বণিকের তিনটি কন্যাই অপূর্ব্বা সুন্দরী। জ্যেষ্ঠার বয়স ১৬ বৎসর, পূর্ণ যৌবনা। মধ্যমার বয়স ১৪ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়স এই ১২ বৎসর মাত্র। তিনটির মধ্যে ছোটটি রূপমাধুরীতে শ্রেষ্ঠ। দিল চম্প কন্যাকালেই এতদূর রূপবতী, যে তাহাকে যাহারা দেখিত সকলেই এক বাক্যে বলিত যে ইহার যৌবনাবস্থায় কোন রমণীই ইহার সদৃশ হইতে পারিবেনা। দিল চম্পর যেমন রূপ তেমি গুণ। স্ত্রীলোকে যেসকল গুণ থাকিলে রমণীয় হয় সে সকল গুণই দিলচম্পের ছিল।

বড় বড় ওমরাও দিগের পুত্রেরা বণিক কন্যাদিগকে বিবাহ করিবার বাসনায় লালায়িত হইয়া পড়িল। একদিকে সুন্দরী স্ত্রী আবার বণিক অপুত্রক, মৃত্যুকালে তাহার বিষয়ের লোভ।

ব্যবসায়ের গতিক, বাণিজ্যে বণিকের ক্রমে লোকসান হইতে লাগিল। একবার এমন ঝড় হইল যে বণিকের সমস্ত জাহাজগুলি জলমগ্ন হইয়া গেল। ঐ জাহাজ গুলির উপরই বণিকের সমস্ত আশা ভরসা ছিল। যে দিনের অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বণিক আজ সামান্য লোকের দশা প্রাপ্ত।

বণিক নগরের বাটীখানি বিক্রয় করিল। আসবাব, পোষাক, অলঙ্কারাদি সমস্তই বিক্রয় করিয়া নিকটস্থ একগ্রামে একখানি সামান্য বাটী ক্রয় করিয়া বণিক তথায় বাস করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বয়সে পুনর্ব্বার ধন উপার্জ্জন করা অসম্ভব। ভাগ্যে যাহা আছে কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারে না, এই ভাবিয়া বণিক আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া রহিল। বণিকের ছোট কন্যাটি সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিত।

অপর কন্যা দুটির দিন কাটান ভার হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেরমতন দাসদাসী নাই, সেরূপ জমকাল পোষাক নাই, সহরের গোলমাল নাই। বিশেষ রূপ লাবণ্য সম্পন্ন ওমরাও পুত্রদিগের খোসামোদ নাই। পিতার বৃদ্ধ বয়সে এই দুর্দ্দশা। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা দূরে থাক, তাহারা বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করিত না। দুটিতে সর্ব্বদাই একত্রে থাকিয়া বড়

ঘরে বিবাহ হইলে কিরূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিবে সেই সকল সুখের স্বপ্ন দেখিত। গৃহ কার্য্য সমস্ত বালিকা দিলচম্পের স্কন্ধে পড়িয়াছিল তাহারা কেবল খাবার সময়ে আসিয়া অনুগ্রহ করিয়া চারটি খাইয়া যাইত মাত্র।

দিলচম্পের ভগ্নীদ্বয় কখন বা অবস্থা সম্ভব বেশভূষা করিয়া বাটিহইতে বহির্গত হইত। ভাবিত, যদি সেই পথ দিয়া বাদশাহ কুমারেরা শিকার করিতে যায়, তাহাদের অলৌকিক রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাহাদের ভাগ্যে যে এই রকম কোন একটা ঘটনা হইবে, সেবিষয়ে উভয়ের মনে তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই রূপে দুইবৎসর অতীত হইল। একদিন বণিকের নিকট সংবাদ আসিল যে তাহার সমস্ত জাহাজ গুলি জলমগ্ন হয় নাই তন্মধ্যে তিন খানি জাহাজ বায়ুবেগে অপর দিকে গিয়া পড়িয়াছিল, এখন বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সংবাদ পাইয়াই বণিক একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল। এবং পশ্চিম মুখ হইয়া যিনি রজনীর পর দিবার সৃষ্টি করেন, দুঃখের পর সুখ আনিয়া দেন সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

বণিক তিনটি কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইল। খোস খবর পাইয়া দিলচম্পের ভগ্নীদ্বয় আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা বণিককে কহিল "বাবা, তোমাকে এখন বিষয়ের অধিকার লইতে বস্রায় যাইতে হইবে, কিন্তু বাবা, আসিবার সময় আমাদের জন্য একটা করিয়া উত্তম পোসাক আনিও"। মধ্যমা হাসিয়া বলিল "দেখ বাবা, দিলচম্পা বড় একটা পোষাক পরিতে ভালবাসে না, তবে না হয় দুটি পোষাক এন আর আমাদের জন্য তিনটি ক্রীতদাসী ও তিনজন খোজা আনিও কেননা ভাল কাপড় চোপড় পরিলে, দাস দাসী না থাকিলে ভালদেখায় না'। বণিক বলিল "পরমেশ্বর যদি আবার দিন দেন, তাহ'লে দাসদাসীর ভাবনা থাকিবে না, কেন না তোমাদের সুখ দেখিলেই আমার বৃদ্ধ বয়সের সুখ। হ্যামা, দিলচম্প, তোর কি কোন ফরমায়েস নাই মা" ?

দিলচম্প পিতার নিকট কখন কোন আবদার করিত না। পিতা বস্রায় যাইবেন, সেখানে কত দিন দেরি হইবে, কে তাঁর সেবা করিবে সে মনে মনে এই সকল ভাবিতে ছিল। হঠাৎ বণিকের প্রশ্নে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিককরিতে পারিল না, শেষে বলিল"হঁ্যা বাবা,তুমি কবে আসিবে।" বণিক বলিল "আমি অতি শীঘ্র আসিব কাজির নিকট বিষয় বুঝিয়া লইয়াই বোগ্‌দাদে আসিব, সেখানে বাসোপযোগী এক খানি বাটী ক্রয় করিয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইব।" "কাজির নিকট যাবে কেন বাবা ? " দিলচম্প বলিল। বণিক হাসিয়া বলিল "কাজির নাম শুনিয়াই তোর ভয় হইয়াছে ? দৈব দুর্ঘটনায় যে সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহা পুনর্ব্বার পাওয়া গেলে সেগুলি কাজির নিকট জমা হয়। কাজি বিচার করিয়া যথার্থ অধিকারীকে সে গুলি বুঝাইয়া দেন। এখন তোমার কি চাই, মা, বল! দিলচম্পা বলিল "আমার জন্য কি আর আনবে বাবা, পারত বস্রা হইতে একটী গোলাপ গাছ এন। গোলাপ ফুল

আমি; বড় ভাল বাসি।” দিলচম্পের কথা শুনিয়া তাহার দুই ভগ্নী হাসিয়া উঠিল তাহারা বণিককে বলিতে লাগিল “দেখ বাবা, দিল আর জন্মে ছোট লোক ছিল, কেমন পুণ্যের জোরে আমাদের বোন হয়েছে। কোন্ সময় কি বল্‌তে হয় তা জানে না তুমি তাই ওকে সাধিতে ছিলে আমরা হলে ওকে বাঁদি করিয়া রাখি। যে যেমন।

বণিক একটী গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনটী মেয়েকে নিকটে ডাকাইয়া বলিল “দেখ মা, তোমারা পরস্পরে ঝগড়া করিও না আমার অনুপস্থিতিতে অতি সাবধানে থাকিও।” পরে কন্যাগুলির শিরশ্চুম্বন করিয়া বস্রাভিমুখে যাত্রা করিল!

বণিক বস্রায় উপস্থিত হইয়া কাজির নিকট একখানি আবেদন করিল। এদিকে এক জন জুয়াচোর ইতি পূর্ব্বে বণিকের সম্পত্তি নিজের বলিয়া কাজির নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিল। দুই পক্ষে মকর্দ্দমা হইতে লাগিল। কাজি দুই পক্ষের জবান্‌বন্দি শুনিয়া বিচার করিলেন যে মকর্দ্দমায় বিস্তর গোল অতএব সম্পত্তি রাজসরকারে জমা হইবে। কেহই কিছু পাইবে না। কাজির বিচার!

বণিক হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ পৃথিবীর এই নিয়ম। কিন্তু বণিকের অদৃষ্টে তাহার বিপরীত হইল। সুখের পর দুঃখ ভোগ হইতে ছিল বটে কিন্তু দুঃখের পর সুখ না হইয়া অধিক দুঃখ লাভ হইল। যা কিছু বণিকের সংস্থান ছিল, মকর্দ্দমার খরচায় তাহাও গেল। এখন ভিক্ষা ভিন্ন উপায় রহিল না। বড় মেয়ে দুটীর ফরমায়েস মনে করিয়া বৃদ্ধ বণিক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাহারা কত আশায় বণিকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আকাশে ভয়ানক মেঘ হইল। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। আরে বাপরে, আবার বজ্র ধ্বনি! একে সন্ধ্যা তাহাতে মেঘ। সম্মুখে কিছুই দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যায়। উত্তরোত্তর ঝড় বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল। ভয়ানক আক্রোশ। কেন না হইবে, আক্রোশের উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছে কি না। বণিকের গর্দ্দভটী এক স্থানে স্থির হইয়া রহিল বণিক তৎপৃষ্ঠে থাকিয়া রীতি মত ভিজিতে লাগিল।

হাজার হউক স্ত্রীলোকের কোমল প্রাণ কি না, চপলা বণিকের কষ্টে চঞ্চলা হইয়া পড়িল। দুর্দ্দান্ত স্বামীকে নিবারণ করা বড় সহজ নহে। মধ্যে মধ্যে বণিককে পথ দেখাইবার জন্য আলো ধরিতে লাগিল। বণিকের গর্দ্দভ বিদ্যুতালোকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সম্মুখে একটী অট্টালিকা দেখিয়া গর্দ্দভটী যথেচ্ছাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ফটক পার হইয়া আস্তাবল। আস্তাবলে আলো জ্বলিতে ছিল। বণিক দেখিল আস্তাবলে এক শত অশ্ব ও এক শত গর্দ্দভ রাখিবার স্থান রহিয়াছে। এবং শত অশ্ব ও শত গর্দ্দভের আহারোপযোগী দানা ও ঘাস রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানে একটীও অশ্ব কিম্বা একটীও গর্দ্দভ নাই। গর্দ্দভটী আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই না দেখিয়া সচ্ছন্দে আহারে মন নিবিষ্ট করিল। বণিক গাধাটীকে সেই খানে রাখিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কি আশ্চর্য্য দ্বারে দ্বারবান নাই, চাকর লোক জন কেহই নাই,

জন প্রাণীর সম্পর্ক নাই। উপরে উঠিয়া একটী গৃহে আলো দেখিতে পাইয়া বণিক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী মেজ। মেজের উপর নানা বিধ উপাদেয় আহার সামগ্রী প্রস্তুত। ঘরের এক পাশে আলনার উপর এক স্যুট উত্তম পরিচ্ছদ রহিয়াছে।

বণিক এক খানি চৌকির উপর বসিয়া গৃহস্বামীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কাহারও দেখা নাই। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে বণিকের ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর অপেক্ষা করা বৃথা ভাবিয়া বণিক আপনার আর্দ্র বসন পরিত্যাগ করিয়া আলনার পরিচ্ছদটী পরিধান পূর্ব্বক মেজের খাদ্য সামগ্রী উদরসাৎ করিতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইলে গৃহ মধ্যস্থিত এক খানি কৌচের উপর শয়ন করিয়া শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, বণিক গাত্রোত্থান করিয়া আপনার কাপড় গুলি পরিধান পূর্ব্বক পরিচ্ছদটী আলনায় রাখিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। এত বেলা হইয়াছে, কিন্তু বাটী মধ্যে মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই। বণিকের এখন বিলক্ষণ ভয় হইল। একি কোন দৈত্যের বাড়ি? নিশ্চয়ই তাই। এরূপ জনশূন্য বৃহৎ অট্টালিকা ত কখনও দেখা যায় না। বণিক বাটীর সমস্ত গৃহ গুলি দেখিতে লাগিল। এরূপ সুসজ্জিত গৃহ সে রাজপ্রাসাদ মধ্যেও দেখে নাই। উপরের ঘর গুলি দেখা হইলে নীচে আসিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া বণিক দেখিল, প্রাতঃক্রিয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। বণিক তথায় প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া অপর একটি ঘরে যাইয়া দেখিল তথায় প্রাতঃকালের আহারোপযোগী সকল রকম উত্তম খাদ্য সামগ্রী সাজান রহিয়াছে। ভয়ে ভয়ে যৎসামান্য আহার করিয়া আস্তাবলে আসিয়া দেখিল তাহার গাধাটী সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

বণিক করপুটে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বলিতে লাগিল "হে দৈত্যরাজ! আমি আপনার বিনানুমতিতে আপনার বাটীতে এক রাত্রি বাস করিয়াছি। প্রভু! আমি আশ্রয় হীন হইয়া এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, অতএব নিজ গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। উদ্দেশে বিদায় গ্রহণ করিতেছি, বিদায় দিন।"

বণিক গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল। বাটীর বহির্ভাগে অপূর্ব্ব মনোহর উদ্যান। উদ্যানটি রাত্রি কালে বণিকের নজর হয় নাই। চতুর্দ্দিকে পুষ্পের আঘ্রাণে মন পুলকিত করিতেছে। একদিকে অসংখ্য গোলাপ গাছ রহিয়াছে। গোলাপ গাছ দেখিয়া বণিকের দিলচম্প কন্যাকে মনে পড়িল। "আহা মা আমার একটী সামান্য গোলাপ গাছ লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। অপর দুটি যাহা যাহা চাহিয়াছিল, ঈশ্বর আমার এমনি অবস্থা করিয়াছেন যে তাহাদের একটিও আশা পূর্ণ করিতে অক্ষম। কিন্তু দিলের আমার কখনও কোন আবদার নাই। যখন যা দিয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট। এই স্থান হইতেই একটি গোলাপ গাছ তুলিয়া লই, দৈত্যরাজ এরূপ অতিথি সৎকারের পর একটি সামান্য গাছ লইলে কি রাগ করিবেন?"

সাত পাঁচ ভাবিয়া, বণিক একটি ভাল গোলাপ চারা উপাড়িয়া লইল। যেমন গাছটী তুলিয়াছে, অমনি পৃথিবী কম্পিত

হইতে লাগিল, বণিক দাঁড়াইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কোথা হইতে ভয়ানক বিকট শব্দ হইতে লাগিল। বণিকের সমুখে রাশি রাশি ধূম উত্থিত হইয়া গগন স্পর্শ করিতে লাগিল। বণিক ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, চাহিয়া দেখিল সমুখে এক বিকটাকার মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল "কে, রে অকৃতজ্ঞ পামর! তোমাকে কাল নিরাশ্রয় দেখিয়া আশ্রয় দান করিলাম, ক্ষুধাতুর দেখিয়া রাজভোগাপেক্ষা উত্তম আহারীয় দ্রব্যে তোর উদর পূর্ত্তি করাইয়াছি। কৃতঘ্ন ইহাতে ও তোমার মন উঠিল না, শেষে অতিথি সৎকারের পুরস্কার স্বরূপ প্রাণীহত্যা করিতেছ?"

বণিক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "প্রভু, দৈত্যরাজ, কিসে প্রাণীহত্যা করিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, অপরাধের মধ্যে আপনাকে না বলিয়া একটি গোলাপ চারা লইয়াছি। প্রভু, প্রভু, প্রভু—

বিকটমূর্ত্তি কহিল "থাম্ থাম্ পামর; প্রভু, প্রভু বলিয়া তোর আর খোসামোদ করিতে হইবে না। আমি তোর প্রভু নই, দৈত্যরাজ ও নই, আমি একটি রাক্ষস, কেন গোলাপ চারা লইলি বল, পরে তোর সমুচিত শাস্তি দিব।"

"রাক্ষসরাজ, আমার দুর্দ্দশার কথা কি বলিব আমার"—বলিতে বলিতে বণিক কাঁদিয়া ফেলিল।

রাক্ষস কহিল "কাঁদিলে কি হইবে, কাহার জন্য গোলাপ চারা লইয়াছিস্ বল, সত্য না কহিলে তোকে বধ করিব।"

বণিক কম্পিত স্বরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিতে লাগিল। রাক্ষস শুনিয়া বলিল নির্ব্বোধ, প্রথম ভাবিয়া ছিলাম তোকে বধ করিব, কিন্তু প্রাণে না মারিয়া তোর দুই চক্ষু উৎপাটন করিব, কারণ পাপ চক্ষে পুনরায় পরদ্রব্যে স্পৃহা না জন্মায়।

এই কথা শুনিয়া বণিকের হৃৎকম্প হইল বণিক বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া দেখিল যে রাক্ষস ক্ষমা করিবার লোক নহে। শেষে নিরুপায় দেখিয়া রাক্ষসকে কহিল, রাক্ষসরাজ যদি নিতান্তই আমাকে অন্ধ করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে আমাকে কিঞ্চিত সময় দান করুন, আমি একবার বাটি যাইয়া, কন্যা তিনটির বিবাহ দিয়া আসি, তখন আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করিবেন।" রাক্ষস সম্মত হইলে বণিক তিন মাস সময় লইয়া চলিয়া যায়, এমন সময় রাক্ষস কহিল "বণিক এক কাজ কর, তোর মেয়ে তিনটির উত্তম পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিতে হইলে কিঞ্চিৎ ব্যয়ের আবশ্যক, অথচ তোর কিছুই নাই, তুই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমুক ঘরে একটী সিন্দুক দেখিতে পাইবি, সেই ঘরে বিস্তর ধন রত্ন আছে, সিন্দুকটি ঐ সকল ধন রত্নে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া আয়। তোর বাটী পঁহুছিবার পূর্ব্বে, সিন্দুকটি তোর বাটীতে পাঠাইয়া দিব। উত্তম ঘরে মেয়ে তিনটি পড়িলে তখন স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া আসিয়া, নির্ভাবনায় অন্ধ হইতে পারবি।" এই কথা বলিয়া রাক্ষস চলিয়া গেল। বণিক অবাক হইল, রাক্ষসের কি অদ্ভুত দয়া! যাহা হউক বণিক রাক্ষসের আজ্ঞা প্রমাণ সিন্দুকটি মহামূল্য রত্ন মাণিক্যে পরিপূর্ণ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

বণিক দুই দিন পরে বাটিতে পঁহুছিল। মেয়ে গুলি আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বড় মেয়ে দুটি বলিতে লাগিল "বাবা,

টাকার সিন্দুক আসিয়া পঁহুছিয়াছে, হাঁ বাবা তিন খানি জাহাজে এত টাকা লাভ হইল। কই আমাদের জন্ত জিনিষ পত্র আননি? আমাদের দাস দাসী কই?, বড় দুটির কথা কতকটা থামিলে দিলচম্প বলিল হ্যা "বাবা, পথে কোন কষ্ট কি অসুখ হয় নি? বাঃ! বেশ গোলাপ চারা বাবা; আমি মনে করেছিলেম তোমার মনে থাকবে না। এস বাবা, আগে খাবে এস তার পর আমাদের কথা বার্ত্তা হবে এখন।"

আহারাদির পর আবার সকলে একত্র হইল। বণিক মেয়েগুলির আনন্দ দেখিয়া কতকটা সুখী হইল। বড় মেয়ে দুটি কেবল টাকারই কথা কহে,। কিন্তু দিলচম্প পিতার মুখে বিষাদচিহ্ন দেখিয়া কেবল তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

বণিক মেয়ে তিনটিকে থামাইয়া বলিল "দেখ, বস্ত্রাগাইবার ফল ঐ সিন্দুকটি, উহা যে কেবল রৌপ্য মুদ্রায় পূর্ণ তাহানহে স্বর্ণ মুদ্রা মণিমাণিক্যাদি বিস্তর আছে সমস্ত গুলি সমান তিন ভাগ করিয়া তোমাদিগকে দিব। শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া তোমাদিগের বিবাহ দিয়া পুনর্ব্বার আমাকে কোন স্থানে যাইতে হইবে। আর বোধহয় তোমাদের সঙ্গে দেখা না হইলেও হইতে পারে, কেননা বৃদ্ধ হইয়াছি, কবে আছি কবে নাই। তবে তোমরা সুখে আছ দেখিয়া যাইতে পারিলে কতকটা সুস্থির থাকিতে পারিব।

দিলচম্পের কথাগুলি বৃদ্ধের কর্ণে অমৃত ময় বোধ হইল "হ্যাবাবা, সমস্তই আমাদের দিলে তোমার সঙ্গে কিছু অর্থ চাই না? আমি কিন্তু বাবা এবার তোমার সঙ্গে যাইব, তুমি যেখানেই যাও"।

বণিক নগরের মধ্যে এক খানি বাটী ভাড়া লইল। বলা বাহুল্য যে বণিকের পূর্ব্বসম্পত্তি প্রাপ্তি বিষয় রাষ্ট্র হইলে, আমীর ওমরাওর পুত্রেরা পুনর্ব্বার আসিয়া বণিক কন্যাত্রয়ের প্রণয়প্রার্থী হইল। বণিক মহাসমারোহের সহিত বড় মেয়ে দুটীর বিবাহ দিল। দিলচম্প কোন মতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। বণিক বিস্তর বুঝাইল, কিছুতেই রাজি হইল না, সে বলিল "বাবা যে কয় দিন তুমি এখানে আছ আমি তোমার সেবা করিব, পরে যা হয় হইবে।

বণিক বড় বিপদে পড়িল, শেষে ভাবিয়া স্থির করিল, রাক্ষসের নিকট যাইবার দিন কতক পূর্ব্বে বড় জামাতার নিকট দিলের বিবাহের ভার দিয়া যাইব।

দিলচম্প দেখিত তাঁহার পিতা একাকী থাকিলেই প্রায়ই নীরবে রোদন করিত, কখনও বা তাহার কুকুরটীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিত "ভুমন, তুমি আর আমি, শেষ পর্য্যন্ত তুমি আর আমি।" বণিক ভাবিয়াছিল কেবল মাত্র কুকুরটি লইয়া রাক্ষসের নিকট যাইবে। এই সকল দেখিয়া দিলচম্প স্থির করিল, বাবা যেখানেই যান না কেন আমি তাঁহার সঙ্গে যাইব, অনুমতি দেন ভাল, নতুবা লুকাইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিব। ভালবাসা এমনিই বটে!

তিনমাস অতীত হইবার আর দুইদিন মাত্র আছে, বণিক তাহার গাধাটি সজ্জিত করিয়া দিলচম্পকে বলিল "এস মা, তোমাকে তোমার বড়ভগ্নির বাটীতে রাখিয়া যাই। দিলচম্প শুনিয়া বলিল "সেকি বাবা, আমি কোথায় থাকিব, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে রাখিয়া গেলে আমি আত্মহত্যা করিব। বাবা, আমাকে বুঝাইও না, আমি

কিছুই শুনিবনা, হয় তুমি থাক, নতুবা আমাকে সঙ্গে নাও।"

বিষম মুস্কিল। কিছুতেই দিলচম্প্ রহিল না। কি করে, বণিক, কন্যাটিকে লইয়া গাধায় চড়িয়া চলিল। ভুস্মন কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে অপর দুইটি মেয়ের নিকট বিদায় লইল। তাহারা দিলচম্প্কে সঙ্গে যাইতে দেখিয়া বলাবলি করিল "দেখেছ, দিদি কেমন সেয়ানা, বাবার সঙ্গে যাচ্ছে কেন না যাতে নিজের বকরাটা বেশী হয়।"

যে যাহাই বলুক, দুইদিনে তাহারা রাক্ষসের বাটির সম্মুখে পৌঁছিল। পূর্ব্বের মতন অট্টালিকার কটক খোলা রহিয়াছে। বণিক গাধাটিকে আস্তাবলে রাখিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। যে ঘরে বণিক বিশ্রাম করিয়াছিল সেই ঘরে যাইয়া দেখিল, আহার সামগ্রী প্রস্তুত। তফাৎ এই, এবার দুইজনের মতন খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে। বণিক দিলচম্প্কে বসিতে বলিয়া আপনিও একখানি চৌকিতে উপবেশন করিল। কুকুরটি মেজের নিচে আপনার স্থান খুঁজিয়া লইল। দিলচম্প্ জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এ বাটী কার?" বণিক বলিল "রাক্ষসের।" দিলচম্প্ বসিয়াছিল উঠিয়া বলিল "রাক্ষসের! সেকি বাবা, তবে তুমি এখানে এলে কেন? রাক্ষসে যে আস্ত মানুষ খায়"। বণিক বলিল "অন্যকথা বলিব, এখন বড়ক্ষুধা হইয়াছে এস আহার করি। দুইজনে আহার করিতে বসিল বটে কিন্তু কেহই কিছু খাইতে পারিল না। সবে মাত্র আহার সমাপ্ত হইয়াছে অমনি সমস্ত বাড়ীটি কাঁপিয়া উঠিল, মেঘ গর্জ্জনের স্থায় একটি শব্দ হইল, রাক্ষস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দিলচম্প্ ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাক্ষস বণিকের দিকে চাহিয়া বলিল "ইহারই জন্য গোলাপ চারা লইয়াছিলে তাই তোমার বদলে কি এ—সাজা লইতে আসিয়াছে?"

বণিক শশব্যস্তে বলিল" সেকি, রাক্ষস এমন কাজ করিও না, এস শীঘ্র, এস, আমার চক্ষু দুটি উপাড়িয়া লও, আমার প্রাণের দিল্‌কে কিছু বলিও না। দেরি করিতেছ কেন?" দিলচম্প্ এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, এখন রাক্ষস পিতার চক্ষু নষ্ট করিবে শুনিয়াই রাক্ষসের দিকে চাহিয়া করপুটে বলিতে লাগিল "আপনি যিনিই হউন, আমাকে বলুন আমার পিতা কি আপনার নিকট অপরাধী? যদিতাই হন্, দয়া করিয়া আমার বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া দিন, আমার পিতাকে যা কিছু শাস্তি দিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিগুণ শাস্তি আমাকে দিন।"

রাক্ষস সমস্ত ঘটনা দিলচম্প্কে বলিল। রাক্ষসের সেরূপ কর্কশ স্বর নাই। স্বর যথাসাধ্য মধুর হইয়াছে। দিলচম্প সমস্ত শুনিয়া বলিল "তবেত আমাকেই শাস্তি দেওয়া আপনার উচিত, কেন না আমি গোলাপচারা না চাহিলে, পিতা কখনই আপনার অবমাননা করিতেন না পিতার কোন দোষ নাই, আমার চক্ষু উৎপাটন করুন আমাকে বধকরুন আমি প্রাণপর্য্যন্ত দান করিতে পারি।

রাক্ষস কহিল "বাস্তবিক তোমার অমন সুন্দর আকর্ণ নয়নযুগল নষ্ট করা অপেক্ষা তোমার প্রাণ লওয়াই উচিত। তাহাই স্থির হইল। বণিক্! যাও তোমাকে নিস্কৃতি দিলাম। কাল প্রাতঃকালে উঠিয়া চলিয়া যাইও, এখানে থাকিলে কোন ফল দর্শিবে না। রাক্ষস চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

মধুযামিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন যাইতে না যাইতে "হিঙ্গনা ডাইন হইয়াছে" এই সংবাদ গ্রামের সমস্ত ভাগে প্রচার হইয়া পড়িল। গ্রামের লোকেরা হিঙ্গনাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীর চতুঃপার্শ্বে দলে দলে আসিয়া নানা রূপ কটু, ব্যঙ্গ ও অশ্লীল বাক্য সকল বলিতে লাগিল। হিঙ্গনার আর বাটীর বাহির হইবার উপায় রহিল না। উদয়গিরির বিবাহের আশা প্রায় এক কালে উচ্ছেদ হইল। হিঙ্গনার স্বজন সকল ক্রমশঃ অধিকতর ভীত হইতে লাগিলেন। হিঙ্গনাও ভীত ও কাতর হইয়া আপন গৃহে লুক্কায়িত রহিলেন। কুমারের সহিত তাঁহার দর্শন আশাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল।

এ দিকে অরুণা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আচার্য্যের নিকট যাইয়া হিঙ্গনা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শাস্তি পায়েন, এ রূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অরুণা নবীন যৌবনদানে আচার্য্যকে এক কালে আপন বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

অরুণা হিঙ্গনাকে দেখিবার উদ্দেশ্য করিয়া দুই প্রহরের সময় তাঁহার বাটী যাইয়া উদয়গিরির সহিত কথা বার্ত্তা কহেন ও সুযোগ পাইলে স্বীয় যৌবনকান্তি ক্ষণে ক্ষণে বিকাশ করিতে ক্রটী করেন না। কিন্তু উদয়গিরি এক্ষণে আপন দুঃখে অভিভূত।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন কালে আচার্য্য অরুণা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া গ্রামের প্রধান প্রধান লোক সকলকে ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে আহ্বান করিয়া হিঙ্গনার দোষ সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিলেন ও প্রথমে তাঁহাকে কি রূপ শাস্তি দেওয়া আবশ্যক সে বিষয়ের পরামর্শ ও বিচার জন্য পর দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগকে আসিতে আদেশ করিলেন। এ সংবাদ অরুণা হিঙ্গনার বাটীতে লইয়া আসিলেন। হিঙ্গনা হতবুদ্ধি হইয়া শুনিলেন ও নতবদনে কাঁদিতে লাগিলেন। হিঙ্গনার পিতা মাতাও কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রেম, সত্য ও ধর্ম্মের জন্য অনেক স্থলে উপস্থিত বিপদে অবসন্ন হয়েন না। হিঙ্গনার অবস্থাও সেই রূপ। তিনি যে কুমারকে আর দেখিতে পাইবেন না, এই চিন্তাতেই কাতর হইয়াছেন; তবে লোকে যখন তাঁহাকে ডাইন বলিয়া ডাকিতেছে, তখনই তিনি নতবদনে ক্রন্দন করিতেছেন। এ রূপ ক্রন্দন সময়ে, তিনি ভাবিতেছেন যে যদি এ সময়ে কুমার একবার দেখা দেন তাহা

হইলে তাহার সমস্ত দুঃখ ও দুর্ভাবনা দূর হয়; বলিতে কি, তাঁহার মনে এ রূপ বিশ্বাস আছে যে কুমার উপস্থিত হইলেই তাহার উদ্ধারের উপায় হইবে।

এ দিকে কুমার ভগিনীর পীড়ার উপশম হওয়াতে তিনি অদ্য সায়ংকালে হিঙ্গনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে পর্ব্বতদেশে আসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন হিঙ্গনা আসিলেন না; তখন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে পর্ব্বতদেশ হইতে নামিয়া তাঁহার বাটীর অভিমুখে চলিলেন। অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতে কতকগুলি ব্যক্তি একত্র হইয়া হিঙ্গনার নাম করিতেছে। তিনি হিঙ্গনার নাম শুনিবামাত্র সেই স্থানে যেন ক্ষণকালের জন্য বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগের কথা শুনিতে লাগিলেন।

প্রথম ব্যক্তি। চলনা যাই শুনা যাক্ কি হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কোথায়?

প্রথম ব্যক্তি। কেন, তুমি কি শুননি আজ রাত্তিরে ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে গ্রামের সব লোকেরা একত্র হয়ে পরামর্শ কর্‌বে কেমন করে হিঙ্গনাকে শাস্তি দিতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তা জানি।

তৃতীয় ব্যক্তি। তুমি কি মনে কর হিঙ্গনা সত্যিই ডাইন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হতেও পারে, না হতেও পারে;—আহা! হিঙ্গনা কি সুশ্রী মেয়ে ওর মুখ দেখ্‌লে ত বোধ হয় না যে ডাইন; ওকে কুমার বলে যে এক জন লোক ওর বাটীতে ছিল শুন্‌ছি সেই নাকি ওকে এই মন্ত্র শিখিয়েছে।

চতুর্থ ব্যক্তি। তা যেন হলো, হিঙ্গনা ডাইন হয়েছে এ কথা তুল্‌লে কে?

প্রথম ব্যক্তি। ঐ আচার্য্য।

তৃতীয় ব্যক্তি। আচার্য্য দেব সেবা করে, সে এ খবর পাবে কোথায়? বঞ্চ কেউ না কেউ তাকে বলেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমি কিন্তু এক জনাকে দেখেছি তা সে হউক আর না হউক—

সকলে। কে বলনা, বলনা—

দ্বিতীয় ব্যক্তি। না—না আমি কারো নাম কর্‌তে চাইনা—

সকলে। বল্‌না আমরা আর কাকে বল্‌তে যাচ্চি, আমরা আর পাঁচ জনকে বল্‌চি কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তা জেনে কি হবে বল?

সকলে। বলনা—

দ্বিতীয় ব্যাক্তি। তার নাম আমি কর্‌বো না, তবে এই মাত্র বল্‌চি সে একটা স্ত্রীলোক।

প্রথম ব্যাক্তি। তার বয়স কত?

দ্বিতীয় ব্যাক্তি। অল্প, সে যাহোক—

তৃতীয় ব্যক্তি। তুমি কেমন করে দেখ্‌লে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেমন করে? হঠাৎ সন্ধ্যার পর আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম সে ওড়ানা খানা মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল,

তার দুই দিন পরে শুন্‌লুম আচার্য্য হিঙ্গনাকে ডাইন বলে রটিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় ব্যক্তি। তবে চল মন্দিরে যাওয়া যাক্।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। না আমি ওমন নিষ্ঠুর কাজের সম্পর্কে থাক্‌তে চাইনি, তোমরা যাও।

প্রথম ব্যক্তি। চলনা কি হয় শুনা যাক্ না, তুমি ত হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পার্‌বে না, আর আমিও ত পার্‌বো না; অদৃষ্টে যার যা আছে তাই হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ভালই হবে; কিন্তু এমন লক্ষ্মীকে যারা শাস্তি দেবে ঘনশ্যাম দেব তাদের শাস্তি দেবেন।

প্রথম ব্যক্তি। আচার্য্যত এই কাজ করেচেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আচার্য্য হউন আর যিনিই হউন।

প্রথম ও তৃতীয় ব্যক্তি। তবে আমরা চল যাই। উনি বাড়ী যান। শাস্তির দিন দেখ ভাই যেন হিঙ্গনাকে বাঁচাতে পারো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমি কি আর বাঁচাব? ঘনশ্যাম দেব আছেন—

চতুর্থ ব্যক্তি। কবে হবে?

প্রথম ব্যক্তি। কাল থেকে আরম্ভ হবে—

তৃতীয় ব্যক্তি। কদিন পর্য্যন্ত হবে?

প্রথম ব্যক্তি। দু-তিন দিন হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। যদি দোষী হয় তা হলে কি হবে?

প্রথম ব্যক্তি। চুণ মুড়িয়ে, সমুখের দাঁত ভেঙ্গে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। উঃ।

প্রথম ব্যক্তি। (ব্যঙ্গচ্ছলে) দেখুন উনি যদি বাঁচাতে পারেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠাট্টা কর কেন ভাই?

প্রথম ব্যক্তি। ঠাট্টা আর কি করলুম। ভালই বল্‌চি তোমার বল আছে, যদি সুন্দরীকে বাঁচাতে পার তা হলে তাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাই ত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এই কথা বলে বাটী চলিয়া গেল। অপর লোকেরা ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরের দিকে চলিল। কুমার যিনি ইতিপূর্ব্বে হিঙ্গনার নাম শুনিয়া সেই স্থানে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, ক্রমশঃ হিঙ্গনার অপবাদ ও শাস্তির বিষয় শুনিতে শুনিতে তিনি সেই স্থানে একটী তরুমূলে বসিয়া পড়িলেন। কুমার বীর পুরুষ হইয়াও সহসা এই নিদারুণ সংবাদে প্রতিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের শোণিত যেন এক কালে শুষ্ক হইয়া মস্তিষ্ক ঘুরিয়া আসিল, তিনি সেই স্থানে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সায়ংকাল বলিয়া কেহ তাঁহাকে দেখিল না। প্রথম বিস্ময়ের অপগমে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন আজই কি তিনি হিঙ্গনাকে গুপ্তভাবে আপন বাটীতে লইয়া যাইবেন? তিনি একাকী তাঁহাকে লইয়া পালাইলে তাঁহার উদ্‌যোগ হত হইতে পারে এবং তিনিও প্রাণে মারা যাইতে পারেন। তিনি আপন প্রাণ দিয়া হিঙ্গ-

জাতক অন্ত্যের মাত্র যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে অণুমাত্র পরাঙ্মুখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বদা প্রস্তুত বিশেষ এই বিপদ সময়ে, তবে তিনি নিজে হত হইলে হিঙ্গনাকে কে রক্ষা করিবে? তিনি এইরূপে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন অদ্য তাঁহাকে গুপ্তভাবে লইয়া যাইবার কোন চেষ্টা না করিয়া, আপাততঃ বাটী ফিরিয়া যাইবেন। তথা হইতে দুই একটী সাহসী অনুচর সমভিব্যাহারে ছদ্ম-বেশে পুনরায় গ্রামের মধ্যে আসিয়া শান্তি বিষয়ে কি পরামর্শ হয় গোপনে শুনিবেন, পরে কল্য যেরূপ সদুপায় স্থির হয় করিবেন। এই চিন্তার পর তিনি দ্রুতপদে বাটী যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে হৃদয়বান্ দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না কেনই বা হিঙ্গনার অপবাদ হইল? কোন অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া আচার্য্য এ প্রকার অপবাদ ঘোষণা করিল? ইহাতে কি অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল?—হিঙ্গনা এই অপবাদে না জানি কতই ভীত হইয়াছেন, কতই মনস্তাপ, কতই ক্লেশ পাইতেছেন?—তাঁহার সহিত অদ্য রাত্রে সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না মনোদুঃখে পাছে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি মনে মনে এই আন্দোলন করিতে করিতে অতি দ্রুতপদে বাটী ফিরিয়া আসিয়া শিকারীর বেশ পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসী সাজিলেন ও তাঁহার সঙ্গ সাহসী দুইজন অনুচরকে চেলা সাজাইয়া দ্রুতপদে ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন অনেকগুলি ব্যক্তি সমবেত হইয়া হিঙ্গনার দোষের বিষয় তর্ক বিতর্ক করিতেছে। তিনি সেই স্থানে উপবেশন না করিয়া সাষ্টাঙ্গে ঘনশ্যাম্ দেবকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া যোড়করে মুদ্রিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ সেই অবস্থায় রহিলেন। তত্রস্থ লোক সকল তাঁহাকে জনৈক সন্ন্যাসী বিবেচনা করিল। তিনি এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া শুনিলেন যে কুমার নামে একজন যুবা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে হিঙ্গনাকে একান্ত বশবর্ত্তী করিয়া পশ্চাতে তাঁহাকে আপন বিদ্যা শিক্ষা দেয়। হিঙ্গনা তৎ কর্ত্তৃক ডাইন হইয়াছে। তিনি ঐ বিদ্যা সাধনের জন্য প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে পর্ব্বত-দেশে যাইয়া মন্ত্রপাঠ করেন। সে মন্ত্র এরূপ অনিষ্ট কর যে উহার উচ্চারণ মাত্রে দেশের অমঙ্গল হয়, সুতরাং যখন প্রতি দিন দুইবার ঐ মন্ত্র পাঠ হয়, তখন যে শস্যের বিশেষ হানি হইবে তাহার আর সংশয় কি?

কুমার এই পর্য্যন্ত শুনিয়া জপ করিবার ছলে সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি স্থির কর্ণে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচর দ্বয়ও তাঁহার ন্যায় বসিয়া জপ আরম্ভ করিল। আচার্য্য আহূত লোক-দিগকে কহিলেন "তবে আগামী প্রভাতে হিঙ্গনার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, কিন্তু তাহার পরিক্ষা অন্যান্য লোকের মত হইবে কি না তিনি ইহাই এইক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করেন।" তাহারা সকলেই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একস্বরে কহিল "পরীক্ষা যে রূপ হইয়া থাকে সেই মতই হইবে, নচেৎ দোষের পরিচয় কিরূপে পাওয়া যাইবে?" আচার্য্য সাধারণ মতের বিপক্ষে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এইরূপ সিদ্ধান্তের পর লোক সকল

চলিয়া গেলে আচার্য্য সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী তান্ত্রিক উপাসনায় মগ্ন আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী। ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এটী দেবস্থান, অতএব এ স্থলে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলাম।

আচার্য্য। আপনার সন্ধ্যাদি কি সমাপন হইয়াছে?

সন্ন্যাসী। হাঁ।

আচার্য্য। আপনি অদ্য রাত্রে কোথায় অবস্থিতি করিবেন?

সন্ন্যাসী। অরণ্যে।

আচার্য্য। অরণ্যে হিংস্র জন্তু সকল আছে।

সন্ন্যাসী। তাহারা আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিবে না।

আচার্য্য। (বিস্মিত ভাবে) আপনি কি মন্ত্র বা যোগ বলে উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। সে বিষয় আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার দেহ নিতান্ত অপবিত্র।

আচার্য্য এক কালে প্রতিহত ও ভীত হইয়া করযোড়ে কহিলেন "আর্য্য আ— আমি নিজে দোষী নহি"—

সন্ন্যাসী। (গম্ভীর স্বরে) স্ত্রীলোক কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছ।

আচার্য্য অধিকতর ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত হয়েন এমন সময়ে তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন "তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না।" আচার্য্য তখন অতি কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য! উপায় কি?"

সন্ন্যাসী। নির্দ্দোষ জনের উপায় ঈশ্বর স্থির করিবেন, তোমার উপায় ইহলোকে শাস্তি, পরকালে নরক।

সন্ন্যাসী এই বলিয়া তথা হইতে উঠিলেন। আচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি আচার্য্যকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া কুপিত ভাবে কহিলেন "তুমি আমার সহিত থাকিলে প্রাণে নিহত হইবে।" আচার্য্য তখন ভগ্নাশ হইয়া পুনরায় মন্দিরে আসিয়া বসিলেন। সেই রাত্রে অরুণা আসিলেন না। তিনি একাকী বসিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

কুমার আচার্য্যকে বিদায় করিয়া হিরন্নাকে শান্ত্বনা করা শীঘ্র কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার বাটীর দিকে চলিলেন। রাত্রি ছয় সাত দণ্ড অতীত। হিরন্নার পিতা মাতা ও উদয়গিরি বাহির বাটীতে বিষণ্ণভাবে বসিয়া হিরন্নাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসীবেশে কুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর কান্তি ভস্মাচ্ছাদিত, নবীন মুখছবি যম-শ্মশ্রু রাশিতে আবৃত, মস্তকে জটাভার, হস্তে ত্রিশূল, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে বনশ্যামদেবের মন্দিরে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ছিলাম, তথায় বহু লোকের সমাবেত হইয়াছিল; শুনিলাম, হিরন্না নাম্নী একটী কুমারী পৈশাচিক মন্ত্রে

দীক্ষিত হইয়া দেশের মহা অমঙ্গল করিতেছেন, এক্ষণে আমি দেখিতে আসিয়াছি তিনি প্রকৃত দোষী কি না, যদি প্রকৃত নির্দ্দোষী হয়েন, তাহা হইলে তিনি যাহাতে রক্ষা পায়েন এরূপ উপায় স্থির করিয়া যাইব।" সন্ন্যাসীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে সসম্ভ্রমে সকাতরে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। হিঙ্গনার মাতা হিঙ্গনাকে তথায় আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে তাঁহার পিতা ও উদয়গিরি সন্ন্যাসীকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু-আমার কন্যা নির্দ্দোষী হইলে আপনি কিরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন?" সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন "সে কথা আমি আপাততঃ বলিতে ইচ্ছা করি না, আমি অদ্য রাত্রি চলিয়া যাইতেছি কল্য সকালে শাস্তির সময় দেখিবে তিনি রক্ষা পাবেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া উভয়ে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হিঙ্গনা অতি দীনবেশে তাঁহার সমীপে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক যোড় করে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। হিঙ্গনা তাঁহার ইঙ্গিত মত নিকটে উপবেশন করিলেন, তিনি তাঁহার পিতা মাতা ও উদয় গিরিকে দূরে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন, তাঁহারা সেইমত করিলেন। তিনি তখন হিঙ্গনার প্রতি চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এরূপ অপবাদ কে দিল?" সন্ন্যাসীর স্বর সংযোগে হিঙ্গনা কিয়ৎক্ষণ ছল ছল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কুমার দেখিলেন প্রিয়জনের নিকট কপটতা রক্ষা করা অতি দুরূহ, অথচ এ স্থলে না করিলে সর্ব্বদিক্ রক্ষা হয় না, তিনি এই ভাবিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কৈ আমার কথায় উত্তর দিলে না।"

হিঙ্গনা। (অতি মৃদু বচনে) প্রভু! জানি না।

সন্ন্যাসী। তুমি কি বিবেচনা কর তোমার সমবয়স্কা কোন সঙ্গিনী তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে?

হিঙ্গনা। প্রভু! জানি না।

সন্ন্যাসী। কুমার নামে কোন যুবা কি তোমাকে কোন পৈশাচিক মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছে?

হিঙ্গনা। (রোদনোন্মুখে) প্রভু! তিনি আমার ন্যায় নির্দ্দোষ—

সন্ন্যাসী। তুমি কি কুমারকে স্নেহ কর।

হিঙ্গনা। (নতবদনে কাঁদিতে লাগিলেন)

সন্ন্যাসী। (গম্ভীর স্বরে) তোমার বাম হস্ত দেখি।

হিঙ্গনা বামহস্ত প্রসারিত করিলেন।

সন্ন্যাসী হস্ত সযত্নে আপন করে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "কৈ আমিত তোমাকে দোষী দেখিতেছি না"

তিনি তৎপরে হিঙ্গনাকে কিঞ্চিৎ কর্পূর আনিতে বলিলেন। হিঙ্গনা কর্পূর আনিল।

হিঙ্গনা কর্পূর আনিলে সন্ন্যাসী উহা একটী মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া দীপ সংস্পর্শে জ্বালাইয়া হিঙ্গনাকে হস্তদ্বারা উহার তাপ গ্রহণ করিতে বলিলেন। হিঙ্গনা তাহাই করিলেন, সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ মাত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে, তিনি হিঙ্গনার করপল্লব দুটী আপন হস্তে

রাখিয়া দীপালোকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "হিঙ্গনে! নির্দ্দোষি, কল্য প্রভাতে যখন তোমাকে পরীক্ষা করিতে লইয়া যাইবে, তখন তুমি কোনমতে ভীত হইও না।"

সন্ন্যাসী হিঙ্গনাকে নির্দ্দোষী বলিলে হিঙ্গনা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু কাতর স্বরে কহিলেন, "প্রভু! আমি যে নির্দ্দোষী তাহা আমি জানি, কিন্তু আপনি যে আমাকে নির্দ্দোষী বলিলেন, লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? এবং আপনার কথা মত কি আমার পরীক্ষা রহিত হইবে?"

সন্ন্যাসী। আচার্য্য বিশ্বাস করিবে—

হিঙ্গনা। আচার্য্যইত আমাকে অপবাদ দিয়াছে।

সন্ন্যাসী। আমি তা জানি—

হিঙ্গনা। আপনি কিরূপে জানিলেন?

সন্ন্যাসী। অদ্য আমি বলিতে ইচ্ছা করি না।

হিঙ্গনা। কল্য বলিলে কি ফল হইবে? আমি মার নিকট শুনিলাম আপনি যোগ বলেসমস্তই বলিতে পারেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন কুমারের ভগিনী সুস্থ হইয়াছে কি না?

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে রহিয়া) তিনি সংপ্রতি সুস্থ হইয়াছেন।

হিঙ্গনা। কুমার কবে আসিবেন?

সন্ন্যাসী। কেন?

হিঙ্গনা। আমিত মরিতে প্রস্তুত, যদি এমন সময়ে, (বিগলিত নয়নে) তাঁরে দেখিয়া মরিতে পারি—

সন্ন্যাসী। (অবনত বদনে) আমি অদ্য রাত্রে স্বপ্নে তাঁহাকে তোমার কথা বলিব—তুমি ভীত হইও না—আমি কল্য তোমার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইব।—

সন্ন্যাসী এই বলিয়া শীঘ্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেই স্থলে থাকিতে তাঁহার আর ক্ষমতা বা সাহস হইল না, পাছে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সহসা প্রকাশ পায়। তিনি চলিয়া গেলে হিঙ্গনার পিতা মাতা ও উদয়গিরি সন্ন্যাসী কি বলিলেন আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হিঙ্গনা যতদূর পারেন বলিলেন। সন্ন্যাসী কল্য প্রভাতে যে পরীক্ষাকালীন উপস্থিত থাকিবেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

খিয়ংথা জাতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

খিয়ংথাদের বিবাহ প্রণালী চমৎকার। পুরুষেরা ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, যদি স্বয়ং সম্বন্ধ না ঘটায় তবে, তাহাদের পিতা মাতারা তাহার নিমিত্ত সম্বন্ধ করে।

কোন সম্বন্ধ মনোমত হইলে, বর পক্ষের একজন পুরুষ কন্যাপক্ষের কর্ত্তার সহিত ঐ সম্বন্ধ স্থির করিবার নিমিত্ত কন্যাপক্ষের গৃহে প্রেরিত হয়। ঐ ব্যক্তি বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ বা গৃহের সরণিতে অধিরোহণ করিবার পূর্ব্বে করপুটে প্রণাম পূর্ব্বক কহে "অগৎস" তোমাদের ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিল, তুমি ইহাকে বাঁধিয়া রাখিবে না ছেড়ে দিবে? যদি অনুকূল উত্তর পান তবে সে সরণিতে অধিরোহণ করিয়া, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পরে উপবেসনান্তর জিজ্ঞাসা করে "কেমন, ঘরের দেওয়াল খুঁটি প্রভৃতি দৃঢ়তর নড়িবে চড়িবে না?" তাহাতে যদি এরূপ উত্তর হয় যে হাঁ, ও সকল দৃঢ় বটে তবে তাহা অনুকূল হইল। এবং তদনুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিষয়ের পরিষ্কার বন্দোবস্ত হয়। বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেলে উহা বরের পক্ষে নিয়োজিত হয় ও তদনুসারে বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির হয়। বিবাহের দিন বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা একত্র হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করে। বালকেরা এসকল বিষয়ের কিছুই জানেনা বা তাহাদের এসকল বিষয় জানা উচিত নয় এরূপ মনে করা যায়। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার সাক্ষাৎ হইলে পর বরকর্ত্তা একটী কুক্কুট বধ করিয়া তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া উহার লক্ষণালক্ষণ দেখে। জিহ্বাস্থিত বিবাহ লক্ষণ ভাল বা মন্দ বলিয়া নির্ণীত হইলে বরকর্ত্তা স্বপ্ন প্রত্যাদেশের নিমিত্ত ঐ রাত্রি কন্যার শয়নাগারে শয়ন করে ও সকলে সোৎকণ্ঠ চিত্তে স্বপ্নাদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বরকর্ত্তার বহির্গমনের সময়ে যদি চতুর্দ্দিকে মঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ভাবী বধূ তাহার চরণানত হইয়া প্রণাম করে ও সে তাহাকে একটি নূতন অঙ্গবস্ত্র ও একটি রৌপ্য অঙ্গুরীয় প্রদান করে। অনন্তর বিচক্ষণ জ্যোতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহের দিন নির্ণয়ার্থ আহূত হয়। তাহারা বর কন্যার জন্ম নক্ষত্রাদি পরিদর্শন পূর্ব্বক বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া দেয়। নির্ণীত বিবাহ দিনের পূর্ব্বে বর ও কন্যাপক্ষের কর্ত্তারা বিবাহ ভোজের নিমিত্ত রাশি রাশি মদ্য, বরাহ মাংস, তণ্ডুল ও নানাবিধ মশলা প্রস্তুত করিতে থাকে এবং আত্মীয় বন্ধু বর্গকে এক একটি কুক্কুট ও এক এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়া বিবাহের সমাচার দেয়। কোন কোন স্থলে কুক্কুটের পরিবর্ত্তে তাম্রখণ্ড বা তাম্রমুদ্রা প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনন্তর শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে বর, বরযাত্র ও বরযাত্রীরা উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া কন্যার বাটীতে গমন করে ও তাহাদের অগ্রে অগ্রে ঢাকীরা ঢাক বাজাইতে বাজাইতে যায়। গ্রামের প্রবেশ পথে উপনীত হইলে কন্যা পক্ষীয় কামিনীরা একটী দীর্ঘবংশখণ্ড আড় করিয়া উহাদের প্রবেশ স্থগিত করে। এই বংশ খণ্ডের ওপারে থাকিয়া বরকে প্রণয়দত্ত এক চষক সুরা পান করিতে হয়। যদি কন্যা পক্ষীয় কামিনীরা সংখ্যায় অধিক হয় তবে ৫।৬ বার ঐরূপে প্রবেশ রোধ ও সুরা প্রদান হয়। কিন্তু যত বার সুরা প্রদত্ত হইবে তত বারই যে তাহা পান করিতে হইবে এমত নয়। মুখে করিয়া লইয়া শেষে তাহা প্রক্ষেপ করা যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্যারিমোহন সেন।

দেওয়ান গোবিন্দরাম

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাঘব সেনের বাটী।

পাঠক পাখীর বাগানে রাঘব সেনকে দেখিয়াছেন। তিনি একজন অতি বড় সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। তাঁহার অগাধ বিষয়, বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অসীম ক্ষমতা। হুগলি জেলায় তত বড় লোক তৎকালে আর ছিল না। রাঘব সেন দাতা, ভোক্তা, ক্রিয়াবান। সকল তীর্থ স্থানেই তাঁহার দেবালয়, সকল প্রসিদ্ধ সহরেই তাঁহার কুঠি ও কারখানা ছিল। তিনি বল্লভপুর গ্রামে বাস করিতেন। তিনি যাহার সহিত একবার আলাপ করিতেন, সে ইহ জীবনে তাঁহাকে আর ভুলিতে পারিত না। তাঁহার সহাস্ত বাক্য-প্রণালীর এমনি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি ছিল যে, সে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হয় নাই, তৎকালে এমন সাহেব সুবা ও সম্ভ্রান্ত লোক অল্পই দেখা যাইত। তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেন এবং প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক বাটীর কুশল সম্বাদ লইয়া নিরন্নের অন্ন, পীড়িতের চিকিৎসা ও বিপন্নের উদ্ধার উপায় করিয়া দিতেন। তাঁহার বদান্যতা ও অমায়িকতায় বল্লভপুরের সমস্ত লোকই তাঁহার অনুগত ও বশীভূত হইয়াছিল। তাঁহার অনুমতি না লইয়া গ্রামে কোন কার্য্যই হইত না এবং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে কেহ সাহস করিত না।

রাঘব সেনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সেরূপ বৃহৎ অট্টালিকা তৎকালে প্রায় দেখা যাইত না, অট্টালিকার সম্মুখে ফুল বাগান, ফটক ও নহবৎ খানা। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে, পঞ্চমীর চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, নহবৎ খানায় হলামুচি রৌসন চৌকিতে কেদারা আলাপ করিতেছে। বাগানের দিকে পুরীর দ্বিতীয় তলে সুপ্রশস্ত নাচ ঘর উজ্জ্বলতর আলোক মালায় প্রভাসিত ও মনোহর পুষ্পহারে সুশোভিত হইয়াছে। তথায় দুগ্ধ-ফেননিভ সুকোমল ধবলাসনে মহামূল্য কাটা পোষাক পরিধৃত শত শত সম্ভ্রান্তলোক সুকোমল মখ্‌মল তাকিয়ায় নির্ভর করিয়া সুখে সমাসীন হইয়াছেন। রজত ও সুবর্ণ নির্ম্মিত আল্‌বোলায় সুগন্ধী খাম্বিরা ধূমিত ও গোলাবপাশ মুহর্মুহু ছিটিত হইতেছে। ঘন ঘন তাম্বুল ও আতর দান হস্ত হইতে হস্তান্তরে ফিরিতেছে। এবং পরমা রূপবতী প্রখ্যাত নামা জুলিয়া বাই কোকিল বিনিন্দিত স্বরলহরীতে শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিতেছে। এই সভায়। জনাই নিবাসী দেওয়ান জগমোহন মুখো-

পাধ্যায় ও কুমারটুলী নিবাসী নিধুবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এই দুইজন মাননীয় ব্যক্তি বড়ই মজলিসী ও তুর্য্য সমজদার লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁরা যে মজ্‌লিসে উপস্থিত না থাকিতেন, সে মজ্‌লিস্ মজ্‌লিস্ বলিয়া গণ্য হইত না। রাঘব সেন কখন হাসিতেছেন, কখন করজোড় করিতেছেন, কাহার হাত ধরিয়া বসাইতেছেন, কাহাকেও বা সহস্তে ব্যজন করিতেছেন, কাহাকেও তাম্বূল ও তোড়া দিতেছেন, কাহারও গাত্রে গোলাব ছিটাইতেছেন, সংক্ষেপতঃ তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান করিয়া, সকলের সহিত সমান সাদর সম্ভাষণ করিয়া চর্‌কির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গান শুনিবার অবসর তাঁহার নাই, গানও তাঁহার ভাল লাগিতে ছিল না। তাঁহার মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল। তাঁহার হৃদয়ে ঘোর উৎকণ্ঠা ও বিষম অসুখ কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল সহাস্য ও সুপ্রসন্ন। তাঁহার কার্য্য ও বচন প্রণালীতে কাহার সাধ্য তাঁহার হৃদয়ের বিপরীত ভাব অনুভব করে? পাঠক বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিবেন এ সময় রাঘব সেনের বাটীতে এ উৎসব কিসের? পূজার এখনও দুই দিন বিলম্ব আছে তবে এ মহা সমারোহের কারণ কি?

রাঘব সেনের বাটীতে পূজোপলক্ষে অতিশয় জাঁক জমক হইত। পূজার একপক্ষ পূর্ব্বে বোধন বসিত এবং সেই দিন হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ ও নাচ তামাসা হইত। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর এই পঞ্চমীর দিনে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইত। আজি সেই জন্মতিথি উপলক্ষে সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। সকলই প্রফুল্ল, কিন্তু রাঘব সেনের এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ কি? সকলেই দেখিতেছে তিনি হাসিতেছেন আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন কিন্তু সেই সকল আমোদ আহ্লাদ রাঘবহৃদয়ে কিছুমাত্র স্থান পাইতেছিল না। রত্নার কি হইল? সমস্ত দিন গেল, এত রাত্রি হইল এখনও রত্না আসিল না কেন? রত্না মারা পড়ে তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, পাছে সে ধরা পড়ে ইহাই তাঁহার ভয়। রত্না সম্বন্ধে সে ভয়, এতদিন তাঁহার ছিল না কিন্তু রত্না এক্ষণে গোবিন্দরামের সহিত একাসরে নামিয়াছে বলিয়াই তাঁহার এত উৎকণ্ঠা ও এত ভয়।

জুলিয়া দেওয়ান জগমোহনের অনুরোধে একটি বাঙ্গালা টপ্পা ধরিল। টপ্পাটি সেই মজ্‌লিসে উপস্থিত নিধুবাবু বাঁধিয়াছিলেন। একে সুপ্রসিদ্ধ নিধুবাবুর টপ্পা তাহে তৎকালের অদ্বিতীয়া গায়িকা জুলিয়া সেই টপ্পা গান করিতে লাগিল, আসর আগুণ হইয়া উঠিল। কবি হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। নিধুবাবু সে সময়ে যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা সাধারণের উপভোগ্য নহে।

গায়িকা গাহিল—

দুঃখ দিলে বলে কি প্রেম ত্যজিব
দুঃখ সুখ জ্ঞান করি যতনে আর তুষিব
না থাকে তাহার মন,
করিবে না আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূরে থেকে দেখিব।

যদিও বাইজী চৌকি ছাড়িয়া গাইয়াছিল, যদিও সে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, বেহাগের

সময়ে ভৈরবী গাহিয়াছিল, তথাপি সেই গীতের হৃদয়গ্রাহী কবিতে এবং গায়িকার অপরূপ রূপলাবণ্য, মনোহর ভাবভঙ্গি ও চমৎকার স্বরহিল্লোলে শ্রোতৃবর্গ এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সে সময়ে কেহই সে দোষ অনুভব করিতে পারেন নাই।
সকলেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্রিত পুত্তলীর ন্যায় বসিয়াছিল। জুলিয়া এইরূপ যাদুগিরী করিতেছে, সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে এমন সময় একজন দ্বারবান নৃত্যশালার দ্বারান্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রতি রাঘব-সেনের দৃষ্টি পড়িলে, সে প্রণাম করিয়া বলিল "হুজুর ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীচে দাঁড়ায়ে আছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র রাঘবসেন, জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্রের উপর অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যার ভারার্পণ করিয়া দ্বারবানের সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি নিম্নতলে আসিয়া দেখিলেন রত্না দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারবানকে যথা স্থানে যাইতে বলিয়া তিনি রত্নার হাত ধরিয়া ঠাকুর দালানে উঠিলেন, দালানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। এবং সম্মুখে দশভুজা মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল। তাঁহারা দালানের পার্শ্ববর্ত্তী একটি গৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন এবং কটিদেশ হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া সেই দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। গৃহ মধ্যে প্রগাঢ় অন্ধকার, আলোকের লেশমাত্র নাই, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দুইজনে আরএকটি দ্বারের নিকট পৌছিলেন। রাঘব সেন সেই দ্বারের চাবি খুলিলেন এবং এক অতি সংকীর্ণ সোপান দ্বারা অবতরণ করত এক প্রশস্ত গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ

আজো সে সুখের দিন হয়রে স্মরণ।

আজো সে সুখের দিন হয়রে স্মরণ
যে দিন প্রিয়ার সনে
মেশামিশি মনে মনে
যে দিন প্রিয়ার সনে প্রথম মিলন।
মিশিয়া বসন সনে
চাহিয়া মাটীর পানে
যে দিন আইলা বালা সঙ্কুচিত মন—
হেরিয়া সে অনুমানি
সরম প্রতিমা খানি
স্বর্গ হ'তে হ'লো যেন ভূতলে পতন—
থেকে থেকে সেই দিন হয়রে স্মরণ!।

ধীরে ধীরে পাশে আসি বসিলা যখন
লাজে শির অবনত;
সাধিতে পাড়িতে কত
লাজে সরম-মাখা তুলিলা নয়ন।
শুভ বিবাহের কালে
শুভদৃষ্টি হয়ে গেলে
সেই একদিন পুনঃ শুভ দরশন।
সেই দিন অহরহ
সে সুখ-স্মৃতির সহ
থেকে থেকে মনে পড়ে মেতে উঠে মন।
সুখ-চেয়ে সুখময় সুখের স্মরণ।

কিবা সুধাময় ভাব হেরিনু তখন !
বালোচিত সরলতা
যৌবনের মধুরতা
সরলতা মধুরতা একত্রে মিলন।
স্নেহে করে সে যৌবন
বাল্যসনে আলিঙ্গন
মেশামিশি হয়ে যেন সেই কলেবরে।
কেহই কাহারে হায়
ছাড়িবারে নাহি চায়
দুয়ের বাসনা যেন দুয়ে রাখে ধ'রে।
ঝিরঝিরে নিরমল
চঞ্চল ঝরণা জল
মিশিতেছে আসি যেন তরঙ্গিনি-নীরে।
এখনো পৃথক ভাবে
কিছু দূর ব'রে যাবে
শেষে না হেরিব আর হেন মাধুরীরে।
মিশিবে ঝরণা-বারি তরঙ্গিনি নীরে।

আলোকে আলোকে হ'লো অপূর্ব্ব মিলন!
ঘরেতে প্রদীপে আলো
প্রিয়ার বদনে আলো
মুক্ত বাতায়ন-পথে শশীর কিরণ।
হেরিতে হেরিতে সুখে
চুম্বিলাম চাঁদ মুখে
আচম্বিতে অধরেতে অধর মিলন
শীহরিনু শীহরিলী বালা সে তখন।

অধরে অধরে কেন সহসা মিলিত ?
[illegible] কেন [illegible]
[illegible] কেন
অরুণের [illegible] কেন ঊষা সে রঞ্জিত ?
চাঁদের কিরণে হেম
[illegible] কেন [illegible]
নলিনী সে সূর্য্যকরে কেন হরষিত ?।
[illegible] প্রেমিক-বর
[illegible] সদুত্তর
একে হেরি সুখী কেন অপরের মন।
দু—অধরে মেলা কেন বুঝাও তখন।

না জানি কি মোহজাল ঘেরিল দুজনে।
লাজে অবনত মুখী
লাজেতে মুদিল আঁখি
লাজেতে মিশায়ে গেল বিছানার সনে।
হেরিতে হেরিতে তায়
হইলাম জড় প্রায় ;
ছুটিল লহরী কত সুখের তুফানে
একবার সে অধরে অধর মিলনে।

চাহিল সে কতক্ষণে বিশাল নয়নে
চেয়ে আছি তার পানে
চাহিল আমার পানে
অমনি পড়িল পাতা সরমের সনে।
নয়ন ফিরিল তায়
হৃদয়ে কি রাখা যায়
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা চলিল গোপনে।
হৃদয়ের আলাপনে মোহিত দুজনে।

কতক্ষণে কি সুরব পশিল শ্রবণে !
মোহ কে বাড়িল পুন
জড়তা হ'লো দ্বিগুণ
চমকিনু সে সুরব পশিলে শ্রবণে।
ভাঙা ভাঙা মৃদু মৃদু
লাজে গাঢ় স্বর শুধু
[illegible] নাহি প্রবেশিল মনে।
হৃদয়ের ভাব চয়
হৃদয় জমিয়া রয়
[illegible] গাই [illegible] পশিবে কেমনে।
[illegible] মিশিয়া [illegible] পশিয়া শ্রবণে।

শিহরি শুনিনু সেই গদ গদ স্বরেতে
চাহি পুন কতক্ষণে
মলয় সমীর-সনে
না বুঝিনু কি বলিল মধুমাখা স্বরে—

কোমল কুসুমে যেন
শিশিরের বিন্দু হেন
কাঁপিল পরাণ শুধু হেরিনু অধরে।
না বুঝিনু কি বলিল সুধামাখা স্বরে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

মধুযামিনী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা অম হইতে না হইতেই গ্রামের লোক সকল হিঙ্গনার পরীক্ষা দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরের সম্মুখের প্রশস্ত সমতল ভূমিখণ্ডে উপস্থিত হইল। সকলেই এক রূপ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী। অধিকাংশ কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছে, এই কৌতূহল সকলের মনে দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়াছে, যেহেতু পরীক্ষার পাত্রী সর্ব্ববাদী-সম্মত অতীব রমণীয়া তরুণা কুমারী! প্রভাত সম্পূর্ণ প্রস্ফুট হইতে না হইতেই উক্ত স্থান বহুজনাকীর্ণ হইল। মন্দিরের দ্বার এখনও উদঘাটিত হয় নাই। আচার্য্য, এখনও বাহিরে আসেন নাই। তিনি অনুমতি না দিলে হিঙ্গনাকে আনিতে লোক যাইবে না; পরীক্ষাও আরম্ভ হইবে না। ক্রমে দুই দণ্ড বেলা হইল; গ্রামের প্রধান প্রধান লোক সকল একে একে আসিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য মন্দিরাভ্যন্তরে থাকিয়া গত রাত্রে সন্ন্যাসীর কঠোর বাক্য সকল স্মরণ করিয়া কাতর ভাবে বসিয়া ভাবিতে ছিলেন কি করিবেন? হিঙ্গনাকে অপবাদ দিয়া এক্ষণে উহা মিথ্যা এরূপ বলিতে পারেন না, বলিলে দেশের লোক সকল তাহারই মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে। পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রামের প্রধান লোকেরা একে একে আসিতেছেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না, তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আসিতেই হইবে, হিঙ্গনাকে আনিতে অনুমতি দিতেই হইবে;—পর লোক ভয়ে, ইহলোকে সুখভোগ, যশঃ, মান, পদমর্য্যাদা সমস্ত নষ্ট করিতে কয় জন সাহসী হয়? আচার্য্য ইন্দ্রিয়সেবক সর্ব্বদা দুষ্টাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল, সুতরাং এরূপ সাহস সহসা একত্রে করা অসম্ভব। তিনি বাহিরে আসিলেন, লোক সকল অভ্যর্থনা করিল, তিনি ধার্ম্মিক মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

তাহারা হিরনাকে আনিবার অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতি দিলেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে আট জন লোক হিরনাকে আনিবার জন্য গেল। অপবাদে অবসন্না—অনাহারে ক্ষীণা অনিদ্রা ও কুমারের অদর্শনে মলিনা—অবলা নির্দোষা কুমারীকে আনিতে আট জন সবলকায় পুরুষ ধাবিত হইল। কর্তৃপক্ষেরা তৎপরে বসিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন কোন গুরুতর কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, যেন সকলে কোন আনন্দমিলনে মিলিত হইয়াছেন। প্রায় দুই দণ্ড কাল অতীত হইল, হিরনা দীনবেশে মুক্তকেশে রোদনমুখ মূর্ত্তিতে তাঁহার পিতার বাহুমূলের উপর ভর দিয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কুমার আসিয়াছেন কি না, পুনরায় একবার চাহিলেন গত রাত্রের সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত আছেন কি না। যখন কাহাকেও দেখিলেন না তখন অবনত মুখে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চারিদিকে রব উঠিল "ঐ ডাইন আসিয়াছে,"—সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন, অনেক লোক অনেক রূপ বলিতে লাগিল। হিরনা অধিকতর অবনত মুখে রহিলেন। ইতি মধ্যে দুইজন লোক একটী মৎস্য ধরিবার জাল হিরনার মস্তকের উপর দিয়া তাঁহার দেহের উপর ফেলিয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইল; কেন না এরূপ না করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইতে পারে না, পাছে তিনি মন্ত্র বলে তাহাদিগকে নষ্ট করেন। হিরনা জালে আবৃতা হইলেন, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি সকল একস্বরে কহিলেন, "ঠিক হইয়াছে।" হিরনা জাল দ্বারা আবৃত হইলে তিনি সহসা স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক আরক্ত নয়নে আচার্য্য ও গ্রামের লোকদিগের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, দেহ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। অরুণা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া এতাবৎকাল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইতেছিলেন, সহসা তাঁহার বিকৃত, বিদ্রোহ ভাব দর্শন করিয়া তিনি ভীতা ও চঞ্চলা হইলেন। দর্শকেরা, কর্ত্তৃপক্ষেরা ও আচার্য্যও চমকিত, ভীত ও চিন্তিত হইলেন। আচার্য্য ও অরুণা নিজ নিজ আত্মগ্লানি ও পাপের স্বভাবসিদ্ধ পরিণাম ভয়ে ভীত ও চঞ্চল হইয়াছিল, অপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রকৃত ডাইন ভাবিয়া ভীত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। হিরনা সেই অবস্থায় রহিলেন। কিয়ৎকাল গেল। ক্রমে সকলের মনে সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল, বিশেষতঃ হিরনা জালদ্বারা আবৃত রহিয়াছেন এরূপ অবস্থায় তিনি কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না। ভয়ের অপগমে, সাহসের আবির্ভাবে গ্রামের প্রধান লোকের পরীক্ষা দর্শনের জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের অনুমতি চাহিলেন, আচার্য্য অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুই জন লোক দুইটী পিপুল পত্র আনিয়া হিরনাকে হস্ত পাতিয়া লইতে বলিল, তিনি পূর্ব্ববৎভাবে অস্বীকার করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন তিনি "ডাইন নহেন" এবং বলপূর্ব্বক জাল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি মধ্যে সহসা দূরে বিস্তর অশ্বপদশব্দ এককালে শ্রুতিগোচর হইল। দর্শকবৃন্দ হিঙ্গনার প্রতি লক্ষ্যত্যাগ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ মধ্যে তীর-বেগে অগ্রগামী অশ্বারোহী সকলে আসিয়া বনশ্যামদেবের মন্দির ও সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ড নিমেষ মধ্যে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। প্রত্যেক অশ্বারোহীর কটীদেশে তরবারি ও হস্তে সুদীর্ঘ কিরীচি। তাহারা নিজ নিজ কিরিচী অগ্রসর করিয়া তত্রস্থ লোকদিগের গতি এক বারে রোধ করিল। লোক সকল চমকিত, স্তব্ধ ও ভীত হইয়া পরস্পর মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল ইহারা কে? কি হেতু এস্থলে আসিল? হিঙ্গনা কি কুহক বলে এই সকল অশ্বারোহী সৃষ্টি করিল? তাহারা বাক্‌শক্তিহীন হইয়া চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে একটী সুন্দর সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া এক অতীব সুশ্রী যুবা পুরুষ মন্দ মন্দ গতিতে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার গলদেশে গজমতি হার, কটীদেশে উলঙ্গ তরবারি, মস্তকে রাজমুকুট, কর্ণে হিরকাদি খচিত সুবর্ণ কুণ্ডল। তাঁহার পশ্চাতে আর ছয়জন অশ্বারোহী। তাঁহার নবীন বয়স, সুন্দর মুখশ্রী, রাজপরিচ্ছদ, মহামূল্য রাজমুকুট দর্শনে সকলে বিস্মিত নয়নে হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া চাহিয়া রহিল। হিঙ্গনা দৃষ্টিমাত্রে কুমারকে চিনিতে পারিয়া প্রফুল্ল মুখে, অনিমেষ লোচনে তাঁহার স্নেহপূর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন কুমার যথার্থই রাজপুত্র ও তাহার মুক্তির হেতু আসিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর এইক্ষণে জালে আবৃত থাকাতে তিনি চলিতে অক্ষম, এই জন্যই তিনি স্থির ভাবে থাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুমার অশ্ব হইতে নামিলেন আর ছয়জনও নামিল। তিনি শীঘ্র হিঙ্গনার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সস্নেহে তাঁহাকে জাল হইতে মুক্ত করিয়া সেই স্থলে জানু পাতিয়া মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খুলিয়া তাহার পদতলে রাখিলেন ও তৎপরে সেই মুকুট তুলিয়া আপন হস্তে তাহার মস্তকে পরাইয়া তাঁহাকে আপন অশ্বোপরি বসাইলেন। দর্শকবৃন্দ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বাক্‌শক্তিহীন হইয়া চাহিয়া রহিল। কুমার হিঙ্গনাকে অশ্বোপরি বসাইয়া স্বীয় গলদেশ হইতে গজমতি হার খুলিয়া তাঁহার গলে পরাইয়া উৎসুক নয়নে তাঁহার প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও ছয়জন অনুচরকে আচার্য্য ও গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা মাত্র তাহারা তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া আনিল। কুমার তরবারি খুলিয়া আচার্য্যকে সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিথ্যাবাদিন্ ভণ্ড যাজক! শীঘ্র বল্ কোন লোক কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তুই এরূপ অপবাদ ঘোষণা করিলি? ও এই অপবাদ ঘোষণা করিয়া তোর কি মনোরথ বা স্বার্থ সিদ্ধি হইল? আচার্য্য সাক্ষাৎ মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া প্রাণ ভয়ে কম্পিত ভাবে যোড়হস্ত করিয়া অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে কহিল—'আ—আমি কি—কিছুই জানি—না, অ—অ—অরুণা—না এ—এই সমস্ত আ—আমাকে করিতে ব—বলিয়াছিল—আ—মি তা—ই ক—করিয়াছি।' কুমার আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে হিঙ্গনার দিকে

চাহিলেন, তিনিও বিস্মিত ভাবে বাক্‌শক্তি-হীন হইয়া কুমারের প্রতি চাহিয়া অবনত-মুখে রহিলেন। কুমার তৎপরে অরুণার প্রতি চাহিলেন। অরুণা বিকৃতমুখী হইয়া অধোমুখে রহিল। কুমার তাহাকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। জনৈক অনুচর তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া আসিল। অরুণা আসিবার সময় দুইবার কাতর ভাবে আচার্য্যের প্রতি চাহিল। আচার্য্য আত্মনির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। অরুণার কাতর দৃষ্টির কোন ফল এইক্ষণে দর্শিল না। আচার্য্য কর-যোড়ে অরুণার সমস্ত কথাই বলিয়া দিল, কুমার শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবনত মুখে থাকিয়া হিঙ্গনার নিকট যাইয়া মৃদুস্বরে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সরল হৃদয়া ক্ষমাশীলা হিঙ্গনা সকলকেই ক্ষমা করিতে বলিলেন। কুমার তখন উচ্চকণ্ঠে অরুণা ও আচার্য্যের দোষ প্রকাশ করিয়া ও সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া হিঙ্গনার ক্ষমার অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলেন। দর্শক সকল শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হিঙ্গনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। তৎপরে কুমার আপন সৈন্যদিগকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করাতে তাহারা সকলেই সেইস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কেবল ছয় জন সম-ভিব্যাহারী অশ্বারোহী তাঁহার নিকট উপ-স্থিত রহিল। কুমার প্রিয়তমাকে আপন পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া তাঁহার বাটী লইয়া চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুমার হিঙ্গনাকে লইয়া যখন গ্রামের ভিতর দিয়া যান, তখন গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই হিঙ্গনার রূপ, বুদ্ধি, প্রণয় ও অদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে ডাইন বলিয়া ভয় পাই-য়াছিল, ডাইন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারাই আবার নবীনা রাজরাণীর শ্রীমুখ মণ্ডল দেখিতে পিপাসু হইয়া তাঁহার অশ্বের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। মনুষ্যের সাধুবাদ, প্রশংসা ও নিন্দা সমস্তই শুভাশুভ ফলের অনুগত। একদিন পরে যাঁহার মস্তকমুণ্ডন হইত, এক্ষণে সেই মস্তকের কেশরাশি স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহার আছে? যে গলদেশে একদিন পরে রজ্জুর ব্যবস্থা হইত, সেই গলদেশ এইক্ষণে গজমতিহারে শোভিত।

গ্রামের লোকেরা হিঙ্গনা সম্পর্কে নানা কথা কহিতে লাগিল, নানারূপ অপূর্ব্ব গল্প সৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ বলিল হিঙ্গনা পূর্ব্বাবধি জানিত যে কুমার যথার্থই রাজ-পুত্র তাই ওরূপ নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়া-ছিল, কেহ বলিল তা—নয় তা'হলে সে কি কাট কাটিতে, গরুর সেবা করিতে দিত? কেহ বলিল সে জানিত—জানিত, কিন্তু গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেনি, শুধু

কি প্রণয়ের জন্যে নিত্য পর্ব্বতে গিয়ে কুমারের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত ? একজন বলিল তাই বটে আমি এক দিন হিঙ্গনাকে ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে আসিতে দেখিয়াছিলাম, তখনও ত আশা ছিল,তা না হলে ফুলেরই মুকুট মাথায় দিবে কেন ? এক জন বলিল আমি ভাই কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে থেকে শুনেছিলুম যে উদয় যখন বাড়ী যায় তখন স্বপ্ন দেখেছিল যেন একজন সন্ন্যাসী তাহার মাথার কাছে এসে বল্লেন "যে তুই হিঙ্গনাকে পাবার জন্যে এত চেষ্টা কর্‌চিস্‌, এত জিনিস্‌ পত্র কিন্‌লি কিন্তু তুই তাকে পাবি নি"—এই কথা বলে সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হলেন—তার—পর-উদয়, ঘোড়া, উট, হাতী, বড় বড় বাড়ী, বাগান, কত সোনা, রূপা স্বপ্ন দেখ্‌তে ২ জেগে উঠ্‌লো—তা'ত ভাই সত্য হল ? আর দেখেচিস্‌ সেই জন্য উদয় এসে পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে ভাল করে কথা কয়নি। যাহউক ভাই মেয়েটার খুব কপাল ? আর এক জন উত্তর দিল "তা আর বল্‌তে, যেমন সুন্দরী মেয়ে, বর ও তেমনি সুন্দর, —হ্যাঁরে কবে বিয়ে হবে ! না ঐ মুক্তার মালা গলায় দিতেই বিয়ে হয়ে গেল ?"

হিঙ্গনার দুঃখের অবসান হইতেই অরুণার দুঃখের আরম্ভ হইল। হিঙ্গনা অপমানিত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত না হইয়া, অরুণা তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বজনপরিত্যক্ত হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার কল্পনা করিতে লাগিল। দেশের লোক সকল যে রূপ আশ্চর্য্যের সহিত কুমারের সংক্ষিপ্ত প্রণয়-বৃত্তান্ত ও পরিচয় শ্রবণ করিয়াছিল তাহারা আবার সেই রূপ আশ্চর্য্যের সহিত অরুণার দুশ্চরিত্রতার কথা আচার্য্যের মুখ হইতে শ্রবণ করিল। হিঙ্গনা ও অরুণা, দুইটী প্রকৃতি, দেশের দুইটী আদর্শস্থল হইল। একের জীবন এইক্ষণে নব নির্ম্মল প্রেম, সুখ সম্পদে পরিবেষ্টিত, অপরের ঘৃণা অনুতাপ ও হতাশ জর্জ্জরিত। যে "কালা-মুখীর" মরণের জন্য অরুণা এতাদৃশ চেষ্টিত হইয়াছিল, সেই কালামুখী না মরিয়া রাজ্ঞী হইল, ও তাহাকে মরিতে হইল। নির্দ্দোষী ব্যক্তি বিপদ বা মরণ কালে আকাশের প্রতি চাহিয়া বিধাতাকে আপন দুর্ভাগ্যের সাক্ষী করে, অরুণা এইক্ষণে তাহাও করিতে পারিল না, কেননা তাহার দুঃখ তাহার দুশ্চরিত্রতার ফল—সাক্ষী আচার্য্য। তাহার ও অবস্থা সমশোচনীয়।

দেশের প্রধান লোক সকল এক্ষণে হিঙ্গনার প্রীতিসম্পাদনার্থে ও রাজকুমারের অনুগত হইবার জন্য আচার্য্য ও অরুণার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার আজ্ঞা দিল।

কুমার হিঙ্গনাকে সযত্নে আপন সঙ্গে লইয়া হিঙ্গনার বাটী গমন করিলেন। বাটী পৌঁছিতে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি হইল। হিঙ্গনার পিতামাতা হিঙ্গনার মুখচুম্বন করিয়া আনন্দে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন। উদয়গিরি হিঙ্গনার উদ্ধারে আনন্দিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কি সৌন্দর্য্য কি সাহস, কি সম্পদ কিছুতেই তিনি কুমারের তুল্য নহেন এই বিবেচনা করিয়া, বহুদিনের প্রণয় সাধে হতাশ হইয়া দুঃখাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। কুমার হিঙ্গনার রক্ষার জন্য ছয় জন অশ্বারোহীকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আপনি কিছু ক্ষণের জন্য বিদায়

হইলেন। হিঙ্গনা এক্ষণে রাজ্ঞী হইয়াছেন দেখিয়া প্রতিবাসীরা নানারূপ উপহার দিতে লাগিল, গ্রামের ছোট বড় সকলেই অরুণার ও আচার্য্যের নিন্দা করিয়া ও তাহার রূপ ও গুণের প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। হিঙ্গনার পিতা অদ্যাবধি একজন গ্রামের উচ্চতম গণনীয় ও মাননীয় লোক হইল।

সায়ংকালে কুমার ধনুর্ব্বাণ হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় বেশে হিঙ্গনার বাটী আসিয়া গাভীগণ সহিত হিঙ্গনাকে লইয়া পর্ব্বতদেশে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কেহই বাধা দিল না। সকলে এই যেন একটী নূতন কৌতুক দেখিতে আসিল। কুমার হিঙ্গনাকে পর্ব্বত দেশে লইয়া চলিলেন। অশ্বারোহীগণ তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে ছিল, কুমার ইঙ্গিত করাতে তাহারা ফিরিয়া গেল।

আবার সেই পর্ব্বত দেশ সেই বৃক্ষতল, যে স্থলে কুমারের সহিত হিঙ্গনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, যে স্থলে কুমার হিঙ্গনার সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে মোহিত হয়েন ও সুমিষ্ট বাক্যে হিঙ্গনাকে স্বীয় গুণের পক্ষপাতিনী করেন;—সেই বৃক্ষতল যে স্থলে কুমার স্বীয় উচ্চ পদ ও সম্পদ গোপন করিয়া দারিদ্রের পরিচয় দিয়া হিঙ্গনার প্রেমের প্রথম পরীক্ষা করেন; ও তাঁহার নিঃস্বার্থ হৃদয়ের চিহ্ন স্বরূপ দ্বাদশ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন, এই সেই বৃক্ষতল যে স্থলে কিছু দিন পূর্ব্বে হিঙ্গনা বিগলিত নয়নে একাকিনী দণ্ডায়মানা হইয়া "কৈ কুমার", "কৈ কুমার" বলিয়া বারম্বার দুঃখ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছিলেন, পুনরায় সেই বৃক্ষতল! এক্ষণে অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন!

"চিরদিন কখন সমান না যায়"।

সেই বৃক্ষতলে আসিয়া হিঙ্গনা সজল নয়নে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার! আপনি গত রাত্রে আমার দুরবস্থার কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—কোন—সন্ন্যাসী কি আপনাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন?

কুমার। (মৃদু হাসিয়া) হিঙ্গনে! আমি সেই সন্ন্যাসী। আমি সেই দিন সন্ধ্যাকালে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে পর্ব্বতদেশে আসিয়া অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে তোমার বাটী যাইতে ছিলাম, পথিমধ্যে তোমার অপবাদ ও শাস্তির কথা শুনিয়া তোমাকে সেই রাত্রে সান্ত্বনা করিবার জন্য সন্ন্যাসীবেশে আসিয়া প্রবোধ দিয়া গিয়াছিলাম।

হিঙ্গনা। কুমার! আমি সেই রাত্রে যে কিরূপ দুঃখে অভিভূত হয়ে ছিলুম তা আমি তখন বল্‌তে পারিনি তুমিত আসিয়াছিলে, তুমিত আমার হৃদয়ের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলে।

কুমার। (হাসিয়া) হিঙ্গনে! এখনত তুমি আমার।

হিঙ্গনা। (মৃদু হাঁসিয়া) বেইমান! এখনও কি প্রত্যয় হয়নি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনার উদ্ধারের পরদিন অবধি কুমার প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া হিঙ্গনাকে দেখিয়া যায়েন। বিবাহের দিন এখন স্থির হয় নাই। দুই সপ্তাহ এইরূপে অতিবাহিত হইল। এক দিন সায়ংকালে কুমার হিঙ্গনার পিতার নিকটে আসিয়া বহুমূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত সুবর্ণ কারাজ (চুড়ী) হিঙ্গনাকে উপহার দিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে অন্যমত কাহার আছে? বরং এত দিন যে পরিণয় সম্পর্কে তিনি কোন কথা কহেন নাই, গ্রামের লোকেরা ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ভাবিয়া ছিল।

সুখদ ফাল্গুন মাস উপস্থিত। পরিশুষ্ক বৃক্ষরাজি নবীন পত্রে সুশোভিত। সুমন্দ মলয়ানিল সময়ে২ প্রবাহিত। পক্ষীকুল মদকল! কুমারের ইচ্ছা এই মধুমাসের পূর্ণিমা রজনীতে হিঙ্গনার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। হিঙ্গনা ও কুমারের ইচ্ছায় সম্মতি দিলেন, গ্রামের উচ্চ লোক সকল রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরিণয় কাল স্থির করিলেন।

অদ্য সেই শুভ দিন। হিঙ্গনার নিঃস্বার্থ প্রেমের পুরস্কার তাঁহার বহুদিনের মনোরথ সিদ্ধির সময় নিকটবর্ত্তী। যে লকুচ বৃক্ষ কুঞ্জাভ্যন্তরে হিঙ্গনা ও কুমারের প্রাণের পরিণয় হইয়া ছিল, সেই পবিত্র সুদৃশ্য স্থলে হিঙ্গনার অভিমতে তাহাদের সামাজিক পরিণয় ও সম্পন্ন হইবে। হিঙ্গনা প্রফুল্ল মুখী। তাঁহার গলদেশে কুমার দত্ত গজমতিহার, হস্তে সেই দীপ্তিমান সুবর্ণ কারাজ। তাঁহার ফুল্ল নয়নযুগল কজ্জলরাগে অতি মনোহর। পৃষ্ঠদেশে লম্বিত বেণী তাঁহার অসামান্য রূপের পরিবর্দ্ধন করিতেছে। তিনি সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন যখন তিনি কুমারকে "প্রিয়তম স্বামিন্" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিবেন।

হিঙ্গনা অদ্য যামিনীতে "রাজ্ঞী" হইবেন। দেশের নবীনা যুবতীসকল প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিশেষ শুভ রাজপরিণয় অলঙ্কৃত করিবার অভিলাষে, অপরাহ্ণে সুন্দর বেশ ও আভরণে সুসজ্জিতা হইয়া সূর্য্যাস্ত যাইবার পূর্ব্বে আনন্দ মনে গান করিতে করিতে পুষ্পচয়নে যাইতে ছেন।—

চল চল চল সখি! ফুল চয়নে।
বেলা থাকিতে থাকিতে চল যাই বনে॥
আমরা দুখিনী জন, কোথা পাব আভরণ,
বনরতন তুলি মালা গাঁথবো যতনে।
গাঁথ্‌বো চুড়ি হার, মুকুট পাঁজর
গাঁথ্‌বো শিঁথী ঝুম্‌কো বেণী দেখ্‌বে দেবগণে॥
কুসুম শরাসন, কুসুম তাহে বাণ,
রচিব ফুলতূণ অতি নিপুণে।
কুমারী কুমার, সাজবে মনোহর,
বিমল ষোলকলা শশীকিরণে॥
চল চল চল সখী! ফুল চয়নে।
বেলা থাকিতে থাকিতে চল যাই বনে॥

তাঁহারা এই রূপ আনন্দউচ্ছাস প্রকাশ করিতে করিতে নিকটস্থ বনে প্রদোষ বিকাশী পুষ্প সকল চয়নে চলিলেন। এদিকে দিবাবসান না হইতে হইতে কুমুদিনীনাথ সুনীল গগনে উদয় হইয়াছেন মধুমাস সমাগমে পার্ব্বতীয় স্থান সকল সায়ংকালে অতি রমণীয় শ্রী ধারণ করে, অদ্য সেই এক মধুময় দিন। বর ও কন্যা উভয়েই রূপ ও গুণে তুল্য বিভূষিত। হিঙ্গনার নিঃস্বার্থ প্রেম, তাঁহার অনুরাগের ঐকান্তিকতা, কুমারের উদার স্বভাব, দয়া ও দাক্ষিণ্য, সঙ্গীতের মধুর আলাপন, নব যুবতী গণের ঐক্যতানিক গান, পরিণয়ের আয়োজন, প্রভৃতিতে এই মধুময় দিনের মধুরতার সমধিক পরিবর্দ্ধন করিয়া নিকট বর্ত্তিনী মধুযামিনীর মধুরতার পুষ্টি সম্পাদন করিতেছে।

দিবাবসান হইতে না হইতে কুমারের সৈন্য সকল আসিয়া হিঙ্গনার বাটী হইতে পর্ব্বতদেশ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইল। গ্রামের লোক সকল তাহাদিগের যুদ্ধ পরিচ্ছদ ও যুদ্ধাস্ত্র সকল দেখিতে আসিল ও হিঙ্গনার শুভাদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে একবার ঐ সকল সৈন্যদিগকে দেখিয়াছিল, তখন উহাদিগের ভাব ভিন্ন রূপ ছিল; প্রবল ঝটিকায় উদ্বেলিত জলনিধির ভীষণতার একরূপ দৃশ্য, উহার ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অন্যরূপ।

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তগত হইলেন। ষোড়শকলা পূর্ণ নিশামণির বিমল কিরণ জগতে অমৃত বরিষণ করিলে ক্রমশঃ বিবাহের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইতে লাগিল। সুখসেব্য মলয়ানীল নব-বিকাশী পুষ্প মাল্যের সুগন্ধ, কুমারের প্রণয়, হৃদয়ের আশা নব যৌবনের উৎসাহে হিঙ্গনাকে এই সময়ে পরম সুখী করিলে তিনি আপন মনে গাহিলেন।—

হৃদয়মাঝে প্রণয়কুমুদ এত দিনে ফুটিল আজি
শশী নিশী বায়ু ফুল, কত মোরে দুঃখ দিল,
তুষিছে এখন, যেন কত প্রিয়জন,
দেখে আমায় বিধি রাজি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নবীনা বামাগণ পুনরায় গান করিতে করিতে ফুল আভরণ সকল লইয়া হিঙ্গনার বাটীতে আসিলেন, পরিণয়ের মাঙ্গলিক কার্য্য সমস্ত আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই মধুযামিনীর মধুময় সময় নিকটবর্ত্তী। কুমার অতি সুন্দর একটী রণ-পরিচ্ছদ পরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে হিঙ্গনার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিণয়বাদ্য আরম্ভ হইল। কুমারের রণ পরিচ্ছদ তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ ও কটিদেশে তরবারি তাঁহার স্বাভাবিক অসামান্য সৌন্দর্য্যের সমধিক পরিবর্দ্ধন করিয়াছে। হিঙ্গনার পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, সম্মুখের আকুঞ্চিৎ আলুলায়িত কেশরাশি মস্তকের মণিময় মুকুট, দেহের ফুলাভরণ সমস্ত তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী বনদেবীর স্বর্গীয় শোভা দান করিয়াছে। পরিণয়ের সময় আর অধিক দুর নাই, কুমার হিঙ্গনাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া মন্দ গতিতে পর্ব্বতোপরি চলিলেন, নবীনা বামাগণ, আত্মীয় জন ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল পশ্চাৎ ২ চলিলেন। চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ রজত কিরণে পৃথিবী আলোকিত। সৈন্যগণের রণ বাদ্য যন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরি

পুরিত।* বর ও কন্যা লকুচবৃক্ষকুঞ্জাভ্য স্তরে প্রবেশ করিলেন। বামাগণ তাঁহা- দিগকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া ফুলা ভরণে উভয়কে সুন্দর রূপে সাজাইলেন, হিঙ্গনার পিতা সজল নয়নে কুমারকে হিঙ্গ- না দান করিতে অগ্রসর হইলেন। সম্প্র- দান ও পরিণয় ক্ষত্রীয় রাজকুল পদ্ধতি মতে সুসম্পন্ন হইল। কুমার তরবারি চুম্বন করিয়া হিঙ্গনার সহিত মাল্য বদল করিলেন। উভয়েই সস্পৃহ নয়নে উভয়ের প্রতি চাহিলেন। নভোমণ্ডলে শুভ্র মেঘদল সহিত চন্দ্রমা পরিক্রম করিতেছিলেন এই সুখের সময়েমেঘদল সরিয়া গেল, এবং তিনিও যেন সাক্ষী স্বরূপ হইয়া সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, উভয়ের পূর্ব্বাবধি সুমার্জ্জিত দেহ মন এক্ষণে উভয়ে লীন হইল পুনরায় শঙ্খধ্বনি হইল, বামাগণ সুমিষ্ট স্বরে আনন্দে গান করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

পরিশিষ্ট।

সুন্দরী সরলা হিঙ্গনার প্রেমের ঐকা ন্তিকতার পুরস্কার হইল। উদয়গিরি কিছু দিন পরে ক্ষুণ্ণমনে পুনরায় কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন। আচার্য্য ও অরুণা গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর দুর্ব্বল- হৃদয় আচার্য্য পদ মান অর্থ, সমস্ত হারাইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। অরুণা যৎপরোনাস্তি লজ্জিতা হইয়া প্রথমতঃ আত্মঘাতিনী হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, পরে একাকিনী নদী- তটে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল—

"জীবন সুখের মূল কি হইবে ত্যজিলে।"

অরুণা হিঙ্গনার বিবাহ দেখিতে রহিল না। ভৈরবীর বেশ পরিধান করিয়া তীর্থস্থান সকল পর্য্যটনে গমন করিল।

কুমার হিঙ্গনাকে বাটীতে লইয়া আসিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও অট্টালিকা প্রভৃতি দেখাইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে প্রেমভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হিঙ্গনে! যদি আমি রাজপুত্র না হইয়া দুঃখী হইতাম, তা হলে তুমি কি আমার দীন অবস্থায় আমার সহিত চির- দিন সুখে থাকিতে? "হিঙ্গনা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন বেইমান!—তুমি বেইমান্—তুমি বেইমান! কুমার অনুরাগভরে তাহার ক্ষুদ্র অধরটী চুম্বন করিলেন।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

মধুযামিনী সমাপ্ত।

খিয়ংথা জাতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রামের কোন অনাবৃত স্থানে বংশ ও তৃণ দ্বারা কতক গুলি গৃহ নির্ম্মাণ করে। বিবাহের দিন ঐ সকল গৃহ পুষ্প ও নবপল্লবে সুশোভিত করে ও নিমন্ত্রিতগণের আহারার্থ নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। এইখানে কন্যাপক্ষীয় বাদ্যকরদিগেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। বরযাত্র সমারোহে যাইতে পারে এমন প্রবেশপথও প্রশস্ত করা হয়। বর ও বরের পিতা মাতার অবস্থানের নিমিত্ত যে গৃহ প্রস্তুত হয় তাহা ঐ সকল গৃহ হইতে একটু স্বতন্ত্র থাকে ও উহা বিশেষরূপে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত হয়। বর ও বরের জনক জননী মহার্হ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঐ গৃহে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত দর্শকবৃন্দকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করেন। এদিকে কন্যাও ঐরূপ নানাবিধ বিচিত্র বেশভূষায় অলঙ্কৃত ও সহচরীগণে পরিবৃত হইয়া পিতৃভবনে অবস্থিতি করে। গ্রামস্থ বালকেরা তাহাদের প্রথা অনুসারে মিঠাই পাইবার নিমিত্ত উভয়পক্ষেরই নিকট আবদার করে ও আনন্দ সহকারে দলবদ্ধ হইয়া বাদ্য করিতে থাকে। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সকলে একত্র হইয়া গমন করে, বেহালা ও বাঁশী বাজাইতে থাকে ও নানা প্রকার গান করে। ইহা বলা বাহুল্য যে গ্রামস্থ যাবতীয় পুরস্ত্রী বালিকা ও কুলবধূগণ ঐ সময়ে কন্যার আলয়ে আসিয়া একত্র হয় এবং এদিন আর গম্যাগম্য কিছুই বিচার থাকে না। রাত্রি প্রভাতপ্রায় হইলে বর তুমুল আনন্দ ধ্বনি ও মঙ্গলবাদ্যের কোলাহল সহকারে কন্যাভবনে নীত হয়। কিয়ৎকাল পরে সকলে নিস্তব্ধ হইলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য আরম্ভ হয়। কন্যা এই সময়ে সখীগণ পরিবৃত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। উঠানে জলপূর্ণ কলস, ধান্য ও আম্র পল্লব স্থাপিত থাকে। চরকার প্রস্তুত নূতন কার্পাস সূত্রে ঐ সকল দ্রব্য পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় পরস্পর সম্মুখীন বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষদিগকেও প্রদক্ষিণ করে। অনন্তর পুঞ্জি বা পুরোহিত আসিয়া কতকগুলি স্তোত্র পাঠ করিতে থাকে। ঐ সকল স্তোত্র স্বতন্ত্র ভাষায় (বোধ হয় পালি ভাষায়) রচিত ও বোধ হয় তাহার অর্থ পুরোহিতেরও বুদ্ধির অগোচর। স্তোত্র পাঠ হইলে পর তিনি দুই হস্তে দুই মুষ্টি করিয়া অন্ন লইয়া দক্ষিণ হস্ত বাম দিকে ও বাম হস্ত দক্ষিণদিকে করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সাতবার বরের মুখে ও সাতবার কন্যার মুখে গ্রাস তুলিয়া দেন। অনন্তর বর ও কন্যার করধারণপূর্ব্বক বরের কনিষ্ঠাঙ্গুলি কন্যার বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধৃত করান। তৎপরে অস্ফুটরূপে কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণ

পূর্ব্বক সম্প্রদান কার্য্য সমাধা করেন। সম্প্রদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর বর কন্যার কর ধারণ পূর্ব্বক গৃহ প্রদক্ষিণ করে ও নতভাবে উভয় পক্ষের উচ্চ সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করে কন্যা বরের বামদিকে উপবিষ্ট হয়। এই সময়ে তাহাদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে নিমন্ত্রিত বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা যথাযোগ্য বস্ত্র অলঙ্কার বা গৃহ সজ্জার সামগ্রী দ্বারা বর কন্যার সম্বর্দ্ধনা করে।

এইরূপে সমস্ত বৈবাহিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে চতুর্দ্দিকে নাচ, গান, সুরাপান, কুস্তি ও পরস্পর আলাপ প্রণয়ের ধুমধাম পড়িয়া যায়। বর ও কন্যাকে সমস্ত রাত্রি উপবেশন করিয়া থাকিতে হয়। এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে ভাগ্যবানেরা সাত দিন প্রত্যহ সাতবার করিয়া নূতন স্ত্রীর সহিত একত্র আহার না করিলে বিবাহ সুসম্পন্ন বোধ করে না। বিবাহের পর বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের বধূর সহিত কথোপকথন, হাস্য, পরিহাস ও তাহার করস্পর্শ করিতে পারে কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের স্ত্রীগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিতে নাই। এইপ্রকার প্রথা প্রায় পার্ব্বতীয় সমুদায়প্রদেশেই প্রচলিত। কোন কোন স্থলে ইহা অপেক্ষাও বাড়াবাড়ি দেখা গিয়া থাকে। ম্যান্ সাহেব বলেন যে সাঁওতালদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অনিষ্টাচরণ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি শুনিয়াছেন যে উহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিলে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মীয়েরা তথায় সমবেত হয়; কেহ উপবেশন এবং কেহ বা ঢক্কা ধ্বনি সহকারে প্রেত কৃত্য ঘোষণা করে; স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দন ও চীৎকার করিয়া থাকে, পুরুষেরা শবদেহ প্রক্ষালন ও আচ্ছাদন প্রভৃতি চরম সংস্কারে ব্যাপৃত হয়; কেহ কেহ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক দাহ্য কাষ্ঠের আহরণ ও শবাধার নির্ম্মাণ জন্য বংশভার আনয়ন করে। মৃত্যুর পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রেত কার্য্য সম্পন্ন হয়। মৃত ব্যক্তি ধনী বা প্রভুশালিতা সম্পন্ন হইলে, তদীয় দেহ চক্রবিশিষ্ট শকট শ্মশান ক্ষেত্রে বাহিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক মাত্রেরই এই প্রকার বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল সামান্যেরা তাহাদের আত্মীয়ের স্কন্ধে বাহিত হয়। বক্ষ্যমাণ নিয়মে শ্মশানযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে;—নিকটে যদি পুরোহিত থাকে, তাহারা প্রথমে আগমন এবং সশিষ্যে পীত বস্ত্র পরিধান ও স্কন্ধদেশে তালী ব্যজন বহন পূর্ব্বক সকলের মূর্দ্ধণ্য হইয়া গম্ভীর ভাবে গমন করে। অনন্তর মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা তদীয় উদ্দেশে পুরোহিতদিগকে দান করিবার অভিলাষে খাদ্য ও বস্ত্র সমভিব্যাহারে দুই দুই জন সমাগত হয়। তদনন্তর ছয় জন লোক যত ঢক্কা পাওয়া যায় সমভিব্যাহারে গ্রহণ করিয়া, বংশভারের উপরি শবাধার বহন করে। আত্মীয়ের মধ্যে পুরুষবর্গীয়েরা সেই মৃতাধারের পশ্চাদ্ভাগে সমাগত হয়। অনন্তর প্রতিবেশবাসী কামিনীগণ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আগমন করিলেই এই শ্মশানে যাত্রা সমাপ্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের

জন্য চারিবার ও পুরুষের জন্য তিনবার উপর্য্যুপরি কাষ্ঠ দিয়া প্রেতস্থান নির্ম্মাণ এবং তাহাতে শবশরীর নিক্ষিপ্ত হয়। তৎকালে প্রধান পুরোহিত মৃতব্যক্তির উষ্ণীষের একপ্রান্ত গ্রহণ ও ধারণ পূর্ব্বক নিয়মিত মন্ত্র প্রয়োগ করিলে, মৃতব্যক্তির চারিজন আত্মীয় সেই প্রেতকুণ্ডের চারিকোণে দণ্ডায়মান হইয়া, কতিপয় সলিলবিন্দু নিক্ষেপ করে। অনন্তর মৃতব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্ত্রী বা পুরুষ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া থাকে। এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, ভস্ম সকল সাবধানে সঙ্কলন ও কোণাকারে উত্তোলিত মৃত্তিকার স্তূপমধ্যে সেইস্থানে প্রোথিত করিয়া, সমদীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডে লগ্ন করত প্রেতভূমির উপরিভাগে একটী বংশ দণ্ড স্থাপন করে। শ্মশানান্তে সকলই স্নান করিয়া থাকে। এবং মৃতব্যক্তি গৃহের কর্ত্তা হইলে, তাঁহার সরণী ফেলিয়া দিয়া পশ্চাৎ কুড্যে গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর সকল আত্মীয়ে পানাহারে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তদনুসারে ব্যয় ভার বহন করে। সপ্তাহ অতীত হইলে, পুরোহিতেরা মৃতব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনামানসে তদীয় গৃহে পুনরায় সমবেত হয়।

খিয়ংথাদের এক মাত্র দোষ যে, তাহারা অন্যান্য বিষয়ে নির্ম্মল হইলেও চুল অতিশয় অপরিষ্কার রাখে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই কেশ অতিশয় লম্বা করিয়া থাকে এবং কস্মিন কালেও ধৌত করে না। অতএব ইহার পরিণাম যেরূপ অনুমিত হয়, সেরূপ বর্ণন করা দুষ্কর। স্ত্রী দিগের কেশ দীর্ঘায়িত, কৃষ্ণবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত স্থূলতা বিশিষ্ট, মস্তকের পশ্চাৎভাগে অঙ্গুরীয়ের আকারে একত্র গ্রথিত এবং রৌপ্যময় সূচি বিশেষ সন্নিবদ্ধ। এই সূচিলগ্ন রৌপ্য শৃঙ্খলে তাহাদের পৃষ্ঠভাগ বিলম্বিত কেশগ্রন্থি দ্বিধা জড়িত হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই সচরাচর পরচুল ব্যবহার করে। ঐ প্রকার কেশ গ্রন্থির স্থূলতা সম্পাদনার্থ এই পরচুল ব্যবহৃত হয়। পার্ব্বতীয় গণের নিষেবিত বিভাগস্থ প্রত্যেক পণ্যক্ষেত্রেই পরচুলের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরুষ জাতির প্রায় অনেকেই পৃষ্ঠদেশে কেশ গ্রন্থি বন্ধন করে। এবিষয়ে র্যাফয়িংথা ও বর্ম্মাবাসী ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাদের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না পূর্ব্বোক্ত উভয় জাতি অপেক্ষাকৃত মনুষ্যের ন্যায়, কপালের উপরি শিরোভাগে অঙ্গুরীয়ের আকারে গ্রন্থিবদ্ধ কেশ ভার বহন করে। বোমং প্রধান আমার নিকট এতদ্ বিষয়ক যে কিংবদন্তী কীর্ত্তন করেন, তাহা এই,—

পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও আরাকানে মোগলদিগের রাজত্ব সময়ে একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। মদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ আরাকানে কোলডান নদীর তীর দেশে বাস করিতেন বর্ম্মরাজ বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আরাকান স্বামীর রাজ্যাধিকার আত্মসাৎ করিবার অভিলাষে স্বকীয় মায়াবিৎ ব্যক্তিদিগকে একত্র আহ্বান ও মন্ত্র সভায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি আরাকানে গমন ও তদীয় অধিপতিকে মায়াজালে খর্ব্বীকৃত করিতে সক্ষম হইবে, আমি বহুমান বিতরণ পূর্ব্বক তাহার মৎসাদৃশ্য স্থাপন করিব। তিনি এই প্রকার কহিলে, অন্যতর মায়াবিৎ অভিমুখীন হইয়া তৎক্ষণাৎ

কহিল, আমি ইহা সম্পন্ন করিব। এই বলিয়া সে অকারণ পতির বিশ্বাস সমুৎপাদনার্থ সমুদায় পরিবার বর্ম্মায় স্থাপন ও সমভিব্যাহারে ক্ষুদ্রস্বভাবা কোন রমণীকে পত্নী স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক আরাকানে গমন ও তদীয় স্বামীর গোচরে নিবেদন করিল, যে আমি বর্ম্মরাজের নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছি এবং মায়াবিদ্যায় আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। আমার পলাইবার কারণ এই, যে আমি বর্ম্মানগরীর সমুদায় গৃহ বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করিতে সম্মত হই নাই; তাহাতে মহারাজ আমার প্রাণহত্যার কল্পনা করেন। আমি মনন করিলেই সমুদায় গৃহ স্বর্ণময় করিতে সমর্থ হইতাম। আরাকানপতি সমুদায় শুনিয়া তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজ হইতে তাহারে গৃহ ও গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিলেন। সে ব্যক্তি দিন দিন তাঁহার অতিমাত্র প্রিয় হইতে লাগিল। অনন্তর রাজাকে একান্ত বশীভূত দেখিয়া, চাটুবাদ সহকারে কহিতে লাগিল, আপনি যদি আমার কথা শুনেন, আমি আপনার রাজ্যের অসীম বৃদ্ধি করিতে পারি এবং আপনি বর্ম্মা, মোগল ও সমুদায় বিদেশীয় রাজ্য জয় করিতে পারেন। রাজা কহিলেন, তুমি কিরূপে এবিষয়ে পারক হইবে? সে কহিল, আপনার নগরী মায়া বিদ্যার ব্যতিরেক নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি প্রথমে এই মায়ার সাহায্য গ্রহণ করিব। কেননা, দৃঢ় ও সুসমৃদ্ধ বাসস্থানের আশ্রয় ব্যতিরেক আপনার সেই জয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। রাজা শুনিয়া তাহাকে অভিমত সাধনে আদেশ এবং অন্যের তাহাতে প্রতিষেধ করিয়া দিলেন। তখন সেব্যক্তি নগরীর সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন ও তাহাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করিয়া তাহার চারিকোণে এরূপ মায়া নিহিত করিল যে, ব্যক্তিমাত্রেই মোহিত হইয়া গেল। অনন্তর সে রাজাকে কহিল, আপনি আর পূর্ব্বপুরুষের প্রথানুসারে কপালের উপরিভাগে কেশগ্রন্থি বন্ধন করিবেন না। সমুদায় প্রজালোকের সহিত স্ত্রীলোকের ন্যায় পশ্চাদ্‌ভাগে অঙ্গুরীয়ের আকারে উহা সংযত করিবেন। রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন এবং সমুদয়ে প্রজাকে তদনুরূপ অনুষ্ঠান আদেশ করিলেন। অনন্তর সেব্যক্তি আরাকান প্রচলিত পান পাত্রের আকার পরিবর্ত্তন এবং রাজার দম্ভ বর্দ্ধিত করিয়া ছিল। এইরূপে সমুদয় জনপদ স্ত্রীবৎ নির্ব্বীর্য্য হইলে সেব্যক্তি পীড়া হইয়াছে ভাণ করিয়া, গৃহে কপাট বদ্ধ করিল এবং কহিয়া দিল, আমি মহারাজের দুর্দ্ধর্ষতা জন্য যাবৎ চরম মায়া সাধন করিব, কেহ যেন আমারে বিরক্ত না করে। এই বলিয়া সে নির্ব্বাণ অগ্নির উপর কতিপয় ধান্য স্থাপন ও জলসেক সহকারে তাহা অঙ্কুরিত করিয়া, রজনী যোগে পলায়ন করিল। এদিকে মহারাজ তাহার দীর্ঘ অদর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং আমার গুরু ও উপদেষ্টা কোথায় বলিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রক্ষীরা অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবলোকন করিল গৃহ শূন্য রহিয়াছে এবং পাত্রে ধান্য অঙ্কুরিত হইয়াছে। তাহাতে তাহারা রাজার গোচরে নিবেদন করিল, অনেক দিন হইল, সেব্যক্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে এবং ইতি পূর্ব্বেই তাহার শরীরে ভূতাবেশ দৃষ্ট হইয়া-

ছিল? কেননা, পাত্রে যখন ধান্য অঙ্কুরিত হইয়াছে, তখন অনেক মাস গত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ঐ সময়ে বর্ম্মারাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন ও আরাকানস্বামীকে সংহার করিলে, মদীয় পিতামহ সমুদায় জাতির সহিত চট্টগ্রামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু আজিও আমরা সেই মায়া পরিহারে সমর্থ হই নাই। আমাদের পূর্ব্ব বীর্যের লোপ হইয়াছে এবং তদবধি আমরা পশ্চাৎ ভাগে কেশগ্রন্থি বন্ধন করিয়া থাকি।"

ইহাদের প্রবাদ ও গল্পের সংখ্যা নাই। সমুদ্রের বালুকা যত ইহাদের প্রবাদও তদনুরূপ হইবে। নিম্নে তাহার কতিপয় প্রদত্ত হইল;—

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। সাত গাঁ খুজিলেও পাইবে না। খেতে না জানিলে মরিতে হয়। বস্‌তে না জানিলে উঠ্‌তে হয়। চুপ করিয়া থাকিলে জিব আড় হয়। অনেক বসিলে পায়ে খিল ধরে। নেয়ত থাকেত মরণ হইবে, তা বলিয়া আমার শির ছুইও না, একথা ময়ূরে কয়। "বাঁশে বাঁশ জড়ায়" এই প্রবাদটী, তাহারা যে নিয়মে গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কেননা, তাহাদের সমুদায় গৃহই বাঁশের খোঁটায় নির্ম্মিত এবং ঐ সকল খোঁটা বাঁশের আঁইশে একত্র বদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন।

দেওয়ান গোবিন্দরাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই রসাতলস্থ প্রশস্ত গৃহে নিরন্তর এক ভয়ঙ্কর গম্ভীর শব্দ স্বতঃ উৎপন্ন হইতেছিল এবং তাহার বিবর্ণ প্রাচীরে ঢাল তলবার, টাঙ্গী, খাড়া, তীর, ধনু প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র স্তরে স্তরে ঝুলিতেছিল; গৃহের এক পার্শ্বে হাপর, হাতুড়ী, মুচী, শাঁড়াশী প্রভৃতি স্বর্ণকারের যন্ত্র ও অপর পার্শ্বে কতকগুলা মোটা মোটা মশাল ও তৈলভাণ্ড পড়িয়াছিল। প্রদীপের ক্ষীণালোকে দেখা যাইতেছিল, গৃহের প্রান্তভাগে, শবের মত কি যেন একটা পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে একটা বিকটাকার মূর্ত্তি নিশ্চলে বসিয়া আছে। এই অপ্রীতিকর স্থানে আসিয়া রাঘবসেন রক্ষাপাধীকে জিজ্ঞাসিল। "কিগো পোড়ারী মহাশয়, ব্যাপারখানা কি? আজ সমস্ত দিন কোথা থাকা হয়েছিল— সমস্ত দিনে একবারও দর্শন পেলাম না, কারণটা কি? রতন অপ্রসন্নবদনে মৌনা-

বলম্বন করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। "পোড়ারী বলিয়াছি বলিয়াই বা রাগ করিল" এই ভাবিয়া রাঘবসেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুনরপি বলিল "কেন রতন আজ তোর এমন বিমর্ষভাব কেন?

রতন। না, আমি আর এ কাজ কর্‌ব না।

রাঘব। কেন, হয়েছে কি?

রতন। না আমি আর এ কাজ কর্‌ব না, এ কাজে লাভ কি? সুখ কি?

রাঘব। লাভ টাকা, টাকা হলে সুখের অভাব কি?

রতন। টাকায় তোমার সুখ হতে পারে, আমার সুখ টাকায় হবে না, টাকা আমি ঢের রোজগার করেছি, কিন্তু এক দিনের তরে সুখী হতে পারি নাই। নিশ্চয় এ কাজে সুখ নাই।

রাঘবসেন উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, "তুই ত ভারি নির্ব্বোধ দেখ্‌ছি, এ কাজে সুখই যদি না থাকবে, তবে এ কাজ কর্‌ব কেন? আর তোকেই বা করতে বলব কেন? বোধ হচ্ছে তোর আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, আয় আগে খাবি আয়, এই খানেই তোর খাবার প্রস্তুত করে রেখেছি, আগে ঠাণ্ডা হ তারপর তোর সঙ্গে কথা বার্ত্তা, তোর যা হয়েছে আমি তা সব বুঝেছি।" এই বলিয়া রতনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রদীপের নিকট লইয়া আসিল এবং তথায় তাহাকে বসাইয়া নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য তাহার নিকট ধরিয়া দিল। সম্মুখে বিবিধ প্রকার লোভনীয় সামগ্রী দেখিয়া রতনের বদনমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইল, সে দ্বিরুক্তি না করিয়া আহারে বসিয়াগেল এবং গোগ্রাসে দুই তিন সের লুচি-মোণ্ডার ঘাড় ভাঙ্গিয়া এক হাঁড়ী ক্ষির খাইয়া আচমন করিয়া বসিল। রতন যখন জল-যোগ করে, রাঘবসেন সেই অবসরে স্বহস্তে এক ছিলিম গাঁজা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে দুই চারি খানি সুপারি ও সেই গাঁজা ছিলিমটি তাহার হস্তে প্রদান করিল। প্রস্তুতীকৃত ত্বরিতানন্দ প্রাপ্ত হইয়া পোড়ারী মহাশয়ের পরমানন্দ উপজিল, তিনি হস্তে যেন স্বর্গ পাইলেন—সব ভুলিয়া গেলেন এবং হৃদয় ভরিয়া ধূমপান করিয়া প্রসাদী কলিকাটি সেনজাকে দিলেন, তখন দুইজনে শিবনন্দীর ন্যায় পার্শ্বাপার্শ্বি বসিলেন, পুনর্ব্বার কাজের কথা চলিল। প্রথমেই পোড়ারী মহাশয় কথা পাড়িলেন। তিনি বলিলেন, "সেন মহাশয়, আপনি বল্‌ছিলেন—আমার যা হয়েছে, সব বুঝ্‌তেপেরেছেন, আচ্ছা বলুন দেখি আমার কি হয়েছে?' রতন যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, তখন কজ্জলার নীরদ-নিন্দন বরণ ও নধর গঠন তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল, তখন কজ্জলার তীব্র তিরস্কার ও কঠোর ব্যবহার তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছিল, সে ভাবিতেছিল কর্ত্তা কি কজ্জলার কথা জান্‌তে পেরেছেন? রাঘবসেন উত্তর করিল, "আরে ভূত তাই যদি না বুঝ্‌তে পার্‌ব, তবে তোদের উপর সর্দ্দারী কর্‌ছি কেমন করে, বলদেখি"।

রতন। আচ্ছা বলুনই না কি বুঝেছেন?

রাঘব। বাপু, কার্য্যে নিষ্ফল ও দর্পচূর্ণ হলে কাহার ও চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে?

তোমার ওযে সম্প্রতি এইদশা ঘটেছে, তাকি আর আমার জানতে বাকি আছে। রতন মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল কর্ত্তা এ সকল কথা কেমন করে জানিতে পারিলেন। আমার যে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, কজ্জলা যে আমার দর্পচূর্ণ করিয়াছে একথা কর্ত্তা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন। কিন্তু রাঘবসেন যখন বলিল "বাপু বৃদ্ধের কথা না শুনলে এই রূপই ঘটে থাকে, তখনইত বলেছিলাম গোবিন্দরাম সহজ লোক নয়"। তখন রতনের চৈতন্য হইল—তখন তাহার বিরহ ছুটিয়া পলাইল, গাঞ্জার ধূমের সহিত তাহার ক্রোধানল প্রকাশ পাইল, দুই চক্ষু করমচার ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। সে রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল "আপনি গোবিন্দরামকে মনে করেন কি?"

রাঘব। আমি তাকে, যাহাইকেন মনে করি না, কিন্তু তুই তার, কর্‌তে পেরেছিস্ কি?—তুই যে তার দশ হাজার টাকা মেরে আন্‌তে গেলি, সে দশ হাজার টাকা কৈ? কৈ? কালা কৈ? মাধা কৈ, ঝোড়ো কোথা?

রতন কোন উত্তর করিল না, কেবল কট্‌মট্ করিয়া একদৃষ্টে রাঘবের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। রাঘবসেন তাহাকে মৌনী দেখিয়া পুনরপি বলিল কৈরে কথা কচ্ছিস না যে, চুপ করে রৈলি কেন?

রতন। হুঁ।

রাঘব। কিরে?

রতন। তুমি চুপ্ কর,

রাঘব। চুপ করব কি? তুই ঝোড়োর [illegible]টা সেখানে কি বলে ফেলে এলি বল্‌-দেখি? তোর যত সাহস যত বিক্রম সব বুঝাগেছে, তুই আর মুখ নেড়ে কথা কস্‌নি?

রতন। এখনও বল্‌ছি চুপ কর।

রাঘবসেন। কি? তোর এতবড় স্পর্দ্ধা, আমায় তুই চোক্‌রাঙ্গিয়ে কথা কোস্‌?

রতন। কেন, তুই কি? রাঘবসেন আমি তোকে তৃণজ্ঞান করি। কি বল্‌ব তুই বুড় হয়েছিস, কি বল্‌ব তোর অনেক নিমক খেয়েছি—

রাঘব। তা না হ'লে তুই আমায় মার্‌তিস্, না? বামুন, কি বল্‌ব যে তুই অবধ্য ব্রাহ্মণ, তা না হ'লে এই বুড়োর বিক্রম আজ দেখতিস্। গৃহের প্রান্তভাগে যে বিকটাকার মূর্ত্তি নিশ্চলভাবে বসিয়াছিল, সেই মূর্ত্তি এক্ষণে অগ্রসর হইল, সে মূর্ত্তি পাঠকের পরিচিত সেই হাত-কাটা কালা ডাকাইত। সে নিকটে আসিয়া বামহস্তে রতনের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

রতন। ছেড়েদে, ছেড়েদে।

কালা। ঠাকুর ঠাণ্ডা হও, তুমি রাগ কর্‌লে কাহারও নিস্তার নাই, কর্ত্তা দু কথা বলেছেন বলেকি এতই রাগ কর্‌তে হয়। দোষ ঘাট হ'লে মা বাপে বকে না ত কি অপর পরে দুকথা বল্‌তে আসে?

রতন। আমার দোষ কি?

রাঘব। তোর সহস্র দোষ, তুই আমার কথা শুন্‌লিনি কেন? যে কাজ পার্‌বিনি সে কাজ কর্ত্তে গেলি কেন?

রতন। আমি পারি কি না তোমায় দেখাব, রতন শর্ম্মার একখানা হাড় থাকৃতে গোবিন্দরামের নিস্তার নাই।

রাঘব। ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে আর কথায় কাজ নাই, সে দিন তোর উপর

নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকলেই প্রতুল হয়েছিল।

কালা। সে কথা যথার্থ, কর্ত্তার বুদ্ধি বলেই আমরা এ যাত্রা বেঁচেগেছি? উনি আমাদের পিছু পিছু না গেলে নিশ্চয় সে দিন সর্ব্বনাশ হত। উনি সন্ন্যাসী সেজে নানা কৌশলে আমাদের বাঁচিয়েছেন। বোস ঠাকুর বোস্, এমন করে খামখা রাগ করে কি আত্মবিচ্ছেদ করতে আছে।

রতন। না আমি আর বস্‌ব না।

কালা। সে কি আপনি বস।

রাঘব। এখন কোথা যাবি? এতরাত্রে কি যাওয়া হয়?

রতন। না আমার মনটা এখন খারাপ হয়েছে, আমি বাড়ী যাই।

রাঘব। আরে না না, আয় গান শুন্‌বি আয়। দেখ কালা ঐখানে একটা গর্ত্ত খোঁড়া আছে জানিস্‌।

কালা। আজ্ঞা বুঝতে পেরেছি, আপনি যান।

রাঘব। মাথার অবস্থা কেমন?

কালা। আজ্ঞা, শেষ হয়েগেছে।

ক্রমশঃ

এক পাত নূতন আরব্য উপন্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বণিক স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তাহার প্রাণের দিল্‌কে রাক্ষসের কাছে রাখিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইবে। থাকিলেও রাক্ষসের হাত হইতে কন্যাকে রক্ষা করা তাহার কাজ নহে। এ রোগে রোদনই পথ্য। দিলচম্প বুঝাইয়া বলিল "বাবা অত কাঁদ কেন, তোমার জন্যে আমার প্রাণ দিব, একি বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি ছাড়া তোমার ত আরও দুটি মেয়ে আছে, তাহাদের দেখিয়া তুমি শান্ত হইতে পারিবে। কিন্তু বাবা, তোমাকে যদি রাক্ষস বধ করিত, তা হ'লে কি আমি এ প্রাণ রাখিতাম নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিতাম। তোমাকে অন্ধ করিলে, আমিও কেঁদে কেঁদে অন্ধ হইতাম। তবে কেন শোক করিতেছ। বাবা আমার বড় ঘুম পেয়েছে কোথায় শুই?" "শোও মা ঐ কোচের উপর শোও।" বণিক দিলচম্পকে শয়ন করিতে বলিয়া আপনি বসিয়া রহিল। দিলচম্প ক্রমে ঘুমাইল। দিলচম্প স্বপ্ন দেখিল এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী তাহার শিয়রে বসিয়া বলিতেছে "দিল্, মা, আমাকে কি চিনিতে পার? আমি যে তোমার মা হই, আজ তোমার বৃদ্ধ পিতাকে

বাঁচাইয়া তুমি কি কম পুণ্য সঞ্চয় করিলে। সেই পুণ্য বলে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। কিছু মাত্র ভয় পাইও না। কাল প্রাতে যদি রাক্ষস তোমায় জিজ্ঞাসা করে তুমি চক্ষু দিবে কি প্রাণ দিবে, তুমি প্রাণ দিবে বলিও। প্রাণ অনেক রকমে দেওয়া যায়।" দিলচম্পের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়াই পিতাকে ডাকিল। বণিক জাগিয়াছিল, দিলচম্পের স্বপ্ন বিবরণ শুনিল। বণিকের শোকের উপর শোক উপস্থিত। স্ত্রীর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি প্রভাত হইল। বণিকের হৃদয় বিদারক বিদায় গ্রহণ বর্ণনাতীত।

দিল চম্প পিতাকে বিদায় দিয়া খানিক কাঁদিতে লাগিল। পরে রাক্ষসের অপেক্ষায় খানিক বসিয়া রহিল। অপেক্ষায় থাকা বড় অসহ্য। রাক্ষস আসিল না। দিলচম্প রাক্ষসকে খুঁজিতে গেল। কপালে যা আছে শীঘ্রই হউক। বাড়ীর এদিক ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে দিলচম্প দেখিল একটী ঘরের দরজায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে "দিলচম্প"। দিলচম্প ভাবিল একি আমার নাম এখানে লেখা কেন, অথবা ঘরের নাম হয়ত দিলচম্প। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলচম্প দেখিল ঘরটি অতি পরিপাটী রূপে সজ্জিত। এরূপ সুসজ্জিত গৃহ সে কখন দেখে নাই। দেয়ালগুলি মহামূল্য মণি-মাণিক্যে খচিত। যেন শত সূর্য্য কিরণে গৃহটি আলোকিত। এককোণে একটি সুবর্ণ-ময় তাকের উপর কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। দিলচম্প ঘরের শোভা দেখিয়া আপনাআপনি বলিতে লাগিল "আজই আমার শেষ দিন, শেষ দিনটা যাতে সুখে কাটে ভাবিয়া রাক্ষস এত আয়োজন করিয়াছে। রাক্ষসের বুদ্ধি কিনা, যাকে আজ মরিতে হইবে, তার কি পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মন ভোলে, না সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। ততক্ষণ এক খানা বই পড়ি"। প্রথম পুস্তক খানি খুলিয়া দিলচম্প দেখিল প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে 'ঐশ্বর্য্য বিভব।

তোমারই সব।

বাসনা মনেতে হইলে উদয়
আজ্ঞা ভাবি তাহা পালিব নিশ্চয়।"

দিলচম্প দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিল "আমার আবার ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক কি? আমাকে এখন মরিতে হইবে, মৃত্যুর পর কি ধন রত্ন আমার সঙ্গে যাবে? আমার আবার বাসনাই বা কি? বাসনার মধ্যে বাবাকে একটিবার দেখিতে পাই! "দিলচম্পের কথা শেষ হইতে না হইতে গৃহমধ্যে সুমধুর-বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। দিলচম্প আশ্চর্য্য হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে গিয়া দেখিল একদিকে এক খানি বৃহৎ আর্শী রহিয়াছে। একি! তন্মধ্যে দেখিল, বৃদ্ধ বণিক গর্দ্দভ পৃষ্ঠে মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বণিকের মস্তক নত, মুদ্রিত নয়ন। গর্দ্দভ ইচ্ছামত চলিতেছে। দিলচম্প এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অপর একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল আহার সামগ্রী প্রস্তুত। আহারের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া এক খানি কোচের উপর শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনা শেষ না হইতে দিবা শেষ হইয়া রাত্রি

এক প্রহর অতীত হইল। দিলচম্প ভাবিল, রাক্ষস কোথায়? কেন আসিতেছে না? ভাবিতে ভাবিতে সম্মুখে রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত। রাক্ষস বলিল "দিলচম্প তুমি আমাকে ডাকিয়াছ কেন"? "আমার প্রাণ লও, আমার নিস্কৃতি হউক"। রাক্ষস অতি নম্রস্বরে বলিল "দিলচম্প, এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিভব, এ সকলই তোমার। আমি তোমার দাস মাত্র। যখন যাহা বলিবে তখনই তাহা সম্পন্ন করিব। কেবল একটি মাত্র ভিক্ষা, এখান হইতে যাইতে চাহিও না, তুমি গেলে আমি আর প্রাণে বাঁচিব না"। দিলচম্প রাক্ষসের এইরূপ কাকুতি মিনতি দেখিয়া আরও ভয় পাইল, মনে করিল এ সকল রাক্ষসের ছলনামাত্র। রাক্ষষের হয়ত কিছু ক্ষুধা মন্দ হইয়াছে, তাই এখন বধ করিতেছে না, ক্ষুধা হইলেই বধ করিবে। দিলচম্পের উত্তর না পাইয়া রাক্ষস বলিতে লাগিল "দিলচম্প, আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি যাহা বলিলাম সকলই সত্য। আমার মনের কথা তোমাকে বলিয়াছি, মুখের কথা নহে।"

দিলচম্প আশ্চর্য্য হইল। রাক্ষসের শরীরে এত দয়া। যাহাকে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারে তাহার প্রাণদান দেওয়া বড় কম ক্ষমতার কাজ নহে। এরূপ দয়া মনুষ্যের শরীরে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, রাক্ষসের শরীরে দেখিলে কি হইতে হয়, কেবল দিলচম্পই বুঝিতে পারিল। দিলচম্প বলিল "রাক্ষস, তোমার এমন চমৎকার দয়া! তুমি রাক্ষস নও, তুমি দেবতা।' 'মন ভাল কি না জানি না কিন্তু আমার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই" রাক্ষস কহিল।

দিলচম্প। সেটা তোমার ভুল, নির্ব্বোধেরা কি আপনাদের নির্ব্বোধভাবে, না বলে। বুদ্ধি আছে, তবে হয়ত বেশী নাই।

রাক্ষস। সকল খাবারই পড়ে রয়েছে, তুমি তবে কিছুই খাওনাই। দেখ, তোমাকে দুঃখিত দেখিলে আমি মরিব। তোমার অমন সুন্দর মুখখানি ভার ভার করো না।

দিলচম্প। বাস্তবিক তোমার শরীরে এত দয়া, তা আমি জানিতাম না। এখন আর তোমাকে কই তত কুৎসিতদেখাচ্চে না।

রাক্ষস। যাই বল, আমি একটা রাক্ষস ত।

দিলচম্প। তুমি বোধ হয় জান না, কিন্তু আমি জানি, মানুষের মধ্যে অনেক সুন্দর সুশ্রী পুরুষ আছে কিন্তু তাহাদের আচার, ব্যবহার, কাজ, কর্ম্ম রাক্ষসের মতন। তোমার মতন দেখিতে কুৎসিত হউক কিন্তু মন ভাল হইলে আমি সে সব লোকদের ভাল বলি।

রাক্ষস। দেখ তোমার কেমন বুদ্ধি, আমার খোসামোদ কচ্চ না অথচ আমাকে কত ভাল বলচ। আর আমি এমনি, তোমার বিষয় কত কি বলতে পারিতাম কিন্তু কি করে বলতে হয় তা জানি না। দিলচম্প, যাকে দেখিলে মন বড় প্রফুল্ল হয় তাকে কি বলতে হয়? তুমি আমার তাই। দিলচম্প হাসিল। রাক্ষসও একরকম শব্দ করিয়া হাসিতেলাগিল। রাক্ষসের বড়স্ফূর্ত্তি। রাক্ষসের রকম সকম দেখিয়া দিলচম্পের কতকটা ভয় দূর হইয়াছিল। কতকটা আশ্চর্য্যও হইয়াছিল কাল যে প্রাণ লইতে চাহিয়াছিল, আজ সে এতনম্র। কিন্তু যখন রাক্ষস জিজ্ঞাসা

করিল “তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে” তখনই দিলচম্প ভাবিল এইবার তাহার সময় উপস্থিত। না বলিলেই রাক্ষস বধ করিবে। কিন্তু রাক্ষসকে বিবাহ করা অপেক্ষা মরাইত ভাল। দিলচম্প সাহসে ভর করিয়া বলিল “ না রাক্ষস, তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।” রাক্ষস উত্তর শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। একি দীর্ঘনিশ্বাস যেন শত সহস্র ফণী একত্রে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দিলচম্প ভয়ে মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাক্ষস কথাটা বলা ভাল হয় নাই, বুঝিয়া রাক্ষস ঘাড়টি হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে দিলচম্পের কান্না থামিলে ভাবিল “রাক্ষস আমাকে প্রাণে মারিবে না, তা হ'লে অমন করিয়া চলিয়া গেল কেন। যেন কত দোষ করিয়াছে। আহা! ঈশ্বর এমন সরল অন্তঃকরণ এত কুৎসিত দেহে রাখিয়াছেন, কেন?”

এইরূপে তিনমাস কাটিয়াগেল। বলিতে গেলে দিলচম্প একরকম সুখে আছে। আবার ইচ্ছা করিলেই আর্শির মধ্যে বণিককে দেখিতে পাইত। অসুখের মধ্যে কেবল সঙ্গীর অভাব। রাক্ষস প্রতি রাত্রিতেই এক বার করিয়া দিলচম্পকে দেখিতে আসিত। রাক্ষস দিলচম্পের প্রেমে মুগ্ধ। কিন্তু আর কখন বিবাহের কথা উত্থাপন করিতনা বা মরিয়া গেলেও দিলচম্পের সম্মুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিত না। যে বিশ্রী শব্দ! দিল-চম্পও রাক্ষসকে তত কুৎসিৎ দেখিত না। প্রত্যহ তাহাকে দেখা অভ্যাস। রাক্ষসের শরীরে অভাবনীয় গুণ দেখিয়া দিলচম্প কতকটা তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল। এত দূর হইয়াছিল যে দিলচম্প রাক্ষসের আসিবার সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

একদিন সন্ধ্যার পর দিলচম্প বসিয়া আছে, সম্মুখেরাক্ষস দাঁড়াইয়া। রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল “দিল,আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?” দিলচম্প বলিল “রাক্ষস, বাবারজন্য আজ আমার মন বড় কেমন কচ্ছে আজ আর্শিতে দেখেছি, বাবা আমার পীড়িত এমন কি মরণাপন্ন। আর আমার ভগ্নী দুটি বাবার সেবা না করিয়া, বাড়ীর কোথাও গুপ্তধন আছে কি না তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। এমন সময়ে আমি যদি বাবার কাছে যেতে পারতেম্।”—দিলচম্প কাঁদিয়া ফেলিল। দিল চম্পের কান্না দেখিয়া রাক্ষসও কাঁদিল। “দিলচম্প, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে এই মুহূর্ত্তে তোমার পিতার নিকট রাখিয়া আসিতে পারি। তাহাতে তোমার পিতার প্রাণ রক্ষা হইবে, কিন্তু তোমার বিরহে আমার প্রাণ নষ্ট হইবে।” দিলচম্প চক্ষু মুচিয়া রাক্ষসের হাত ধরিয়া বলিল “রাক্ষস, আমার পিতার নিকট লইয়া চল, আমি শপথ কচ্ছি বাবা একটু সুস্থ হইলেই, আমি তোমার নিকট আসিব। তোমার দয়া আমি কি প্রাণ থাকতে ভুলিতে পারিব। “দিলচম্প দেখো আমায় প্রাণে মেরো না। এই আংটিটি যত্ন করিয়া রেখ। তোমার জন্য আমি একমাস অপেক্ষা করিব। একমাস গত হইলেই নিশ্চয় জানিও তোমার বিরহে আমার মৃত্যু হইবে। এক মাসের মধ্যে যে দিন তোমার আসিতে ইচ্ছা হইবে আংটি পরিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে এখানে আসিতে পারিবে।” এই নাও, এই ঔষধে তোমার পিতার রোগ আরাম হইবে।” দিলচম্প,

রাক্ষসের কথায় চক্ষে জল আসিতেছে দেখিয়া একটিবার মাত্র চক্ষুমুদ্রিত করিয়াছিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখে, সে বণিকের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। বণিক বলিতেছে, "কে মা দিল এলি।"

এমন সময়ে বণিকের অপর দুটি কন্যা সেই ঘরে আসিল। তাহারা দিলচম্পকে দেখিয়া অবাক। কই দিল্‌ত মরেনাই? তাহার আকর্ণ নয়ন দুটিও যেমন তেম্নি রহিয়াছে। পরিধানে উত্তম বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে হীরকখচিত অলঙ্কার, দেখিয়াই বুঝিল যে দিলের দুর্দ্দশা হওয়া দূরে থাকে তাহার সুখের অবধি নাই। এ সকল দেখিয়া তাহারা নিস্তব্ধ। কি বলিতে হইবে তাহারা ভাবিয়া পাইল না। তাহারা বণিকের মুখে দিলচম্পের ভাবী-দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিল যে দিলের সঙ্গে আর দেখা-হইবে না। যদি দেখাই হইল তা দিল অন্ধ হইয়া আসিল না কেন? তাহলে দুট কথা বলিবার থাকিত। কি রূপে চক্ষু নষ্ট করিল, কতদিন বেদনা ছিল, কিরূপে জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁদিত আবার কাঁদিলে রাক্ষস আসিয়া কিরূপ প্রহার করিত, এইরূপ নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। কিন্তু এমন ঐশ্বর্য্য বিভবের কথা কোনপ্রাণে জিজ্ঞাসা করিতে হয় দিলের ভগ্নীদুটি জানিত না। সুতরাং নিস্তব্ধ? হিংসায় তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল? হিংসার জল স্নেহের ভাণ করিয়া তাহারা দিলচম্পের গলা জড়াইয়া খানিক কাঁদিল। আবার যখন শুনিল যে দিলচম্পের ঔষধে বণিক আরোগ্য হইয়াছে তখন তাহাদের মর্ম্মান্তিক হইল।

দিলচম্পের একরকম সুখে দিন কাটিতে লাগিল? কেবল রাক্ষসের জন্য একটু একটু মন কেমন করিত। আর তাহার সাপিনী ভগ্নীদুটি, দিলের কিসে অনিষ্ট করিবে সেই-চিন্তাই অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

একদিন তিনভগ্নীতে বসিয়া সুখ দুঃখের কথা হইতে ছিল? জ্যেষ্ঠা বলিল "ভাই এ সংসারে আমার সুখ নাই, সর্ব্বদাই মনের কষ্ট আবার জ্বালার উপর বড় জ্বালা স্বামীর জ্বালা। তিনি নিজে দেখিতে খুব সুশ্রী ও সুন্দর কাজেই তাঁর বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক মাত্রেই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়। আমার দিকে একবার দৃক্‌পাত ও করেন না, ভালবাসা দূরে থাক। দেখ বোন্ দিল্, কখন ও সুন্দর পুরুষকে বিয়ে করিস্‌নে। পুরুষরা কোন পুরুষেত সুন্দর হন্ না, সেইজন্য এক আধ জন যদি একটু সুশ্রী'হল তাহলে আর গুমরে পা পড়ে না? সাত জন্ম কুৎসিৎ স্বামী হক্ ভাই, আমার এমন সুন্দর পুরুষে কাজ নাই"।

কথায় কথায় মধ্যমা বলিল "দিদি তোরও যে দশা আমারও তাই। ইনি দেখিতে শুনিতে যেমন তেমন বটে কিন্তু নাকি লেখা পড়ার বড় এলেম্। আর বড়ই সুচতুর; কাজেই এঁর কাছে আমায় বোবার মতন চুপটি করে থাক্‌তে হয়। কথা বলিবার যো নাই। কিছু বল্লেই অমনি একটু হেসে বলেন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কিনা। এঁর কাছে স্ত্রীলোক আর পাগল দুই সমান। যখন তখন 'খেপি, খেপি' বলে ডাকা হয়। কেন, আমি কি সত্যি পাগল? তা ভাই বরং সুন্দর স্বামী ভাল ত এমন বিদ্বান বুদ্ধিওলা স্বামীর মুখে ছাই। সাত জন্ম কাজ নাই।

মেয়েমানুষ সত্যি মুর্খ, তা পুরুষেরা কি বিদ্বান হয়ে জন্মায় নাকি। লেখা পড়া শিখে ত বিদ্বান হয়, তা আমাদেরও লেখা পড়া শিখালে পুরুষদের চেয়ে বেশী শিখতে পারি। সেই ভয়েই ত আমাদের পড়িতে দেয় না, পাছে বেশী শিখে তাদের গোঁফের উপর ঘোমটা টানাই। তবে এত ঠাট্টা কেন।”

দিলচম্প মনে মনে ভাবিল, মন্দ নয়, আমি রাক্ষসকে বিবাহ করিতে চাই না কেন, না, রাক্ষস দেখিতে সুন্দর সুশ্রী নয় কিন্তু আমার বড় দিদির সুশ্রী স্বামী পেয়ে এই দুর্দশা। আরও রাক্ষসেব বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, লেখা পড়া জানে না এই জন্যে তাকে বিবাহ করি না, কিন্তু সে বিষয়ে আমার মেজ দিদির ত খুব সুখ। এঁদের দুজনের স্বামীর অপেক্ষা রাক্ষসের আর এক গুণ আছে। তাঁর মন ভাল, তাকে আমি বিবাহ করিলে সে কখন আমায় তাচ্ছল্য করিবে না। না, আর ইতস্ততঃ করিব না, আমি রাক্ষসকেই বিবাহ করিব। এই একটা মাস কেটে গেলেই রাক্ষসের কাছে যাইব। তাকে না দেখতে পেলে এমন মন কেমন করবে তা জানতুম না।

আজ একমাস পূর্ণ হইল। দিলচম্প বণিকের নিকট বিদায় হইয়া, রাক্ষসদত্ত আংঠিটি পরিতে গিয়া দেখে বাক্সয় আংটি নাই। মহা মুস্কিল! আজ রাক্ষস দিলচম্পকে না দেখিতে পেলে প্রাণে মরিবে। কি বিপদ? দিলচম্প শয্যায় শুইয়া রাক্ষসের জন্য কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া ভোর বেলা একটু ঘুম আসিল।

দিলচম্প রাক্ষসকে কত ভাল বাসিত তাহা জানিত না। দিলচম্প স্বপ্নে দেখিল, রাক্ষস যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে অট্টালিকার সমস্ত ঘর খুঁজিয়া, শেষে বাগানে যাইয়া প্রত্যেক গাছের পাতায় পাতায় তাহার অনুসন্ধান করিল, কোথাও নাই। শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, দিল্, দিল্, তুমি যদি ভাল না বাসিলে তবে আমার বাঁচিয়া সুখ কি! আমি মরিলে কি তুমি সুখী হও, এই দেখ তোমার বিরহে আমি মরিতে পারি কি না। এই বলিয়া রাক্ষস একটি ঝরণার ধারে পড়িয়া গেল। দিলচম্প রাক্ষসের দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ইচ্ছা হইতেছে রাক্ষসের নিকট যাই কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই। এমন সময় একটি বৃদ্ধ দিলচম্পের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদ কেন? দিলচম্প তাহাকে বলিল “রাক্ষস মরে, আমি রাক্ষসকে দেখিব, কিন্তু আংটি হারাইয়াছি সেই-জন্য যাইতে পারিতেছি না।” বৃদ্ধ বলিল ‘আংটি হারাও নি, তোমার ভগ্নীরা তোমাকে কষ্ট দিবার জন্য চুরি করিয়াছিল, এই দেখ আংটি আনিয়াছি, এখন রাক্ষসের কাছে যাও। আমার কথা রাক্ষসকে বলিও; বলো সলেমন খাঁ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে এই বলিয়া বৃদ্ধ অন্তর্ধান হইল। দিলচম্পের ঘুম ভাঙ্গিল।’ স্বপ্নে দিলচম্প দেখিতেছিল। চক্ষের জলে বিছানা ভিজিয়াছে। সম্মুখে আংটি রহিয়াছে শশব্যস্তে দিলচম্প আংটি পরিল ও মুহূর্ত্ত মধ্যে রাক্ষসের অট্টালিকা মধ্যে পৌঁছিল। দিলচম্প প্রত্যেক ঘরে রাক্ষসকে খুঁজিল, কোথাও রাক্ষস নাই। তখন ভাবিল কি বুদ্ধি আমার, রাক্ষসকে দেখিবার ইচ্ছা

হইলেই সে আসে. তবে কেন তাকে খুঁজিয়া বেড়াই'। তখন মনে মনে রাক্ষসকে দেখিবার ইচ্ছা করিল, রাক্ষস আসিল না, আবার উচ্চৈঃস্বরে "রাক্ষস, রাক্ষস তুমি কোথায়" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তবুও রাক্ষস আসিল না। হঠাৎ স্বপ্নের কথা মনে পড়াতে দিলচম্প কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঝরণারদিকে দৌড়িল। সেখানে যাইয়া দেখে, রাক্ষস মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। সংজ্ঞাবিহীন। দিলচম্প রাক্ষসের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দিলচম্পের স্পর্শে রাক্ষসের ক্রমে চৈতন্য হইতে লাগিল। ক্রমে চক্ষু উন্মিলিত হইল। ক্রমে ঠাওর হইল যে বাস্তবিক দিলচম্প কাঁদিতেছে। তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া রাক্ষস বলিল "দিল্, এই আমার যথেষ্ট সুখ, আমাকে মরিতে দেখিয়া তুমি যে আমার জন্য কাঁদিবে, এ আশা আমার মনে কখন হয় নাই। এখন আমি স্বচ্ছন্দে মরিতে পারিব। তুমি তোমার পিতার নিকট যাও, যত ইচ্ছা ধন রত্ন সঙ্গে লইয়া যাও। সুখে কাল যাপন করগে"। দিলচম্প কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না, রাক্ষস আমি কোথাও যাইতে চাই না, তুমি ওঠ, আমার জন্য তোমার এ কষ্ট আমি দেখিতে পারি না। তুমিত কতরকম ওষুধ জান, আমীর বাবাকে এক কথায় আরাম করিলে, বল কোথায় ওষুধ আছে, আনিয়া খাওয়াই, এখনি ভাল হইবে। ভাল হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিব"।

দিলচম্প শেষ কটী কথা যেমন মাত্র বলিয়াছে, অমনি চতুর্দ্দিকে আশ্চর্য্য আতশ বাজি হইতে লাগিল। কোথা হইতে একটা মহাকোলাহল হইয়া উঠিল। চারিদিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল। দিলচম্প অবাক হইয়া ফিরিয়া দেখে, কত শত সহস্র আমীর ওমরাও ও অন্যান্য লোক নতশিরে হাসিতে হাসিতে সেই দিকে আসিতেছে। দিলচম্প একটিবার মাত্র চাহিয়াই পুনরায় রাক্ষসের দিকে ফিরিল। "রাক্ষস, কোথায় গেলে তুমি" বলিয়া দিলচম্প কাঁদিয়া উঠিল। আর সেখানে রাক্ষস নাই। তৎপরিবর্ত্তে একটি রাজবেশধারী সুপুরুষ রহিয়াছেন। "ওগো, আমার রাক্ষস কোথায় গেল" বলিয়া দিলচম্প কাঁদিল। রাজবেশধারী পুরুষটি বলিলেন "প্রিয়ে, তোমারি চরণে। আমিই তোমার রাক্ষস। আমি এই দেশের রাজা, সম্মুখে ঐ দেখ আমার অমাত্যগণ, পারিষদবর্গ ও প্রজা-সমূহ আসিতেছে। সলেমন খাঁ নামে এক যাদুকরের কন্যা হরণ করিয়াছিলাম বলিয়া সেই যাদুকর আমাকে, মন্ত্রের দ্বারা রাক্ষস করিয়া রাখিয়াছিল। আর সমস্ত লোককে, বৃক্ষ, লতা, ঘাস ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। ক্রোধের শান্তি হইলে বলিয়াছিল 'যদি কখন তোমার এই কুৎসিত রাক্ষস-দেহ সত্ত্বে কোন সরলা বালিকা আপন ইচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করিতে চায় সেই দিন তুমি ও তোমার রাজ্য শাপ হইতে মুক্ত হইবে, নতুবা নয়'। শাপ হইতে মুক্ত হইবার আমার একটুও আশা ছিল না, আজ তুমি আমাকে ও এইশত সহস্র লোককে রক্ষা করিলে। অতএব তুমিই আমার প্রাণ। এখন তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখে রাজ্য করিব।

এমন সময়ে বৃদ্ধ সলেমন খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই জনকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া, বৃদ্ধ বলিল দিলচম্প তোমার ভগীছটির যেমন পাষাণের অন্তঃকরণ ছিল, তেমি তাহাদিগকে দুটি পাষাণী মূর্ত্তি করিয়া কটকের দুইপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছি। তাহারা তোমার প্রশংসা রাতদিন কাণে শুনিবে তোমার সুখঐশ্বর্য্য চক্ষে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবে, কিন্তু আর কখন তোমার কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। থাক্, থাক্ তোমার কথায় তাহাদিগকে দয়া করিতে পারি না। যদি কখন তাহাদের মন ভাল হয়, জানিতে পারি তবেই তাহাদিগকে শাপমুক্ত করিব নতুবা নয়”।

রাজ্য মধ্যে মহা ধুমধাম হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন রাজা দিলচম্পকে বলিল “দেখ, তোমার পিতা যে গোলাপ গাছটি তোমার জন্য লইয়া গিয়াছিল, সেটি আমার প্রধান অমাত্য। গোলাপ গাছটি তোলাতে আমার অমাত্যের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। অতএব আমার ইচ্ছা যে তোমার পিতাকে সেইপদে অভিষিক্ত করি। এখন তোমার কি মত”? দিলচম্পের মত তাহার হাসিতেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

এসংসারে যার অন্তঃকরণ সরল সেই রাজা ও যার কার্য্যগুলি সুন্দর সেই সুন্দর।

প্রবাসে।

একদা অন্ধকারময়ী অমাবস্যা নিশিতে রাত্রি ৮ সময় রঙ্গমতী হইতে প্রান্তরমধ্য দিয়া এক রোগীকে দেখিতে যাইতে ছিলাম। আমার সম্মুখে একটী ভৃত্য এক লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া চলিতে ছিল। চতুর্দ্দিকের গিরিশৃঙ্গ ও বনের বৃক্ষ কিছুই দেখা যাইতে ছিল না। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে অদূরে কি জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলাম; প্রথমে খদ্যোৎ বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু খদ্যোতের আলো ইহার ন্যায় স্থির নহে; চতুর্দ্দিকে বন ও পাহাড়; নিকটে লোকের বসতি ছিল না, সুতরাং উহার দীপালোক হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিকটবর্ত্তী হইলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চাকরের সহিত কিঞ্চিৎ দূরে যাইবামাত্র উক্ত উজ্জ্বল পদার্থ পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন ভৃত্যকে দূরে থাকিতে বলিয়া আমি অন্ধকারে তাহার সমীপস্থ হইলাম। উৎসুকচিত্তে হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, পরন্তু বস্তুটি বোধ হইল যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভৃত্যকে তথায় আসিতে বলিলাম; আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে আমার কৌতূহলের কারণ একটী সামান্য ভেকের ছাতা। এইরূপ অন্য এক দিবস বনের ভিতর বাঁশঝাড়ে পুরাতন বাঁশের গোড়ার দিকের চোকগুলি জ্বলিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়া ছিলাম।